KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 200[illegible] | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : নীড় প্রকাশন |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৬৩/১<br>৬৩/২<br>৬৩/৩-৪ | Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮ // Aug 2001<br>শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮ // Dec 2001<br>কার্তিক-চৈত্র ১৪০৮ // May 2002 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor : আবদুর রউফ | Remarks : |

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৬১ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮

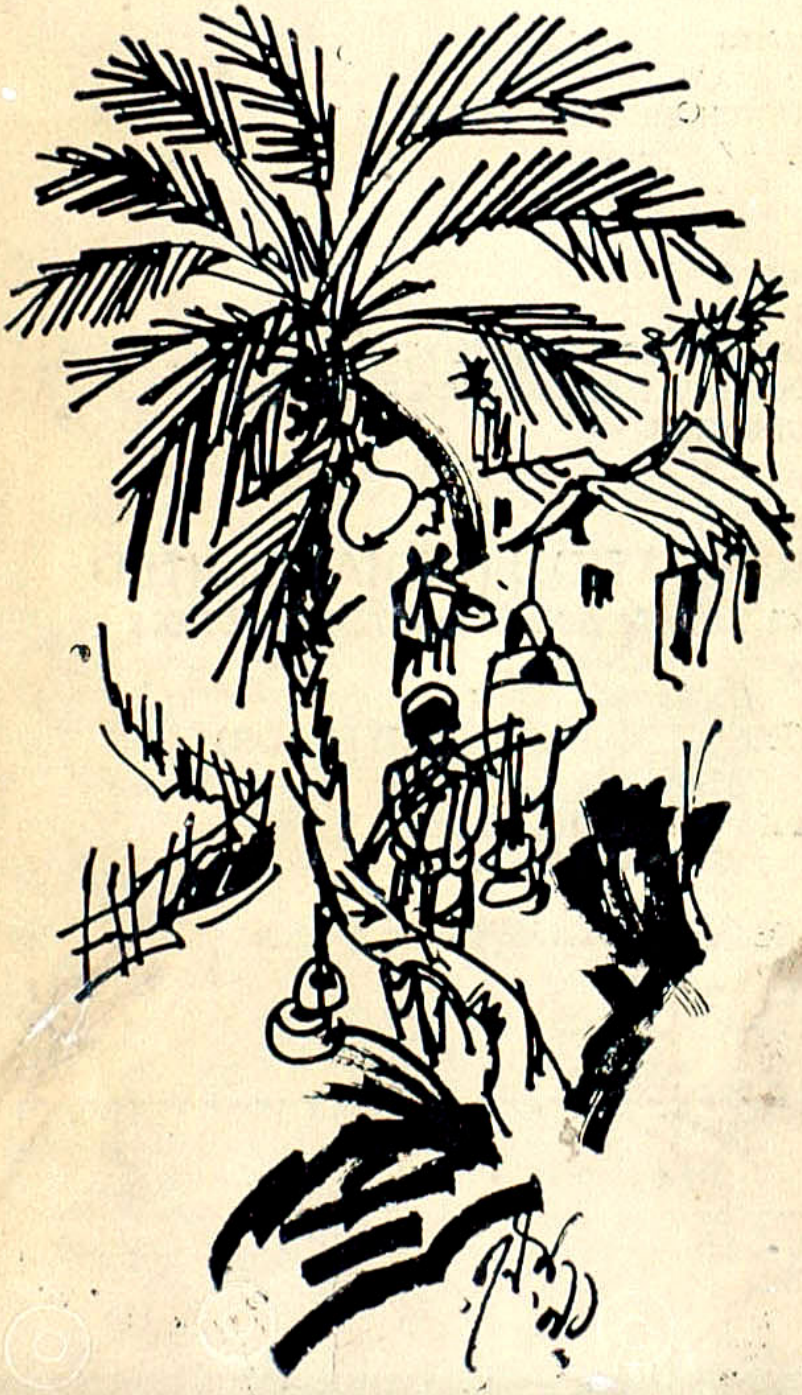

সুধীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা প্রবল দেহজ, নিঃসংকোচ, রহস্যহীন এবং সম্ভোগেচ্ছায় অলজ্জ — শতবর্ষে কবির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ।

চতুরঙ্গে প্রকাশিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসত্রয় এবং কয়েকটি গল্পের প্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাসচেতনার অনন্যতা সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত করেছেন ড. তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমিয়ভূষণের 'মহাসত্ত্ব' নাটিকাটির পুনর্মুদ্রণ।

ধারাবাহিক 'বঙ্গসংহার এবং'-য়ে এবার ১৯৫০-এর দাঙ্গা, পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু আগমনে পণ্ডিত নেহেরুর প্রতিক্রিয়া, লিয়াকত আলিকে লেখা তাঁর চিঠি ও টেলিগ্রাম — অনেক অজানা তথ্য।

'আলোছায়ার পথিক' তাপস সেন এবার শুনিয়েছেন নৃত্যে এবং নৃত্যনাট্যে আলোকপরিকল্পনায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

শিবনারায়ণ রায়ের কবিতাগুচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' পড়ে অনুপ্রাণিত তরুণ নেরুদার কবিতার দু'রকমের অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে।

গণতন্ত্র ও শিক্ষা নিয়ে প্রাক্তন উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং গণতন্ত্রের সংকট নিয়ে ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য।

নারীবর্ষে নারীর ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গে ড. রেণুকা বিশ্বাস।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও কিন্নর রায়।

*WITH BEST COMPLIMENTS :*

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

**SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—**

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED
*CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS*

*Registered Office :*
**59B, ( HOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)**
**CALCUTTA-700 020**
**PHONE : 240-3165, 240-3093**
**TELE FAX 240-4810**

***35 Years' Dedicated Service to the Nation***

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮
বর্ষ ৬১ সংখ্যা ২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০

**প্রবন্ধ**
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রেমে, একাকিত্বে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ১০৫
ইতিহাসের সীমা ছুঁয়ে অমিয়ভূষণ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯
কবিতাগুচ্ছ শিবনারায়ণ রায় ১১৩
পাবলো নেরুদার একটি কবিতা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৬

**ধারাবাহিক**
আলোছায়ার পথিক তাপস সেন ১১৮
বঙ্গসংহার এবং সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ১২২

**কবিতা**
❖ ধান চাল ভাত অমিতাভ দাশগুপ্ত ❖ যে বাঁচে পবিত্র মুখোপাধ্যায়
❖ বুঃ বঃ ঈশ্বর ত্রিপাঠী ❖ ওই মুখ গৌতম হাজরা
❖ নিষিদ্ধ জাগরণ সৌমিত্র নন্দী ❖ বংশক্রম সুবীর ঘোষ
❖ যে কথার অর্থ নেই মুহাম্মদ ফজলে কাদের ❖ তর্পণ অশোককুমার দত্ত
১৩২-১৩৯

**ছোটগল্প**
ব্রাত্য আরতি মুখোপাধ্যায় ১৪০
পুনর্জন্ম দেবকুমার সোম ১৪৫

**সন্দর্ভ**
শিক্ষা ও গণতন্ত্র সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪৯
গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫১
নারী শক্তি সঞ্চারণ রেণুকা বিশ্বাস ১৫৩

**গ্রন্থসমালোচনা**
❖ আবদুর রাউফ ❖ ঝরনা ধর ❖ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ❖ হেদায়েতুল্লাহ
❖ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ❖ মীনাক্ষী ঘোষ ❖ অসীম রেজ
১৫৮-১৭২

**নাট্যসমালোচনা**
কয়েকটি সাম্প্রতিক নাট্য মেঘ মুখোপাধ্যায় ১৭৩

**স্মরণ : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়**
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় কিন্নর রায় ১৭৯

চিঠিপত্র ১৮৪

**পুনর্মুদ্রণ :** মহাসত্ত্ব অমিয়ভূষণ মজুমদার ১৮৫

মূল্য: ১৫ টাকা
ডাকে: ১৮ টাকা
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত
শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা – ১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে – নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা – ৬
দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রাউফ

# পঞ্চায়েত

## গ্রামের চেহারাটাই বদলে দিচ্ছে

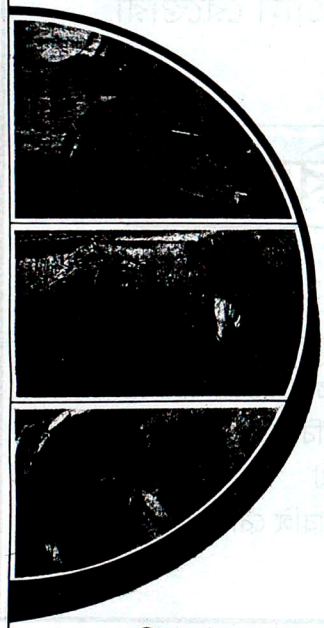



পঞ্চায়েত বদলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পটভূমিকেই। ভূমিসংস্কার, কৃষি, সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্যচাষ, বনসৃজন সহ সার্বিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন ঠিক করেন নিজেরাই। এই পঞ্চায়েত গ্রামীণ মানুষকে দিয়েছে আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাস। দিয়েছে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি।

**পঞ্চায়েতের সাফল্য**

- অপারেশন বর্গায় এ পর্যন্ত ১৪.৯৭ লক্ষ বর্গাদারকে চাষের অধিকার প্রদান
- নথিভুক্ত বর্গাদারদের হাতে আছে প্রায় ৮.৪৭ লক্ষ একর চাষের জমি
- ভূমি সংস্কারের ফলে রাজ্য সরকারের মোট ন্যস্ত কৃষি জমির পরিমাণ ১৩.৬৯ লক্ষ একর
- দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে ১০.৪৮ লক্ষ একর জমিবন্টন
- জমি বন্টনে উপকৃত হয়েছেন ৫৭ শতাংশ তপসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক
- রাজ্যে সেচসেবিত জমির পরিমাণ ৬২ শতাংশ
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে এসেছে মোট কৃষি জমির ৭০.৭ শতাংশ। উন্নতবীজের ব্যবহার ৮৭ শতাংশ জমিতে
- সেচ অধীন ৪ একর ও সেচ বিহীন ৬ একর পর্যন্ত জমিতে চাষীদের খাজনা মুকুব
- ২৬.৭ লক্ষ কৃষি শ্রমিক ও গ্রামীণ কারিগরকে বাসস্থানের জমিদান
- গ্রামোন্নয়নের দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন
- গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে ভূমিহীন কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব এখন যথাক্রমে ৯৩ শতাংশ, ৯২ শতাংশ, ৮৮ শতাংশ
- পঞ্চায়েত মহাজনের হাত থেকে মুক্ত করেছে বাংলার চাষীকে



**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

স্মারক নং ৪৮৯৫/২০০১/তথ্য ও সংস্কৃতি


**প্রবন্ধ**

# সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ প্রেমে, একাকিত্বে

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষ চাকরি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প ডিভিসিতে। সেই প্রকল্পের মুখ্য দপ্তরে যে বার প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয় তখন তিনি ডিভিসির তথ্য-আধিকারিক। উদ্যোক্তাদের দু'য়েকজন জানতেন তিনি কবি। সেই সুবাদে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কিছু বলার জন্য তাঁরা তাঁকে ধরে পড়েন। ছোট চৌকো একটি ঘর, মাথায় টিনের চাল। পাতা হয়েছিল সতরঞ্চি , ছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি ও মালা। উপস্থিত শ্রোতা ছিলেন কুড়ি পঁচিশ জন। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের চাইতে হয়ত বেশি আকর্ষণ ছিল দত্তসাহেব। সেদিনগুলিতে ইউনিয়ানের তত কিছু ছিল না, ছিল না রাজনৈতিক বুভুক্ষা। দ্বিপ্রাহরিক দীন সেই রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এসেছিলেন, বসেছিলেন সতরঞ্চিতেই। তাঁর সেই আসা ছিল অসাধারণ আসা। চেহারা রাজপুরুষের মতো, পা ফেলার মধ্যে মাপা ছন্দ, দেহের বর্ণে দুর্লভ উজ্জ্বলতা, ছোট রৌদ্রতপ্ত ঘরটায় যেন ছড়িয়ে পড়েছিল সম্ভ্রম, স্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'ধনীপুত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু ধনীপুত্রই নন, অবাক সুদর্শনও তিনি। সেদিনের সেই রবীন্দ্রজয়ন্তী ছিল খুব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপস্থিতিতে হয়ে উঠেছিল অসাধারণ, স্বপ্নবৎ।

বৈশাখের খর দুপুরে ফুটতে থাকা টিনের চাল মাথায় নিয়ে তিনি সেদিন বক্তৃতা করেননি, পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি। প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্পনা তাঁর উচ্চারণে মনে হয়েছিল নিভৃত বনস্থলীতে বিহ্বল জ্যোৎস্নাক্রান্ত রাতের পরমাশ্চর্য মুহূর্ত। সদ্য দ্বিখণ্ডিত বাংলার দিশেহারা কুড়ি পঁচিশজন সেই কবিতার কতটা কী বুঝেছিলেন জানি না, কিন্তু ভাবতে কি পারি না, পরে ভবিষ্যতে সুস্থির জীবনে, কোনও বৃষ্টির রাতে কিংবা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনতে শুনতে তাঁদের মনে পড়ত পরমাশ্চর্য সেই দিনটিকে!

কেন তিনি সেদিন 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন? তাঁর তো না জানার কথা নয় সেদিনের উপস্থিত শ্রোতারা ছিলেন নির্লিপ্ত, রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভায় এসেছিলেন নেহাতই কৌতূহলে। দেশভাগের পর অপরিচিত নতুন ভূখণ্ডে তাঁরা তখন ব্যস্ত বেঁচে থাকার দিশায়, অন্য আর কিছুতে মন দেবার সাধ্যই তাঁদের ছিল না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদি 'কথা ও কাহিনী'র স্কুলপাঠ্য কোনও কবিতা পাঠ করতেন তা হলে সেই নির্লিপ্তি হয়ত খানিক উৎসাহে রূপান্তরিত হত। কিন্তু তিনি পড়লেন রবীন্দ্রনাথের বেশ দীর্ঘ রোমান্টিক কবিতা 'নিমন্ত্রণ'। নিজের জন্যেই কি কবিতাটি তিনি

বেছে নিয়েছিলেন? সেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর অবসরে আর একবার কি ইচ্ছে হয়েছিল রোমান্টিকতায় অবগাহন? কোনও প্রমাণ দেওয়া যাবে না এ কথার, তবে একটা সত্য নিশ্চিতই বুঝে নিতে পারি প্রেমে কী অগাধ আসক্তি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের। এই আসক্তি তাঁর কবিতায় লক্ষ করেই কি বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল 'অলজ্জিত ব্যক্তিগত চিৎকার'?

যতদূর জানি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবনযাপন ছিল শান্ত। তিনি স্থিতধী, যুক্তিপ্রবণ ও মিতবাক। চিৎকারের প্রশ্নই ছিল না, দরকারও ছিল না। অভিজাত পরিবার, শ্লীলতা ও ধ্রুপদী বোধ সেখানে সতত, শুদ্ধ আবহ। এমন পরিবারের সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অলজ্জ চিৎকার সত্যিই যেন আতঙ্কিত ব্যতিক্রম। সে চিৎকার আবার প্রেমের ক্ষেত্রে! বিপ্লব, বিদ্রোহ বা দেশপ্রেমের জন্য তবু মেনে নেওয়া যায় কিন্তু প্রেমের জন্য? এই বৈপরীত্য মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। যে-রবীন্দ্রনাথ সুরে, লেখায় আমৃত্যু সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকায় উদ্‌ভ্রান্ত, নির্দয়, অস্বীকারের রুদ্র চারণ। রবীন্দ্রনাথের নির্মজ্জিত চিত্তভূমির অনেক অ-দৃশ্য যেন অনেক অন্ধকার সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রায় এসে পটে উপস্থিত। দুই রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হয়ে আমরা জীবন সম্পর্কে নতুন শিক্ষা সংগ্রহ করি।

পরিশীলিত জীবনযাপনে কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত? অসহ্য মনে হয়েছিল আবহ? মনে হয়েছিল সব কিছুই কৃত্রিম এবং কৃত্রিম রুচির চাপে প্রেম ও নারী নিস্তাপ, 'শবের সংসর্গ'? এই শীতল ভুবনে হয়ত তিনি এমন কোনও বন্যতা নিজের ভিতর জেগে উঠেছিলেন যেখানে প্রাণের লাস্য মুখাপেক্ষী হয়েছিল উচ্চকিত কল্লোলের? এই জিজ্ঞাসার কিনারা খুঁজে পাই তাঁরই লেখায় — 'পিতৃদেব ছিলেন নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক এবং আকৈশোর অদ্বৈতের অনির্বচনীয় আতিশয্যে উত্তাক্ত হয়ে, আমি যদিও অনেকান্ত জড়বাদেই আশ্রয় নিয়েছিলাম ....' অর্থাৎ তিনি অব্যাহতি চেয়েছিলেন তাঁর রোজকার জীবন থেকে কৈশোরান্তেই। সহজে পেয়েও ছিলেন সেই অব্যাহতি, কারণ সময় তখন অবক্ষয়ে চূড়ান্ত, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব, মহাযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন, মূল্যবোধ তলানিতে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাকে ভেবেছিলেন 'বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে'। এই যখন সময়, তখন বৈদান্তিক পিতার বৃত্ত থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে আর বাধাটা কোথায়? স্ব-প্রকাশ নির্বাধায় সম্ভব ছিল তাঁর।

সেই প্রকাশ প্রেমের কবিতায় লক্ষ করে বুদ্ধদেব বসু বললেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ধ্রুপদী কবি নন, রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতায় আবেগের দিগন্তহীন উচ্চারণ। উচ্চারণ নয় চিৎকার ঃ

১। মদমত্ত আরণ্যিক আমার যৌবন
২। চেয়েছিল প্রমাণিতে নিদারুণ মোর দস্যুতায়
নির্বিকার
ক্ষেত্র-মাত্র তুমি।
৩। দেহের দেউলে তব সঁপিলাম সর্বস্ব অক্লেশে।

এমন আরও অনেক, বহু, পঙক্তি উল্লেখ করা যায়। তাতে ছড়ানো রক্তমাংসের প্রতি কবির গভীর মনস্কতা, প্রেম। এই প্রেমই অলজ্জ চিৎকারে তাঁর কবিতায় উচ্চারিত। সমসাময়িক অন্য কবিদের কবিতায় এমনটি দৃষ্ট হয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেন আদিম বলশালী প্রেমিক, তাঁর সম্ভোগেচ্ছা আকাশস্পর্শী, সেখানে সামান্যতম অপূর্ণতাও নারকীয় যন্ত্রণা। স্বাভাবিক সংসারি মানুষের, তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা ঐতিহাসিকতায় নিয়ন্ত্রিত, সামাজিক। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রোমান্টিক কল্পনা সব কিছু ছিন্ন করে জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছুটে গেছে দেহতটে, তটে। অথচ তাঁর সময়ের জীবনানন্দ দাশ? জীবনানন্দ দাশের কবিতায় দেহ প্রায় চোখেই পড়ে না অথচ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভেবেছেন বক্ষের যুগল স্বর্ণই শেষ কথা। জীবনানন্দ দীর্ণ পৃথিবীতে 'হাজার বছর আমি হাঁটিতেছি, হাজার বছর কারও দেখা থাকে না, না প্রেমিকের না প্রেয়সীর, শুধু 'আমি'-ই হাঁটতে পারে অনায়াসে। আর 'কনলতা সেন' শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করে 'এতদিন কোথায় ছিলেন' — অবিরাম চলায় কবি কোথায় কোথায় ছিলেন — এটুকু জানতে পারলেই যেন পূর্ণ হয়ে যায় সব আকাঙ্ক্ষা — যেন মহাসময়ের মানচিত্রটুকুই কাম্য, প্রেমে। তারপর তো অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখবে না, অনন্তকাল শুধু মুখোমুখি বসে থাকবে। রোমান্টিকতায় যতটা অনিশ্বর 'কনলতা সেন', তার চাইতেও সেখানে বেশি, রহস্যময়তার গহন স্রোত। এই রহস্যময়তা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বিপজ্জনকভাবে কম। তাঁর প্রেমের কবিতা প্রবল দেহজ, নিঃসংকোচ। মাঝে মাঝে মনে হয় রহস্যময়তার অভাবে বড় বেশি অন্ধ তিনি, তাই দেহকে অতিক্রম করে অলৌকিকে পৌঁছনো সম্ভব হল না তাঁর, প্রেয়সীর উপরিতলই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল, 'সংকোচ অশোভন/মিলনের বিবসন মহোৎসবে।' অথচ 'সংকোচ'-এর মধ্যে যে প্রেমের আলোছায়ার খেলা থাকে, তা অধরাই থেকে গেল কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়, চিত্তে।

বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। তাঁর প্রেমের তীব্রতা অলজ্জিত, ব্যক্তিগত চিৎকার। তিনি তাঁর কবিতায় ভগবানকে মানেননি। 'শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক' কথাটা অর্থহীন। আসলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে মনে হয় যেন চার্বাক-রোমান্টিক। তাঁর লালসা রয়েছে কিন্তু লালসা যে সীমাবদ্ধ বাস্তবতা, এই বোধে তাঁর পৌঁছনো হয় না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা দুরূহ, এমন নালিশ আজও পাঠকের। দুরূহতা কেন? চার্বাকত্ব আড়াল দিতেই কি সুধীন্দ্রনাথের এই দুরূহতা? তাঁর প্রেমের কবিতা প্রাঞ্জল হলে,



কতটা শ্লীল থাকত এ প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের আবরণে কবিতায় অন্য রকম বর্ণবিচ্ছুরণ নিয়ে আসা সম্ভব। সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের গাঢ় একটা মহিমা রয়েছে, যার জোরে 'কুমারসম্ভব' কাব্য অপাপবিদ্ধ, কবি জয়দেব পাঠকের শ্রদ্ধেয়। সংস্কৃত ও দুরূহ তৎসম শব্দ বাংলা কবিতার অনেক কিছুই গোপন করতে সক্ষম এবং মনও ভোলানো যায় মুগ্ধ ঝংকারে। কিন্তু যে কোনও আবরণই একদিন পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। আবরণ যে কৃত্রিম, মৌলিকতার বিরুদ্ধে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি জানতেন না? তিনি কি জানতেন না কবিতার প্রকৃত পাঠক কোনও রকম চিৎকারই মেনে নিতে পারেন না কবিতায়? রাজনৈতিক কবিতা নামের রচনাগুলি তাই কবিতা-পাঠকের কাছে অসহ্য ও বিরক্তিকর। দুরূহতা বা তৎসম সংস্কৃত শব্দের দাপটও কবিতার জন্য কতটা কী, সেটা যাই হোক, পাঠক সে দিকে কান না দিয়ে, সেই কবিতা পড়ার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন। তা ছাড়া পাঠক কোনও দিনই কবিতায় কোনও চার্বাককে স্বীকার করেন না। চার্বাকের ক্ষেত্র ভিন্ন। পাঠক অলৌকিক খোঁজেন কবিতায়। রিলকের বিশ্বাস ছিল শিল্প হবে অপরিহার্যভাবে সাংকেতিক, পাঠকও এটাই সম্ভবত বিশ্বাস করেন। এই প্রসঙ্গে বোরিস পাস্তেরনাকের দু'য়েকটি পংক্তিও মনে পড়বে,

Art is not simply a description of life, but a setting forth of the uniqueness of being.

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় কম বেশি 'অশ্লীল নটিপনা', ইশারা বা সংকেত কম, রহস্যময়তার বদলে লক্ষে আসে তৎসম ও সংস্কৃত শব্দ এবং ক্লান্তিকর দৈর্ঘ।

প্রেমের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তীব্র দেহজ কামনা, সম্ভোগেচ্ছা ইত্যাদি কি ক্রমে গভীর হতাশার জন্ম দেয়? না হলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় হতাশা ও বেদনা এত বিস্তৃত কেন?

যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে।

কিংবা, আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই
কিংবা, বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী
কিংবা, নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী
নিরাবলম্ব নিখিলে সে আজ একা

এমন শঙ্কাস্তম্ভিত একাকিত্ব আমাদের বিমূঢ় করে এবং ভাবতে প্ররোচিত করে, কী এর ব্যাখ্যা। যে কবি দেহতটে পেয়ে যান শাশ্বতের বিকল্প, তাঁর হতাশা কেন? তা হলে কি ইচ্ছেগুলি বস্তুমুখী হলে, শেষ অবধি অতৃপ্তিতেই তার সমাপন, সেই সমাপন থেকেই হতাশার শুরু?

'পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারে কি স্বয়ং দশভুজা।'

পরিতৃপ্তি কেন দূরে সরে গেল? অসীম নয়, সীমা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চেতনাকে মোহিত করেছিল। 'রূপসীর পার্থিব আনন' তড়িৎ চুম্বনকেই ভেবেছিলেন জীবনের ধ্রুব। কিন্তু সীমা বড় সত্বর জানা হয়ে যায়। তারপর সবই পুরনো পৌনঃপুনিক। সুতরাং ক্লান্তিকর। এই ক্লান্তিই বোধ হয় হতাশার হাহাকার আনে অন্তরে, দিনযাপনে।

শান্তি চারি ধারে
কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে।

এই পঙক্তি পাঠকের মন অবশ করে। প্রেমে সার্বভৌম মিলনপার্বণ এবং তারপরে অতল হতাশা ও একাকিত্বের কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় যে স্বপ্নদুঃখ ট্র্যাজিডি, তাকে ধ্রুপদী বললেই যেন স্বস্তি হয়, চার্বাকত্ব সেখানে অনেকটাই অদৃশ্য। তাঁর একাকিত্ব যন্ত্রণায় রুদ্ধশ্বাস। এই যন্ত্রণা সমস্ত সময়, কাল, মহাকালে মহাসত্য। ব্যক্তিমানুষের ভবিতব্য যেন এটা। তাই তাঁর কবিতা অনশ্বর, চিরকালীন। তাঁর ভাষা মৌলিক স্বীকার করতেই হবে এবং এই ভাষার যে নির্মাণ, যে কবিতা, তা-ও আগামীতে বাংলা কবিতার পাঠককে বিস্মিত করবে। তিনি বাস্তববিবাগী হবার প্রয়াসী ছিলেন না, মেনে নিয়েছিলেন যৌবনের দাবি, আবেগ, অধৈর্য। অথচ 'বাস্তব' অর্থে যা প্রচলিত, তাঁর বাস্তবতা আবার ঠিক সে রকমও নয়। তাঁর কবিতার এই রহস্যময়তাটুকু অন্তত স্বীকার করতেই হবে, অবশ্যেই।

প্রবন্ধ

# ইতিহাসের সীমা ছুঁয়ে অমিয়ভূষণ

## তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিকতা বিচ্ছিন্নতাকে ডেকে আনে। আধুনিক হয়ে ওঠার গোড়ার দিকে ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতায় যেমন বলা হয়েছিল, লবণাক্ত সমুদ্রমধ্যে দ্বীপের মতো আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব — শুধু যে ব্যক্তিমানুষই এমন একা, নিঃসঙ্গ তা-ও নয়, কখনও কখনও লেখক বা শিল্পীও এমন দলছাড়া, গোষ্ঠীবিহীন হয়ে যান। আধুনিক এবং উত্তর-আধুনিক পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার এই রকম নিজের সময়ে অনেকখানি একা। অমিয়ভূষণ প্রতিষ্ঠানবিরোধী বা কেবলই লিটল ম্যাগাজিনের লেখক এমন কোনও তকমায় যেমন তাঁকে চেনানো যায় না, সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে প্রতিষ্ঠানের দায় কখনও তাঁর লেখাকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে এত কম আলোচিত লেখক প্রায় বিরল। প্রায় বিরল বলা হল — এ কারণেই যে অমিয়ভূষণের দু'একজন সঙ্গী যে ছিলেন না এমন নয়, বিশেষ করে এঁদের কিছু আগেকার জগদীশ গুপ্ত এবং কিছুটা সমকালীনই বলা যায়, কমলকুমার মজুমদার। এবং এঁদের দু'জনের সঙ্গেই কোথায় যেন একটা অন্তঃসলিলা মিল অমিয়ভূষণের লেখার, আর যে দুর্বোধ্যতার দায় অমিয়ভূষণের রচনাকে বহন করতে হয় তার সঙ্গে অবশ্যই লোকনাথ ভট্টাচার্যের সাদৃশ্য-সেতু চোখে পড়বে।

অমিয়ভূষণের লেখা বলতে ইদানীং এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক, স্বপ্নসন্ধানী, ট্রমা নির্ভর, কাহিনিবিরল গল্পকেই বোঝানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু আলোচনায় অমিয়ভূষণ এ ভাবেই চিহ্নিত হচ্ছেন। কিন্তু এ সবের বাইরেও অনেকখানি 'অমিয়ভূষণ' থেকে যান। ইতিহাসকে দেখা ও বোঝার মধ্যে সেই অমিয়ভূষণের অপরিমেয় অনন্যতা। ইতিহাসের হাত ধরেই অমিয়ভূষণ একেবারে ভিন্ন ভঙ্গিতে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নয়নতারা' প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে 'চতুরঙ্গ'-এরই পাতায় ১৩৬০-এর সংখ্যাগুলিতে। তার দু'তিন বছর আগে পরের 'চতুরঙ্গ'-এর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে সে সময়ের প্রবণতা। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', প্রতিভা বসুর 'তিনতরঙ্গ', লীলা মজুমদারের 'চীনে লণ্ঠন', মণীষ ঘটকের 'কনখল' প্রকাশিত হচ্ছে। আর 'নয়নতারা' শেষ হবার পরেই ১৩৬৩ এর সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছিল মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'নটী'। অমিয়ভূষণ এবং মহাশ্বেতা দু'জনের লেখার প্রেক্ষিতেই ইতিহাস। কিন্তু দু'জনে দু'ভাবে ইতিহাসকে দেখলেন। আর অন্যান্যদের রচনায় তখন মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালির দ্বিভূজ অথবা ত্রিভূজ প্রেমের আধিপত্য। তবে কাছাকাছি সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'উপনিবেশ', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', কিংবা প্রমথনাথ বিশী 'কেরীসাহেবের মুন্সী' আর অবশ্যই শরদিন্দুর ঐতিহাসিক কাহিনির সম্ভারও রয়েছে। এঁরা প্রায় সকলেই ইতিহাসের পটভূমিতে একটি মহার্ঘ প্রেমের গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু অমিয়ভূষণ 'নয়নতারা'-তে শুধুই পটভূমিকে ঐতিহাসিক করলেন না। তিনি ইতিহাসের সময়কে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠনের বিশিষ্টতাগুলি অনুসন্ধান করেছেন। সার ওয়াল্টার স্কট, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা টলস্টয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে গঠন তৈরি করে দিয়েছিলেন — যেখানে বাস্তব ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে একটি কাল্পনিক প্রেমের কাহিনি বহমান থাকত, অমিয়ভূষণ সেই প্রচলিত গঠনরীতির অনুসরণ করলেন না। তাঁর 'নয়নতারা' এবং প্রায় দু'দশক পরে 'চতুরঙ্গ'-তে প্রথম প্রকাশিত 'রাজনগর' পুরোপুরি কাল্পনিক-ঐতিহাসিক কাহিনি যা অত্যন্ত ঝরঝরে সাবলীল স্টাইলে বলা হয়েছে, কোথাও কোনও দুর্বোধ্যতার জড়তা নেই। শরদিন্দুও অবশ্য কাল্পনিক ইতিহাসের ঘটনা নির্মাণ করতেন কিন্তু অমিয়ভূষণ কল্পনার ইতিহাসকে সামাজিক সত্যের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। এ ইতিহাসদর্শন অতীতের রাজকাহিনি পরিক্রমা নয় — বরং বিশেষ সময় পরিধির অন্তর্ভুক্ত সমাজ মানুষের প্রতিটি স্তরকে ছুঁয়ে যাওয়া, তাকে বিশ্লেষণ করা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এর আগে



বোধহয় এ ভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৃত্তকে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিপাদ্য করে তোলা হয়নি।

'নয়নতারা' আর 'রাজনগর' একই উপন্যাসের পূর্বার্ধ এবং অপরার্ধ। দু'টি রচনারই সময়কাল উনিশ শতক। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শুরু হয়েছে 'নয়নতারা'। আর 'রাজনগর' সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলো থেকেই সেই ক্রমকে অনুসরণ করেছে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে প্রমথ বিশীর 'কেরীসাহেবের মুন্সী' উনিশ শতককেই পটপ্রেক্ষা হিসাবে বেছে নেয় কিন্তু যার স্থানগত প্রেক্ষিত নতুন নগরী কলকাতা। আর 'নয়নতারা' ও 'রাজনগর'-এর স্থানিক পরিচিতি কলকাতা উপকণ্ঠে রাজনগর ফরাসডাঙা-মরলেগঞ্জ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে ফরাসি ঔপনিবেশিকতায় রক্ষিত এই সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি রেশম-সুতির বুনন। মরলেগঞ্জের ফরাসি কুঠিয়াল পিত্রোদা হয়ত রাজনগরের বিধবা রানিমার একদা প্রেমিক। রাজনগরের রাজপরিবারটি সদ্য ব্রাহ্মা। রানি অসম্ভব সুন্দরী, অসামান্য বুদ্ধিমতী, দেওয়ান হরদয়াল উনিশ শতকীয় নব্য শিক্ষিত, রানির প্রচ্ছন্ন প্রেমিক অথবা নিছকই গুণমুগ্ধ। রাজনগরের সদ্য কিশোর যুবরাজ রাজচন্দ্র পিত্রোদার প্রতি বেশি স্নেহের পাত্র। এই অভিজাত পরিবারটির আদবকায়দা মূলত ফরাসি রুচিসঙ্গত। কাহিনির কেন্দ্রে এই জমিদার পরিবারটি, আর তাকে ঘিরে রয়েছে রাজনগর-মরলেগঞ্জ-ফরাসডাঙার কৃষক ও তাঁতিরা। নিকটবর্তী বন্দর কুঁতঘাট। কুঁতঘাটের হাটে ক্রমশ রেশম-সুতির কোণঠাসা হয়ে পড়ার মধ্যে এ অঞ্চলের তাঁতিরা সর্বনাশের কালো মেঘের আশঙ্কা করতে শুরু করে। তবু কুঁতঘাটে পিত্রোদার রপ্তানিবাহক জাহাজ তখনও ভেড়ে। পিত্রোদার কুঠির হাওয়া যন্ত্র ঘুরতে থাকে সান্ধ্য ডিনারের আবহকে সুস্নিগ্ধ রাখে। ফরাসডাঙার নীল কুঠিয়ালদের দাদনের জন্য চাষিরা নিজেরাই উদগ্রীব হয়ে থাকে। রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে পাঠক হরদয়াল কলকাতা এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিত্যনতুন গ্রন্থ আনান। কিশোর রাজচন্দ্র সাথী বুজরুককে নিয়ে শিকারে বের হন। ন্যায়রত্নের গৃহেরা কুলীন কন্যা নয়নতারার অসামান্য রূপ ও প্রতিভা। কলকাতা থেকে ইংরেজ স্ত্রী ক্যাথারিনকে নিয়ে দেশীয় শিক্ষিত যুবক বাগচী রাজনগরে পা রাখেন রাজপ্রাসাদে নতুন শিক্ষাধারার স্কুল নির্মাণের আশা নিয়ে।

উনিশ শতকের কলকাতা আমাদের অনেক বেশি পরিচিতি, ঠিক যতখানি অচেনা সেকালের এইসব গ্রামগঞ্জের ঐতিহাসিক উত্থান-পতন। নীলদর্পণ নাটক একদা বিশেষ উদ্দেশ্যে হলেও পল্লি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু তারপর থেকে উনিশ শতকীয় নগর কলকাতাই বারবার গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের নাড়ীর সঠিক সম্পাদনটি ধরা পড়ে এমন বিচিত্র পটভূমিতেই। জীবন এখানেও দ্রুত পাল্টাচ্ছিল। নতুন ঔপনিবেশিক বাজার অর্থনীতির ধাক্কা গ্রামীণ শিল্পী ও কৃষকদের জীবনকে কত দ্রুত পরিবর্তনমুখী করে তুলছিল 'নয়নতারা'তাই আলেখ্য। উপন্যাসের নাম 'নয়নতারা'। কেননা ন্যায়রত্ন কন্যা নয়নতারা রানিমা-নিযুক্ত রাজচন্দ্রের বয়সে বড় প্রেমিকা। কিশোর রাজচন্দ্র ক্যাথারিনের প্রতি বড় দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তাই নয়নতারার নিয়োগ। কিন্তু নয়নতারার সঙ্গে রাজচন্দ্রের প্রেম বিচিত্র। বিদুষী নয়নতারার কাছে রাজচন্দ্র শুধু প্রেমের নয়, জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করে। রাজচন্দ্র মরলেগঞ্জের কুঁতঘাটী তহসিলদারের কাছে প্রজাদের নিন্দাবাক্যে অস্থির হয়ে উঠে রাজকীয় হঠকারিতায় তাকে খুনও করে ফেলে। মধ্যবিত্ত কুলীন কন্যা নয়নতারা রাজপুত্রকে বোঝাতে সক্ষম হয় কেন রাজার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আর খুনের একমাত্র সাক্ষী বুজরুকের জেলে যাওয়া দরকার। নয়নতারা রাজপুত্রকে উপলব্ধি করাতে পারে কেন বাগচী সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠা মন্দির প্রতিষ্ঠার থেকেও জরুরি। নয়নতারাই কুঁতঘাটে গঙ্গার গতি পরিবর্তনে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। নয়নতারা রাজপরিবার আর সাধারণ প্রজার মাঝে সেতু কিন্তু সে নেতৃত্বকামী নয়, সে ইতিহাসবেত্তার মতোই দ্রষ্টা। অন্যদিকে রাজচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রেমের বন্ধুত্ব একাত্তই অভিনব। নারী-পুরুষের এমন বন্ধুত্ব কাদম্বরী উপাখ্যানে দেখে রবীন্দ্রনাথও 'অসম্ভব' মনে করেছিলেন কিন্তু রাজচন্দ্র নয়নতারার বন্ধুত্বের শিকড় তাদের সামাজিক সম্পর্কের গভীরে প্রোথিত।

স্কুল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রানি ও হরদয়ালের সংঘাতের মধ্যে 'নয়নতারা' উপাখ্যান শেষ হয়। 'রাজনগর' শুরু হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর, মিউটিনির পশ্চাৎপট ধারণ করে। উনিশ শতকীয় দ্বিতীয়ার্ধের রিফর্মেশনের ছুঁয়ে স্পর্শ করে রাজনগরকেও। শিল্প-বিপ্লবের তাড়না সারা বিশ্বে বৈশ্যের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠা করে। রাজচন্দ্র ঠাট্টা করে বলে, ওদেশে কলওয়ালারা লর্ড হচ্ছেন আর এদেশে নুনের বেনিয়ান মুদি আকছার 'রাজা' হচ্ছেন। কুঠিয়াল পিত্রোদার মৃত্যু সমস্ত অঞ্চলে নীলের কুঠিয়াল ডানকানের প্রভাবকে দ্রুত বৃদ্ধি করে। ডানকান, কিবল সাহেবের ঘোড়ার নাল এখন জুড়ান চাষির বুকের ওপর ওঠে, জুড়ানের বোন একই সঙ্গে ডানকানের ঔরসজাত এবং শয্যাসঙ্গী। বাগচীর স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু কুলীনব্রাহ্মণ সর্বানন্দের সঙ্গে একদা কুলীন বাগচীর শীতলযুদ্ধ দানা বাঁধতে থাকে। কলকাতার অ্যাংলো বিক্রেতা ও সুলিভানের দেড় টাকার উলেন চাদরের কাছে দু'টাকার তাঁতের মোটা চাদর ক্রমশ পিছু হঠতে থাকে। কুঁতঘাটে আর পিত্রোদার জাহাজ ভেড়ে না। তাঁতি মেহের আলি পিত্রোদার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা অনুধাবন করতে পারে। পিত্রো বলেছিলেন, "মেহের হাজার বছর ধরে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠেছো ওদের এবার ওরা আইন করে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠবে।"

ফরাসডাঙায় আর গরদ বোনা হয় না। ওসুলিভান রাজনগরে ফিটন সাপ্লাই দেওয়ার কথা ভাবে। নীলকুঠি আর কালেক্টরের যৌথ অত্যাচারে চরণ চাষি আর চরণ-বউ হারিয়ে যায়। চরণ-এর নামকরণ কি শুধুই সমাপতন? নীলদর্পনের সাধুচরণ ক্ষেত্রমণির কথা এ দুই চরিত্র বড় বেশি মনে পড়ায়। কালেক্টরকে শায়েস্তা করার জন্য বেতের লাঠি ঠকে বাগচী ঘোষণা করে — "ভেবেছে আমার গায়ের রঙ কালো বলে ওরা আমার চাইতে বড় ইংরেজ! আমি টাইমসে লিখবো, আমি পার্লামেন্টে কোশ্চেন তুলবো।" হরিশ মুখুজ্জেরা তবে শুধু কলকাতাতেই ছিলেন না। এমন মফস্বলেও সময়ের তাগিদে হয়ত আরও দু'একজন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-প্রবক্তার মতো মানুষ দেখা দিয়েছিলেন। রাজপরিবার ডানকান-কীবলকে প্রতিহত করতে পারে না কিন্তু কৌশলে পতিত জমি উদ্ধার করে প্রজাস্বার্থে দিঘি কাটাতে পারেন। উদ্যোগ অবশ্যই নয়নতারা। কলকাতায় যখন মদ্যপাননিবারণী সভার উদ্যোগ, রামচন্দ্র তখন কনিয়াক-শর্প্যা পান করতে শেখে। কলকাতার ব্রাহ্ম কন্যার সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয় না। ওই কন্যাকে বিবাহের সূত্রে বৈমাত্রেয় ভাই মুকুন্দের হস্তগত হয় রাজনগরের সম্পত্তি। তবু ১৮৮৩ তে চন্দ্রিশোর রাজচন্দ্র কলকাতাবাসী নব্যধনী 'সার রাজচন্দ্র'। তার সারাক্ষণের সঙ্গী একদা পরিচারিকা হৈমী। ত্রিবেণী সঙ্গমের দুর্ঘটনায় রাজচন্দ্রের জীবন থেকে হারিয়ে যায় নয়নতারা। কেন্দ্রচ্যুত রাজচন্দ্র এখন সদা ভ্রাম্যমান। আলমাড়া থেকে ধেকে যায় মহাপ্রস্থানযাত্রী রানিমাকে বিদায় জানাতে। রানির সঙ্গিনী এক অবগুণ্ঠিতার পায়ের সোনার মল রাজচন্দ্রকে ধন্ধে ফেলে দেয়। কলকাতায় সুসেন ব্যানার্জির উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফান্ড' তৈরি হয়েছে, 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের' আয়োজন চলছে। সার রাজচন্দ্র নব্যযুবক মলেলগঞ্জেরই সন্তান কুমার নারায়ণের কাছে সর্বভারতীয় ভারতবাসীর নতুন আইডেন্টিফিকেশনে সাময়িক বিভ্রান্ত হয়েও আবার 'সোনার মল'-এর রহস্যে ডুব দিতে চায়। হৈমীকে নিয়ে রাজচন্দ্র এবার ইউরোপ পাড়ি দেবার আয়োজন শুরু করে। রাজনগরের ফস্বলী পটভূমিতেও রাজচন্দ্র এক জন প্রকৃত আধুনিক নাগরিকের মতোই নিজের সময়ের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার শিকার। রাজচন্দ্র প্রজাস্বার্থ রক্ষায় কখনও সেভাবে উদ্বিগ্ন নয়। নয়নতারা, হৈমীকে সে দু-রকমভাবে ভালবাসে কিন্তু প্রচলিত বিবাহের বাঁধনে ধরা দিতে সম্মত নয়। দেশজুড়ে যখন জাতীয়তাবাদের হাওয়া লাগে তখন রাজচন্দ্র বিলেতে পাড়ি দেবার কথা ভাবে। আধুনিক মানুষ এভাবেই নিজের শিকড় খুঁজে ফেরে।

এই শিকড়সন্ধানী, নিশ্চিত আইডেনটিটির অভাববোধের তাড়নায় আক্রান্ত মানুষের যন্ত্রণা অমিয়ভূষণের স্রষ্টা সত্তাকে বারবার দীপিত করেছে। 'নয়নতারা' আর 'রাজনগর'-এর মাঝখানে সম্ভবত লেখা হয়েছিল 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭)। একমাত্র এই মহাকাব্যোপম উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের পর্যালোচনায় অমিয়ভূষণের স্থান নির্দেশে আলোচকদের বারবার সহায়ক হয়েছে। অমিয়ভূষণের পরিচিতির সঙ্গে এ উপন্যাসের অস্তিত্ব জড়িয়ে গেছে। 'গড় শ্রীখণ্ড' জনপ্রিয় উপন্যাস নয়, কিন্তু বহু আলোচিত। এ উপন্যাস কখনওই প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক নয়, কেউ কেউ 'আঞ্চলিক' ফ্রেমের বাঁধনে একে বাঁধতে চান কিন্তু আঞ্চলিকতার তাৎপর্যও এ লেখায় সদর্থে ঘনীভূত হয় না। ব্যক্তিগত পারিবারিক প্রতিষ্ঠার অপসৃতির যন্ত্রণাসঞ্জাত রচনা 'গড় শ্রীখণ্ড'। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের ঐতিহাসিক পটভূমিতে এ লেখা হলেও এখানে জমিদার, মধ্যবিত্ত, আর কৃষক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। অনসূয়া, সুমিতি, রূপনারায়ণ, ছিন্নম, পদ্ম, ভানুমতী, ফতিয়া, রজবালি এরা সকলেই নিজ নিজ বৃত্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তনশীল চালচিত্রটি গড় শ্রীখণ্ডের মুখপাত করে কিন্তু চরিত্রগুলো সংঘবদ্ধভাবে একই চালচিত্রের আধারে নির্মিত হতে পারে না। ইতিহাসের অভিঘাতকে বহন করার ঠাসবুনন এ উপন্যাসের অধিগত নয়। ফল্গুস্রোতের মতো ইতিহাসচেতনা 'গড় শ্রীখণ্ড' কে ধারণ করে রাখে। তবু ঘটনাপ্রবাহ কিংবা চরিত্রনির্মিতি পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। যেমন তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' কিংবা 'জলসাঘর'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা গল্প বলা যায় না, একই কারণে 'গড় শ্রীখণ্ড' ঐতিহাসিক রচনা এমন অভিধা বহন করতে পারে না।

'নয়নতারা'-র সমকালে লেখা 'তাঁতীবউ' অমিয়ভূষণের এমনই এক ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক গল্প। যে-গল্প শুরু হয় ইতিহাসের হাত ধরে আর শেষ হয় ব্যক্তিমানুষের একক ব্যথায়। এ গল্পের আবহ কিছুটা শরদিন্দুকে মনে পড়িয়ে দেয় কিন্তু ক্রমশ যে নিষ্করুণ, নিষ্পৃহ কুটিল জীবনচর্যা প্রতীয়মান হতে থাকে সেখানে আর শরদিন্দুর ইতিহাসের স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়া প্রভাব ফেলতে পারে না। অমিয়ভূষণ এ গল্প শুরু করেন এভাবে — 'সবদেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ, আর একটি আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগের। বাঙলা দেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ।' 'তাঁতীবউ' সেই যুগসন্ধি পর্বের গল্প। 'নয়নতারা', 'রাজনগর'-এর ফ্রেমিং-এ গল্পটিও নির্মিত। মসলিনের কারিগর গোকুল হাট থেকে বাঁদি কেনে। সেই ক্ষয়াটে চেহারার বাঁদি একদিন গোকুলের ঘরনি হয়। অক্ষম গোকুলের সেবায় দায়বদ্ধ বাঁদি তাঁতিবউ যৌনরোগাক্রান্ত ফকিরের দারস্থ হয়ে মৃতপ্রায় সন্তান উপহার দেয় গোকুলকে। অষ্টাদশ শতাব্দী ক্রমশ ঝুঁকে আসে উনিশ শতকের দিকে। কলের কাপড় মসলিনের বাজারকে বন্ধ্যা করে





তোলে। গোকুল সত্যিই উৎপাদনে অক্ষম। অপেক্ষমান সর্বনাশের দিকে চোখ ঠেরে গোকুল ঘুমিয়ে সময়কে পেরিয়ে যেতে চায়। যুগের নিষ্ক্রিয়তা গোকুলকে উদ্যমহীন করে রাখে, ঠিক যখন রামপ্রসাদ লেখেন : 'এমন মানবজমিন রইল পতিত করলে আবাদ ফলত সোনা।'

সময়ের গায়ে, অতীতচারী ইতিহাসের গায়ে এ ভাবেই শ্যাওলা জমে। 'আভলনের সরাই'-এর যাত্রী মানুষগুলি যুদ্ধশিবির থেকে বেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুর দল। সেন্ট সাইমন, যোশেপ, অধ্যাপক দম্পতী, নিনা, জন, আইজ্যাক এরা বিচিত্র পেশার, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক উচ্চাবচতা থেকে এখন একই দলভুক্ত — সকলেরই গন্তব্য 'অ্যাভলনের সরাই'। এরা কেউই জানে না সেখানে পৌঁছলে কি ফলপ্রাপ্তি হবে তবু তারই লক্ষ্যে এই অবিরাম যাত্রা। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব গল্প আছে। যে গল্পগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে নিলে যুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সমাজ-ইতিহাসের একটা কাঠামো বা স্কেচ তৈরি হয়ে যায়। এরা প্রত্যেকে আলাদা হয়েও একই ইতিহাস-প্রবাহে বহমান। অমিয়ভূষণের ছোটগল্পকে কখনও কখনও চসার মর্মীয় ভাবা হয়। অন্তত আভলনের সরাইয়ের মধ্যে ক্যান্টারবেরি টেলস-এর যাত্রীসমূহের কথকথার ভঙ্গিটি বোধ হয় ধরাই যায়। আর মনে পড়ে যায় — রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী'-র প্রসঙ্গ। এই যুবধর্ম গল্পধারা যুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর ইতিহাসকে বাঙ্ময় করে তোলে।

প্রসঙ্গত আলোচ্য হয়ে ওঠে ষাটের দশকে লেখা 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া'। এ এমন এক গল্প যাকে কী বলা যেতে পারে? আঞ্চলিক — রাজনৈতিক — না কি ঐতিহাসিক? সুনীতিকুমারের সংজ্ঞায় ইতিহাস যেহেতু আধুনিক মানববিজ্ঞানই — যার অন্তর্ভুক্ত রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজবোধ ইত্যাকার মানুষের সামগ্রিক জীবনপ্রয়াস, সেদিক থেকে এ গল্পকে ইতিহাসচেতনারই রূপায়ণ বলা যেতে পারে। বিপ্লবোত্তর চিনের অধিগৃহীত তিববতের কোনও পার্বত্য শিখরের অধিবাসী পেমা। বিয়াল্লিশ বছরের পেমা সতেরো বছর বয়সে স্বামী থেনডুপকে লামাদের হাতে বন্দি হতে দেখেছে। তারপর শুরু হয়েছে পেমার একার জীবনযুদ্ধ। থেনডুপ ফিরে আসার দিনেই শুরু হয় পার্বত্য তিববতে চিনা অভিযান। হান মেপরের পীড়নে পেমা ধর্ষিত হয়, থেনডুপ খুন হয়। ইতিহাসের অভিঘাতে মানবতার নৃশংস হত্যালীলাটি এভাবেই সম্পন্ন হয় — শুধু নিষ্পৃহ প্রকৃতি। পাহাড়ের গায়ে গোলাপি ফুলের গুচ্ছ ফুটে থাকে একটি সোনালি ফুলের স্তবক। এ গল্পের নাট্য অন্যখানে। বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির ওপর পেমার আদ্যন্ত নির্ভরতা, সখ্যতা — ক্রমশ পেমার প্রকৃতিরই অংশবিশেষ হয়ে ওঠার সঙ্গে ইতিহাসের উত্থান পতনের সংঘাত। লামাদের শাসনব্যবস্থায়, ইংরেজদের ঔপনিবেশিকতায় আবার বিপ্লবী চিনের সংশোধনবাদিতায় পেমার জীবনপ্রয়াস তার কৃষিকাজ, লোকবিশ্বাস, দাম্পত্যস্মৃতি ও সুখ, পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতা এ সবই ওই পাহাড়ের গায়ে ফুটে থাকা ফুলের মতোই অবিকৃত থাকে। কিন্তু ইতিহাস যখন ঘরের মধ্যে হানা দেয় তখনই পেমার সমস্ত অস্তিত্ব নিষ্পেষিত হয়ে যায়। তবে কি ইতিহাসের সমাজলগ্নতাকে অস্বীকার করে পেমার নিভৃত নিঃসঙ্গ জীবনধারণই শ্রেয়? থেনডুপ ফিরে আসে পেমার জীবনে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসে ইতিহাসের যন্ত্রণা। ইতিহাস এভাবে একাকী মানুষকে আত্মসাৎ করে। ইতিহাস এ গল্পে শরীরী জান্তব হয়ে ওঠে।

আবার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাসন করার ক্ষমতাও ধারণ করে কোনও কোনও মানুষ। যেমন অষ্টবসুর প্রধান চন্দ্রধর বণিক। 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের নায়ক। এ চন্দ্রধর আমাদের চেনা চাঁদবেনে নয়। মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক নায়কের এ উপন্যাসে ঐতিহাসিক উত্তরণ হয়েছে। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত 'ইতিহাস ও সাহিত্য' বক্তৃতামালায় বলেছিলেন, 'ধর্মের ইতিহাস আছে, ঈশ্বরের ইতিহাস নেই।' ঈশ্বর প্রসাদিত মনসাদেবীর শক্র মহাদেবের আশীর্বাদধন্য চাঁদবেনে ইতিহাসের নায়ক হতে পারে না কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সমতটের বণিক নেতা, রাজার তুল্য, শাসনযন্ত্রের নিয়ন্তা বৈশ্যকুলাধিপতি চন্দ্রধর সব অবশ্যই ইতিহাসের চরিত্র। 'চাঁদ বণিকের পালায় শক্র মিত্র মশায় চাঁদকে মারখাওয়া, ক্লান্ত মানুষের পথপ্রদর্শক করে তুলেছিলেন। যার সম্পর্কে এ পালায় বলা হয় — 'খালি নিজের বুকের ভর্সাটারে আকাশে পালের মতো মেলে দিয়া হই দুরান্তরের পথে পাড়ি দেওয়ার সম্মান' একমাত্র বেঁচে থাকার লক্ষ্য। আর তার জন্য 'খালি লড়াই আর লড়াই।' অমিয়ভূষণের চন্দ্রধরের সঙ্গে এইখানে তার মিল কিন্তু এই চাঁদ কেবল সর্বহারার নেতা নয়, এ চাঁদ অভিজাত গোষ্ঠীপতি। দক্ষিণের সমতটকে পূর্ব ভারতের সঙ্গে, কায়রো, বোগদাদ, মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে আবার যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত করার হোতা চন্দ্রবণিক। এই চাঁদ বেনে শুধু আমদানি রপ্তানি করে না, করে সাংস্কৃতিক বিনিময়, গড়ে তোলে রাজনৈতিক সম্বন্ধ। বৌদ্ধবিহার থেকে চাঁদ সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থের পুঁথি যা প্রাচ্যের দ্বীপগুচ্ছে পণ্য হিসাবেই পৌঁছে দেয়। এবং এ শুধু লেখকের ঐতিহাসিক কল্পনা নয়, পুঁথি যে পণ্য ছিল ইতিহাস স্বয়ং তার সাক্ষী। এশীয় দ্বীপসমূহ জুড়ে যে বৌদ্ধসংস্কৃতির বলয় নির্মিত হয় — তার মূলে রয়েছে এই পুঁথিপণ্যের বাণিজ্য। যদিও এ সংবাদ তত পরিচিত নয়। চাঁদ যে রাজার মতো সম্মাননীয় — আমাদের বাংলার কবি বিপ্রদাস পিপলাইও তার সমর্থন করেন। চম্পকনগরীকে চাঁদের রাজধানী হিসাবে বর্ণনা করেছেন কবি। আর সমতটের 'চম্পা' চাঁদের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যকেন্দ্র তথা ঔপনিবেশিক বাজার। বাংলার চাঁদবেনের গল্প চতুর্দশ পঞ্চদশের কাহিনি। অমিয়ভূষণ চাঁদকে প্রতিস্থাপিত করেছেন দশম থেকে

দ্বাদশের মধ্যে। বৌদ্ধযুগের সমাপ্তিতে নতুন করে মাথা তুলছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। চাঁদ পূর্বাঞ্চলের ভৈরবীকে কৌশলে হস্তগত করে, হয়ত সে মহাজ্ঞানের অধিকারী বলেই। কিন্তু বিগত অভিযানে হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণকায়া 'সনকা' ফিরে আসে ভৈরবীর মধ্যে, হারিয়ে যায় ভৈরবী। ভৈরবীকে চাঁদ কুক্ষিগত করতে চায় তার অনুগত মসলিন তাঁতিদের অনুগত করার জন্য। এ ভাবেই বঙ্গের তাঁতিদের দক্ষিণের সিল্ক বোনার জন্য চম্পক নগরে চাঁদ নতুন উপনিবেশ তৈরি করে। দশম থেকে দ্বাদশ অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণের আগে পর্যন্ত সর্বভারতীয় বাণিজ্য পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক পটচিত্রের একটি ইতিহাসনির্ভর কাহিনি হয়ে ওঠে চাঁদবেনে। যদি প্রশ্ন ওঠে অমিয়ভূষণ কি কালবৈচিত্র ঘটিয়েছেন? কেননা মনসার সরাসরি উপস্থাপনা না থাকলেও মহাজ্ঞানী চাঁদের সঙ্গে ভৈরবীর নিরন্তর মানসিক সংঘাত এ উপন্যাসে দেখা যায়। এই ভৈরবীকে কেউ কেউ পোশাকে এবং চুলে সাপের মতো প্রসাধন করে পণ্যমেলক (বাজার) — এ ঘুরতে দেখেছে। এ ভৈরবী মনসার মতোই মায়াবী, তাই সনকার রূপ ধরে ভৈরবী চাঁদের পুত্রকে লালন করে। চাঁদ তাঁর সন্তানকে পায় সাগর ছেঁচে। তার সেই পুত্রের নাম সাগর। বৌদ্ধযুগে 'বিনয়বস্তু'পুঁথিতে মহাময়ূরী বিদ্যাসূত্রে মনসার উল্লেখ আছে (অমলে বিমলে নির্মলে মনসে) একাদশ দ্বাদশের রচিত দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও মনসার উল্লেখ পাই। বৌদ্ধতন্ত্রের জাঙ্গুলি তারা, বৌদ্ধ গ্রন্থ সাধনশালার জাঙ্গুলী আর মনসামঙ্গলের জাগুলি একই দেবী। সুতরাং মনসা কল্পে ভৈরবী কেন্দ্রিক চাঁদের ইতিহাস ব্যাখ্যানকে লেখক দশম একাদশের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা দিতেই পারেন। গ্রিকদের মেডুসার পোশাকে ও চুলে সাপের প্রসাধন বর্ণনা পাওয়া যায় যার প্রক্ষেপণ ভৈরবীর সাজসজ্জায়। আর দাক্ষিণাত্যে মনসা কখনও মঞ্চাম্মা, কখনও 'অম্মবরু' হিসাবে পূজিত। মনসাবিজয় কাব্যে মনসা যোগিনী রূপেই বর্ণিত। হয়ত ভৈরবীর অনুষঙ্গ অমিয়ভূষণ সেখান থেকেই অর্জন করেন। আসলে মনসা অর্থে মনের তীব্র বাসনা, কাম। বঙ্গ ভূমিতে তাঁতিদের নেত্রী ভৈরবীকে দেখে সনকাবিযুক্ত চাঁদের মনোগত অভীপ্সাই যেন ভৈরবীকে সঞ্জীবিত করে। মনসা অর্থে মূর্তিমতী বিশ্ববিদ্যাকে বোঝায়, মনসা সরস্বতীতুল্য। চাঁদ এমন সিদ্ধি অর্জন করতে চাইবেই। তাই সে ভৈরবীকে আত্মসাৎ করে। কখনও কখনও মনসামঙ্গলের চাঁদবেনের প্রক্ষেপণ ধরা যায় চন্দ্রধরের মধ্যে কিন্তু তবু এই চাঁদবেনে নিতান্ত মনসার মাহাত্ম্য প্রচারক নয়। বঙ্গে এসে চাঁদ তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসস্তূপ দেখে। ইতিহাসের সমাগত ঐক্য সম্বন্ধে লেখক সতর্ক থাকেন। সপ্তডিঙা মধুকরের অধিকারী চাঁদ একাই শুধু তার বহর নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করে না। বাণিজ্য করে তার পুত্র সাগর, বিজয়। চাঁদের প্রিয় জাহাজ মধুলুব্ধ। জাহাজ হারিয়ে হৃতবল প্রত্যাগত চাঁদকে বেশ্যা স্বতাচী কুষ্ঠরোগী বলে ঘৃণা করে — মনসার শত্রু চাঁদের এই পরিণতি মঙ্গলকাব্যে পরিচিত। কিন্তু 'চাঁদবেনে' উপাখ্যানে চন্দ্রধরকে উল্কার আগুনে ঝলসে গিয়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনে হয়েছে। প্রত্যাগত চাঁদ সাওতালি প্রাসাদে আশ্রয় নেয় সনকা ও শিশু লক্ষীন্দ্রকে নিয়ে, কেননা তার প্রতিষ্ঠিত চম্পা তারই অনুপস্থিতিতে পরহস্তগত। মঙ্গলকাব্যে সাঁতালি পর্বতে নির্মিত হয় লক্ষীন্দরের লোহার বাসর ঘর। কিন্তু এই চাঁদ নিরাপত্তার জাল ছিন্ন করে বন্ধু শূরসেনকে সারথি করে কৃষ্ণের মতোই রথারূঢ় হয়ে বণিকের সততার ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে ধাবমান হয়। কিন্তু এই চাঁদ মহাকাব্যের ম্যাজিক নায়ক। নিয়তির পীড়নে মনসাকে পূজা করতে বাধ্য হয় না কিন্তু প্রাসাদে ফিরে দেখে বৌদ্ধ শ্রমণ চারুদত্ত সনকাকে শ্রমণার বেশে সজ্জিত করে তারই সঙ্গী করেছে। সর্বস্বহারানো চাঁদ স্বীকার করে তার এই পরিণতির জন্য দায়ী তার বারবার সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার অহঙ্কার। চাঁদের সমস্ত পরিণতির দায়ভার সে নিজেই বহন করে এভাবে — 'প্রমাণ করা দরকার ছিল, আমি হৃদয়হীন নৃশংস হয়ে, বন্ধুর, অধ্যক্ষর, নাবিকদের অকারণ মৃত্যুর কারণ হইনি। ঈশ্বরসৃষ্ট সমুদ্রে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার প্রমাণ করা, মালাবার, কেরলী, সিংহলী বণিকদের কাছে অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু আলো বাতাস, আকাশ, সমুদ্রে ঈশ্বর কাউকে নির্বাচিত অধিকারী করেছেন, তা অপ্রমাণ করা দরকার ছিল। আমরা মৃত্তিকা ভাগ করে, আবার বন্দি, কেন না স্ত্রীর জন্য কুটীর তুলতে হয়, সন্তানের জন্য শস্যক্ষেত্র দরকার। কিন্তু সমুদ্র? আমি আমার বন্ধু, অধ্যক্ষ নাবিকদেরই শুধু সে পথে পাঠাই না, আমার প্রাণসমকক্ষ পুত্রকেও পাঠাই, এটাও প্রমাণ করা দরকার ছিল।' এ ভাবেই চন্দ্রধর বণিক বিজয় বুভুক্ষু মানুষের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। চাঁদবেনে শুধুই তার সময়ের ইতিবৃত্তের নায়ক নয়, এই চন্দ্রধরই তো কখনও সময়কে পেরিয়ে গিয়ে তিতাসের জলে 'অনন্ত' হয়ে তার ডিঙা ভাসায় আবার কখনও কেতুপুরের কুবের মাঝি হয়ে ময়নাদ্বীপ জয়ের জন্য কপিলার দিকে হাত বাড়ায়। এই চাঁদকে খুঁজে পাই 'মহিষকুড়ার উপকথায়' কিংবা 'মধু সাধু খাঁ'র মধ্যে। চন্দ্রধর এমনই এক সর্বজনীন নায়ক। চাঁদবেনের এই উপাখ্যান ইতিহাসের এক অভিনব নির্মাণ।

সামাজিক মানুষ যখন নিঃসঙ্গ হয়ে যায় তখন আর তাকে ইতিহাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা যায় না। যুগের পরিবেশ ব্যক্তিকে অবশ্যই তৈরি করে কিন্তু যুগের পরিবেশকে ছাপিয়ে বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকেই যায়। অমিয়ভূষণের রাজচন্দ্র, নয়নতারা, গোকুল তাঁতি, পেমা এবং অবশ্যই চন্দ্রধর বসু এভাবেই ইতিহাসের সীমাকে পেরিয়ে গিয়ে চিরকালের মানবতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এখানেই অমিয়ভূষণের ইতিহাস পরিক্রমার সাফল্য।

কবিতাগুচ্ছ

# একটি প্রেমিক প্রাণ ফিরে যাবে আদিম অপ্রাণে

## শিবনারায়ণ রায়

বিদায় বিদায় বলে
শিউলি বিছানো ভোর
বিদায় বিদায় তবে
বহ্নি হল উর্ধ্বমুখী
উতরোল, মহাশূন্যে

রুদ্রপলাশের আম্রবীথি
ফিস ফিস করে পঞ্চভূত
মরুৎ মেলেছে দুই ডানা
সাগরের ডাকে স্রোতস্বিনী
নীলকান্ত ব্যোমের বিস্তার
এবং সঙ্গমচ্যুত মৃত্তিকার গতর বিবশ।।

একদিন মহাসুখে মিলেছিল নারীগর্ভে তারা
প্রাণময় চেতনিক অমিতসম্ভব বীজকোষে
রূপ পেল অনিত্য একতা। বাড়ে, বদলায়, ভাঙে,
পাতালিক প্রেষ আর আকাশি আহ্বানে দ্বিধান্বিত
কাঁপে, খোঁজে, থমকায়, সুরভিত আপন নাভির
ইঙ্গিতে উতল হয়, অকস্মাৎ স্তম্ভিত তরাসে।।

কে তুমি? মেলেনি যদি আশি বছরেও এ প্রশ্নের
কোনই উত্তর তবে কেনই বা শিবনারায়ণ
তুমি বৃথা ভেবে মর, পেরিয়েছো আশির পাঁচিল
পঞ্চভূতে সমুদ্ভূত যে অস্মিতা যায় মুছে যাক।।

বিদায় বিদায় ঝরে সারা রাত বিবাগী বকুল
একটি প্রেমিক প্রাণ ফিরে যাবে আদিম অপ্রাণে।।

২৫.৪.২০০১

## খোয়াইয়ের সন্ধ্যা

দূরবিস্তৃত খোয়াইয়ের গম্ভীর নির্জন সন্ধ্যা
একটি নিঃসঙ্গ তাল গাছ
বিষণ্ণ পশ্চিম দিগন্তে বিরাট ডানা ছড়িয়ে
তীরবিদ্ধ সেই অগ্নিবর্ণ পাখি
দ্রুত বিলীয়মান
প্রান্তরে পিঙ্গল ঢেউয়ে মন্ত্রমুগ্ধ প্রতীক্ষা

আমি খুঁজছিলাম
যেন কিছু হারিয়েছে যা কখনও ছিল না
যেন কোনও অভিজ্ঞান হীরক অঙ্গুরীয়
অমূল্য, দ্যুতিময়, নির্মম, কাল্পনিক

দূরে তখন তুমি মিলিয়ে যাচ্ছ

হাঁটু গেড়ে খুঁজছি
তীরবিদ্ধ অগ্নিবর্ণ পাখির গূঢ় অন্ধকারে
নিঃসঙ্গ তালগাছের বিলীন ছায়ায়
প্রতীক্ষমান মাটির পিঙ্গল ঢেউয়ে
যা হয়ত হারিয়েছে, যা হয়ত আদৌ ছিল না

দূরে মিলিয়ে যাচ্ছ তুমি

এবারে রাত্রি প্রসব করবে তার প্রথম তারা
সুদূর, শুভ্রকান্ত, অর্থহীন অভিজ্ঞান।।

১৬.৪.২০০১

## ঘুম

ঘুম নামল আমাদের মাঝখানে। তোমার দু চোখ
ঢেকে রাখল ঘেরাটোপে, নিয়ে গেল ঠোঁট থেকে কেড়ে
তোমার প্রসন্ন হাসি সুরভিত কবোষ্ণ চুম্বন

বিস্মৃতির বহমান শান্ত স্রোত চুলে বিলি কেটে
সোহাগি তোমার তনু ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় উধাও
তারকা-খচিত আর ছায়াভরা রহস্যজগত

পরিশ্রুত নৈঃশব্দের মন্ত্রে আঁটা তোমার দুঠোঁট
ঘুমের আবেশমাখা স্বরে রুদ্ধ শ্রবণ কুহর
তোমার ধমনী পথে শুনতে পাই সমুদ্রগুঞ্জন।

২.

অবশেষে জেগে উঠছ ঘুমের গভীর থেকে তুমি
তোমার মুঠোয় ধরা সামুদ্রিক শঙ্খ আর তারা
তোমার দুচোখ ভরে সাগর জলের শীতলতা

চোখ মেলছ। প্রথম সে দৃষ্টিপাত আমার যাচনা
মেলাবার আগে যদি ধরতে পারি সেই দৃষ্টিপাতে
সারা রাত যে জগতে ছিলে তুমি তার অর্থখানি।

২৩.৮.২০০১

## নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল

ভেঙে পড়ল দেয়ালেরা, দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত বাগানে।
ভাঙা ঘর হয়ে উঠল প্রস্ফুটিত শূন্যের কুসুম
অনেক শতাব্দী ছিল বন্দি হয়ে মলাটের ঘেরে
চাঁদের আলোয় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রান্তরে জ্যোৎস্নার।
দাঁড়িয়ে আছে অনভ্যস্ত আঁকড়ে ধরে নৈঃশব্দ প্রাচীন।।

এদিকে লিপিরা গলে, গুঁড়ো গুঁড়ো রেখার জ্যামিতি
রূপ সমারোহ নামে অশরণ বিমূঢ় বর্ষণ।
জানি, আছি, কিংবদন্তী। আমি মেশে কালের প্রবাহে।

কিছু কি উঠছে জেগে অন্ধকার আলোর মিশ্রণে?
নামহীন ঘাসফুল? ঐকাহিক ফড়িং কি মথ?
অগ্নিময় নাভিকুণ্ড? বেদনার অসমাপ্ত মীড়?
ঈষৎ হাসির টঙে ঝুলে থাকা আধখানা মুখ?

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল আঁকড়ে ধরে নৈঃশব্দ প্রাচীন।।

২৫.৮.২০০১

## গান শোনে জলের গভীর

কুৎসিতের ওপরে ছড়াল
সুন্দরের সুরভিত রেণু
নদীতীরে গান গেয়ে যায়
হাতে তার বাউল একতারা

কণ্ঠ তার চুরি করে নিল
ভাবোন্মত্ত একটি যুবতী
আপনার শিরশ্ছেদ করে
ভাসিয়ে দিল আরক্তিম স্রোতে

যুবা আর গাইতে পারে না
গলা তার চুরি হয়ে গেছে
শান্ত মুখ নিমীলিত চোখ
মুণ্ডখানি স্রোতে ভেসে যায়

গান শোনে জলের গভীর।

৩০.৮.২০০১

# পাবলো নেরুদা-র একটি কবিতা

## অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা অনুবাদ — সে এক সোনার পাথরবাটিই হয়ত। কতদিন ধরে আমাদের ভজানো হয়ে আসছে, অনুবাদে যা হারিয়ে যায়, তা নাকি খোদ কবিতাই। তবু তো এত অনুবাদ হয় — দেশে-দেশে, কালে-কালে, নানা ভাষায়। এ-কথাটা সম্ভবত সত্যিই যে কোনও অনুবাদই হয়ত অনুবাদককে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারে না। সব সময়েই মনে হয় কী-একটা যেন হয়ে গেল — মূল কবিতার প্রতি কোনও সুবিচারই করা হল না। অনুবাদ — মনে হয়, বহু বহু ঘষামাজা পরিমার্জনা চায়। তো রবীন্দ্রনাথের **'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'** অবলম্বন করে তরুণ পাবলো নেরুদা একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতাটিরই বাংলা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেন যেন কিছুতেই মনের মতো হয়ে ওঠে না। এখানে সেই কবিতাটিরই দুটি সংস্করণ রইল — কোনটা মূলের বেশি কাছকাছি পাঠক বিচার করবেন। অন্তত আমি তো জানি না। — মা.ব.

১

আমার আকাশে যেই সন্ধ্যা নামে, তুমি আসো, মেঘ —
এবং তোমার ওই রঙরূপ আমি যে এমন ভালবাসি।
তুমি তো আমারই, ওগো, আমারই তুমি, হে নারী,
দুই ঠোঁটে অমেয় মাধুরী
এবং তোমারই প্রাণে আমার অসীম স্বপ্ন বাঁচে।

আমার মনের দীপ তোমারই দু-পায়ে ওই আলতা জোগায়,
মদ যত অম্ল হোক, তোমারই ঠোঁটে তা হয় এমন মধুর,
আমার সন্ধ্যার গানে তুমি তোলো অঢেল ফসল
তুমি যে আমারই — জানে বিজন স্বপ্নেরা সব গহন বিশ্বাসে।

তুমি যে আমার, তুমি আমারই যে, কত বার বলি চিৎকারে,
সন্ধ্যার হাওয়ার হাওয়া জানে এই বিপত্নীক স্বর —
আমারই চোখের ঘন গভীরে বেরোও তুমি শিকারের ছলে,
তুমি লুঠ করে নাও শান্ত রাত অঝোর ধারায়।

আমারই গানের জালে তুমি ধরা পড়ে গেছ, ওগো প্রিয়তমা,
এবং আমার গান জাল পাতে ওই দূর অসীম আকাশে।
তোমার দু-চোখ কাঁদে, আর তার তীরে জন্মে ওঠে
আচ্ছন্ন আমার আত্মা, তোমার চোখের জলে
আমার স্বপ্নের দেশ জাগে।



২

আমার আকাশে সন্ধ্যাবেলায় তুমি যেন এক মেঘ,
এবং তোমার রূপরঙরস সমস্ত ভালবাসি।
তুমি তো আমার, আমারই হে নারী, অধর মধুর এত
এবং তোমারই জীবনে আমার গহন স্বপ্ন বাঁচে।

আমারই মনের দিয়া রঙ মাখে তোমারই দু-পায়ে শুধু,
তোমার ঠোঁটেই অম্ল মদিরা হয়ে ওঠে সুমধুর,
আমার সান্ধ্য গানের শস্য তুমি ফলিয়েছ চাষি,
আমার বিজন স্বপ্ন কেমন জেনে গেছে তুমি আমারই।

তুমি যে আমার, আমারই, তা আমি ব'লে উঠি চিৎকারে -
অপরাহ্নের হাওয়ারা ওড়ায় পত্নীহারানো স্বর।
আমার চোখের গহন গভীরে শিকারে বেরোও তুমি,
তুমি লুঠ কর স্তব্ধ নিশীথে অঝোর জলের ধারা।

আমারই গানের জালে তুমি ধরা পড়ে গেছ প্রিয়তমা —
এবং আমার গানের এ-জাল অসীম আকাশ যেন।
তোমারই চোখের কান্নার তীরে আমার আত্মা জাগে
কেননা তোমারই চোখের বিলাপে স্বপ্নের দেশ শুরু।

হয়ত আরও অন্য কোনও ভাবে অনুবাদের চেষ্টা করা যেত। হয়ত একদিন বেরিয়ে আসবে তৃতীয় এক অনুবাদও। কিন্তু সেটাও কতটাই বা নেরুদার কবিতার কাছকাছি হবে কে জানে। নেরুদার হাতে "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা"ই বা কতটা রবীন্দ্রনাথ ছিল? — মা. ব.

ধারাবাহিক আত্মকথা

# আলোছায়ার পথিক

## তাপস সেন

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর]*

'সে দিন দুজনে দুলেছি বনে/ফুলডোরে বাঁধা ঝুলোনা' .... এই গানের সঙ্গে ১৯৪৩ সালে আমি প্রথম নৃত্যেনাট্যে আলো করেছিলাম। নৃত্যে ছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবা মাইতি আর তরুণ বালকৃষ্ণ মেনন। দিল্লির ফিরোজ শা কোটলায় অল ইন্ডিয়া ড্রামা ফেস্টিভ্যালে ওই নৃত্য-সঙ্গীতে আমি প্রথম আলোর কাজ করলাম। সেদিনের সেবা মাইতি পরে বিবাহসূত্রে সেবা মিত্র হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের সুনীতি মিত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল। সুনীতি মিত্র সেদিনের বিখ্যাত শিল্প নির্দেশক হয়ে উঠেছিলেন। পরে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে সেবা মিত্রের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র আলো করেছিলাম। এটিই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কাজ। সুনীতি মিত্রও কয়েক বছরের ব্যবধানে মারা যান। তার পর কলকাতায় এসে আরও কত 'শ্যামায়' আলো করেছি, বালকৃষ্ণ মেনন, সন্তোষ সেনগুপ্তর সুরমন্দির সূর্যমন্দিরের প্রয়োজনায় এ রকম বহু স্মৃতি মনে থাকলেও সেবা মিত্রের শ্যামার ভূমিকা এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার মনে আছে নাচের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিষয় অভিনয়ের মুহূর্তগুলো।

আমার দীর্ঘকালের সম্পর্ক দিল্লির ভারতীয় কলাকেন্দ্রের সঙ্গে, সেই সাতান্ন সালে ফিরোজ শাহ কোটলা গ্রাউন্ডে রামলীলা নৃত্যনাটক শুরু হয় দুর্গাপুজোর কয়েক দিন আগে থেকে — প্রথমবার নৃত্য পরিকল্পনা ছিল গুরু গোপীনাথের — সঙ্গীত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের (বটুকদা)। তারপর অনেক বছর ধরে রামলীলা তো করেই এসেছি দিল্লিতে এবং পরে ওই ভারতীয় কলাকেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী সুমিত্রা চরতরাম, যিনি এক কালে উদয়শঙ্করের আলমোড়া কেন্দ্রের ছাত্রী ছিলেন। ওঁদের ডি.সি.এম কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দিল্লিতে তৈরি হল নতুন মঞ্চ কোপারনিকাস মার্গে কামানি হল, ওই থিয়েটারের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল শীতাংশু মুখোপাধ্যায় — যাকে আমি প্রথম দিল্লিতে পাঠাই আইফ্যাক্স হলের প্রধান ম্যানেজার ও মঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে, সেই ছাপান সালে রক্তকরবীর অভিনয়ের ঠিক পরেই। সেখানে শীতাংশু তার কাজকর্মে এতটাই সফল হয়ে ছিল যে দিল্লির নাট্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল আইফ্যাক্স থিয়েটার ও দিল্লির নাট্য পরিবেশে। এই শীতাংশু পরে আইফ্যাক্স থিয়েটার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল নানা প্রতিকূল ঘটনায়। সবটাই আমারও জানা ছিল। তারপর ওর দক্ষতায় নিপুণভাবে প্রস্তুত হলে কামানি আর শীতাংশুকেই সুমিত্রাজি নিয়োগ করলেন ম্যানেজার হিসাবে।

আর কামানির পাশেই তৈরি হয়ে উঠল ভারতীয় কলা কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন। ঠিক আজকের রবীন্দ্রভবন, সঙ্গীতনাটক, ললিতকলা এবং সাহিত্য অকাদেমির কর্মকেন্দ্র। ভারতীয় কলা কেন্দ্র পরে নাম হয় শ্রীরামভারতীয় কলা কেন্দ্র (S.B.K.K)। সেই B.K.K. – S.B.K.K.— র সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। ওঁদের প্রায় সব নৃত্যনাট্যের আলোকপরিকল্পনার জন্য আমি আমন্ত্রিত হয়ে দিল্লি গিয়েছি — রামলীলা ছাড়াও কত ব্যালে করতে আমি দিল্লি গিয়েছি।

তার আরও আগে কমলা লালের প্রতিষ্ঠিত 'নাট্য ব্যালে সেন্টারের' জন্য গিয়েছি কৃষ্ণলীলার জন্য। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এক কালে বম্বের চিত্রজগতের যশস্বী সঙ্গীত পরিচালক শ্রী অনিল বিশ্বাস। দিল্লির কথা বলতে গেলে উদয়শঙ্করের আর একজন শিষ্যের কথা বলতে হয় — নরেন্দ্র শর্মা। উনিও এক জন সার্থক কোরিওগ্রাফার, অনেক দিন B.K.K. -এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর নিজস্ব নৃত্য সংস্থা 'ভূমিকা'। ওঁদের সভাপতি হলেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী ভবেশ সান্যাল। একজন অসাধারণ চিত্রশিল্পী, এখন ওঁর বয়স বোধহয় একশোর কাছাকাছি।

নাটকের মতো নাচের সঙ্গে আলো করবার হাতেখড়িও দিল্লিতেই হয়েছে। মণি ভট্টাচার্যের উদ্যোগে দিল্লির ওয়াই.এম.সি.এ-র সর্ব ভারতীয় কর্মী সমাবেশে, 'শিল্পী ও পাষাণী' এর মধ্যে



উল্লেখযোগ্য। ওখানেই বোধহয় দেখেছিলাম বিনয় রায়ের 'স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া', গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানেই।

আমি কলকাতার অনেক জায়গায় স্থান বদল করে শেষে এস.আর. দাস রোডে বংশী চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গী হয়ে ওরই ছোট এক তলার ঘরটাতে ঠাঁই নিলাম। পাশের বাড়িতে থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্ররা, আর আমার নতুন আস্তানার একতলায় থাকত উদয়শঙ্করের শিষ্য অনাদিপ্রসাদ। অনাদির নাচের স্কুল ইন্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ব্যালে গ্রুপেই আমি আলোক পরিকল্পনার কাজ শুরু করি নিউ এম্পায়ারে। একটি অনুষ্ঠানে বটুকদা মানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্পেশাল আইটেমে অংশ নিয়েছিলেন। অনাদি অনেকখানিই উদয়শঙ্কর প্রভাবিত ছিলেন। কোরিওগ্রাফির ব্যঞ্জনার উত্তরাধিকারী রূপে অনেকগুলি কাজ করেছিলেন — যা ভীষণভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অনাদির একক অনুষ্ঠান 'সুচরা দি গন্ধর্ব' তে আলোর অ্যাঙ্গেল, রং ও সঙ্গীতের সমাহার আমাকে আলোক পরিকল্পনায় অসম্ভব ভাবে প্ররোচিত করেছিল। সে কথা আমার প্রিয় সহযোগী প্রয়াত শীতাংশু মুখার্জি, আশিস গোস্বামী সম্পাদিত 'সুজনেষু তাপস সেন' (আলোয় আলোকময় : পৃ — ৩২) বইটিতে খুব সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছে।

অনাদির নির্দেশনায় আমি 'ওমর খৈয়াম'এ কাজ করেছিলাম। সঙ্গীত সৃষ্টিতে ছিলেন মণি দে আর ধারাভাষ্যে প্রণব রায় ও দিপালী নাগ। তবে ওই প্রযোজনায় সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল বংশীর দৃশ্য পরিকল্পনা। ওমর খৈয়ামের সময়কে মনোরম সাংকেতিকতায় তুলে ধরেছিল সে। চিত্তাকর্ষক কিন্তু স্টাইলাইজড একটা সেট করেছিল সে। সেখানে বিশাল পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্যকল্প যেমন ছিল তেমনই ভিখারিদের দৃশ্য তৈরি করেছিল পুরো মঞ্চ জুড়ে টুকরো টুকরো ছেঁড়া কম্বলের সমাবেশে। আর ওই দেখে আমার আলোর প্রয়োগ এক বিচিত্র এফেক্টের সৃষ্টি করেছিল।

কলকাতায় নৃত্যজগতে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন — যাঁর কথা খুব মনে পড়ে — প্রহলাদ দাস। তাঁর পার্ক সার্কাসের নাচের স্কুল নৃত্যভারতীর হয়ে আমি অনেক কাজ করেছি। ওঁর প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। প্রত্যেক শোয়ের ঠিক দু'দিন বাদে দেখা করতে বলতেন, আমি গেলেই একটা ভাউচার ধরিয়ে দিতেন, সই করে টাকা নিতাম। এর ব্যতিক্রম হয়নি কখনও। টাকার অঙ্কটা আজ আর বলার মতো নয়, তবুও আমি সারা জীবনে ভুলব না যে আমার ঘোর দুঃসময়েও এই প্রাপ্তিটা আমি নিশ্চিত বলেই ভাবতে পারতাম। ওঁকে আমিও মাস্টারমশাই বলে ডাকতাম। সপ্তাহে দু'দিন যেতেন জামশেদপুর, ওখানেও নাচ শেখাতে যেতেন। শিশু রঙমহলের সূচনার দিনগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টার, জাতীয় নাট্য পরিষদ ও মুখোশ ছাড়া কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে আর একটি বড় ঘটনা হল, শিশু রঙমহলের চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার (সি.এল.টি) প্রতিষ্ঠা হওয়া, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন সমর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ অফিসার। উনি প্রথমে শুরু করলেন 'রিদম হ্যান্ড রাইমস' — সেই থেকে শিশু রঙমহল।

সি.এল.টি-র প্রথম দিকের সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন হত ভারতীয় জাদুঘরের অঙ্গনে। কলকাতা ও তার বাইরের নানা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কত নাটক এবং নাচের অনুষ্ঠান হত এই উৎসবে। এই মিউজিয়ামেই হয়েছিল 'অবনপুঁয়া' — অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমরবাবুর অসামান্য নৃত্যনাটিকা। তাতে সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন প্রিয়লাল চৌধুরী, নৃত্যপরিকল্পনায় প্রহ্লাদ দাস, বালকৃষ্ণ মেনন, নাচে প্রধানভূমিকায় ছিল শর্মিলা ঠাকুর, জয়া গুহ, বীরা সেনগুপ্ত, রণিতা ঘোষ। এদের আর একটি অভিনব সৃষ্টি কিপলিং-এর কাহিনি অবলম্বনে 'মুগলী'। ওখানেই আমি সুরেশ দত্তকে প্রথম দেখি। সি.এল.টি-র উৎসবের জায়গা বদলে চলে আসে টাটার ফাঁকা জমিতে, জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই পাঁচিলটা বিচিত্র রঙে সাজানো হয়েছিল, খোঁজ নিয়ে জানলাম ওটা সুরেশ দত্তর কাজ। তারপর ওকে আমি মিনার্ভায় উৎপলের কাছে নিয়ে আসি 'কল্লোল' নাটকের সেট ডিজাইনের জন্য। সেই শুরু হল সুরেশ দত্তের নতুন ভূমিকা সেট ডিজাইনার হিসাবে। তারপর সুরেশ আমার সঙ্গে কত নাটকে কাজ করেছে মনে নেই। 'অ্যান্টনি কবিয়াল', 'নামজীবন' এরকম কত নাটক। সি.এল.টি-র উৎসব স্থানের আবারও পরিবর্তন হয়েছিল দেশপ্রিয় পার্কে এবং তিলক রোডে এদের অফিসও হয়েছিল। তখন যারা এই কাজে উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নির্মল সেনগুপ্ত, ড. বিবেক সেনগুপ্ত, করবী ঠাকুর, নির্মলকুমার ঘোষ, কমলালয় স্টোর্সের সুকুমার চক্রবর্তী, এন.এন. ভোস প্রমুখরা। আর সকলের মধ্যমণি ছিলেন সমর চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত ঢাকুরিয়া গোলপার্কের কাছে জমি পাওয়া গেল। সি.আই.টি-র সেই জমিতে নিজস্ব মঞ্চ হল — অবনমহল। অবনপুঁয়ার স্মৃতি সমরবাবু ভোলেননি। এই সময়ের মধ্যেও সি.এল.টি-র অনেক কাজে উৎসাহী মানুষেরা প্রয়াত হয়েছেন, কেউ কেউ ক্ষোভে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সব সন্ধ্যায় আলো ঝলমল উৎসবের কথা আজও আমাকে চঞ্চল করে। কি নিষ্ঠায় আর উৎসাহে মালদার মতিবাবু, নীরু, সমরদার ছোটভাই অমর চ্যাটার্জি শিল্পী ফণিভূষণবাবুরা কাজ করতেন তা আজও মনে পড়ে।

এরপর কলকাতায় আমি গীতবিতান, দক্ষিণী, রবিতীর্থ, ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্যয়ার, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাজে যুক্ত

ছিলাম। পানু পাল, শক্তি নাগ, শম্ভু ভট্টাচার্যদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এরা তখন অনেকেই বুলবুল চৌধুরীর দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি শম্ভু ভট্টাচার্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' নিয়ে এক অভিনব প্রয়াসে যুক্ত ছিলাম আমি। সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের এই প্রযোজনায় ছিল বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি, ভি.বালসারার সঙ্গীত, খালেদ চৌধুরীর চিত্রকল্প এবং আমার আলো। সাম্প্রতিক এই সৃষ্টিতে আমি আলোকপরিকল্পনা অন্য ভাবেই করেছিলাম। অনেকের কাছেই তা ভাল লেগেছে। পরবর্তী প্রজন্মের আলোকশিল্পী জয় সেনও খুব তারিফ করেছে। এটা আমার কাছে খুশির ব্যাপার।

উদয়শঙ্করের নাচ দেখে প্রথম বিস্মিত হয়েছিলাম রিগ্যাল থিয়েটারে। তারপর ওঁর আলমোড়া কেন্দ্র শেষ হয়ে গেল নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। উদয়শঙ্কর মধ্য চল্লিশে মগ্ন হলেন নৃত্যকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণে। যদিও এই শিল্পে ওঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও মাদ্রাজের জেমিনি স্টুডিওতে কাজ শুরু করলেন সম্ভবত ১৯৪৬ সালে। যত দূর মনে পড়ে ওই বছরেই 'ব্লিৎজ' পত্রিকার শেষ পাতায় খাজা আহমেদ আব্বাস নির্মিয়মাণ 'কল্পনা' ছবিটি সম্পর্কে বিস্ময়কর অনুভূতির কথা লিখেছিলেন। তখন সবে আমি ভি.শান্তারামের 'কোটনিস কী অমর কহানী', চেতন আনন্দের 'নীচানগর' আর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'ধরতী কে লাল'- দেখেছি, তখনই লেখাটা হাতে পেয়েছিলাম।

পরে সাতচল্লিশে কলকাতায়, বোধহয় লাইটহাউসে 'কল্পনা' মুক্তি পেল। ওই ছবিটা আমি সতেরো বার দেখেছি এবং সুযোগ পেলে আবারও দেখব। ক্যামেরার ভাষায় আর বিষ্ণুদাস শিরালির সঙ্গীতে এ এক অনন্য সৃষ্টি। তিনি সারাজীবনই কতরকম একস্‌পেরিমেন্ট করে গেছেন, আলাউদ্দিন খাঁ, তিমিরবরণ, কমলেশ মৈত্র এঁদের সকলকে নিয়েই তো কত অভিনব প্রয়োগ করেছেন। আলমোড়া থাকতেই উনি ছায়ানৃত্যের প্রয়োগ করলেন, বিশাল পর্দায় করলেন 'রামলীলা', কী অভিনব সৃষ্টি!

এ সব দেখেই আমার মনে ছায়ার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরে যখন গণনাট্য সংঘের আয়োজনে কয়ূর শহিদের স্মৃতিতে বিনয় রায়ের 'দে দে মোর কয়ূর বন্ধুরে...' গানে চারজন শহিদের দৃশ্য লাল আলোয় ছায়াদৃশ্যের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম। পরে সাধনা বসুর দুর্ভিক্ষের দৃশ্যে আর্কল্যাম্প দিয়ে ছায়াদৃশ্য তৈরি করেছিলাম দিল্লির রিগ্যালেই। আর অনুপ্রেরণার সূত্র ওই উদয়শঙ্কর। আমি ওঁর সঙ্গে কোনও কাজই করিনি তবু আমার বহু কাজের অনুপ্রেরণা তিনিই।

আমি ওঁর শেষ জীবনে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। সে সময়ে উনি সম্পূর্ণ একলা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছিলেন। তখন ওঁর সৃজনশীল জীবনের কত কথাই না বলেছিলেন, বিশেষত 'কল্পনা' ছবির অনেক না জানা তথ্য জেনে ছিলাম। ওঁর বিশেষত্ব হল, সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে আলো-রঙ-ছায়ার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। এই সমন্বয়ের এক আশ্চর্য সৃজনকর্ম 'শঙ্কর স্কোপ'। সেটা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে বহু দিন চলেছে। যদিও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কল্পনার মতো সার্থক নয় তবুও শিল্পের অনেকগুলি মাধ্যমের আশ্চর্য সমন্বয়সাধন বিস্মিত করে আমাকে, বিশেষত ওই বয়সে। এক দিনের কথা মনে পড়ছে, উনি তখন ম্যান্ডেভিলার দশতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যত নৃত্যানুষ্ঠান করেছেন তার একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন বিষ্ণুদাস শিরালি। ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত বিখ্যাত মঞ্চে ওর অনুষ্ঠানের সেই তালিকা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই তালিকার একটা কপি করতে দিয়েছিলেন আমাকে।

আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল, প্রসঙ্গান্তর হলেও বলে ফেলি। নিউ এম্পায়ারে সন্ধের সিনেমা শো শেষ হয়েছে রাত পৌনে নটায়। ওঁদের পর্দা উঠে যাবে, তারপর আমার ছায়ার পর্দা নামবে। কারণ ওই পর্দায় নটরাজের বিশাল ছায়ার সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে নটরাজ বন্দনা করবেন সাধনা বসু। সেটা ছিল সম্ভবত একটা সরকারি অনুষ্ঠান, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু। হাতে দশ মিনিট সময়, নটরাজের মূর্তির সামনে আলো অ্যাডজাস্ট করছি, এমন সময় দেখলাম একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সাধনা বসুর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমি তাতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রায় গায়ে হাত দিয়েই সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব – এক্ষুনি বেরিয়ে যান – গেট আউট। তখনই সাধনা বসু বলে উঠলেন, 'তাপস, ও মধু, মধু', আর নিউ এম্পায়ারের প্রবীণ স্টেজ ম্যানেজার সুলতান মিয়া বিভ্রান্তভাবে ছুটে এলেন, 'তাপস, মিস্টার বোস' — ওদের কাছে মধু বসু কত দিনের পরিচিত, মধু বসুর 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'আলিবাবা', 'দালিয়া' সে সময় অভিনব এক একটি কাজ। তাই স্টেজের ওরা চিনত সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব মধু বসুকে। ব্যাপারটা বুঝে আমি লজ্জায়-সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে গেলাম। মনে নেই পরে আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মানুষটির কাছে ক্ষমা চাইতে পেরেছিলাম কিনা। সেই মধু বসু যার 'আলিবাবা' দেখে বালক বয়সে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরে এই মধু বসুই তো উৎপল দত্তকে আবিষ্কার করেন মাইকেল মধুসূদন ছবির জন্য। সেদিনের সেই ছিপছিপে তরুণ সদ্য সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাশ করা কৃতি ছাত্র এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক ছিল অচেনা উৎপল দত্ত। মধু বসু তাকে চিনিয়ে ছিলেন।

অনাদিপ্রসাদের নাচের শিল্পীদের মধ্যে একজনকে দেখেছি যার কাজের সঙ্গে পরবর্তীকালে আমি ওতোপ্রোতভাবে



জড়িয়েছিলাম তাঁর নাম মঞ্জুশ্রী চাকী, পরে ড. পার্বতীকুমার সরকারের সঙ্গে বিয়ে হবার পর পরিচিত হলেন ড. মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। ওর এবং ওর মেয়ে রঞ্জাবতী দু'জনের জীবনই কি বৈচিত্রময়! মঞ্জুশ্রী কলকাতায় পড়াশুনা করে নাইজিরিয়ায় গিয়েছিল তারপর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যানথ্রপোলজির ওপর ডক্টরেট করে, আবার মণিপুরি ফরমের নাচ শিখেছিল গুরু আজম্ব সিং-এর কাছে। একই সঙ্গে ভরতনাট্টম নাচও শিখেছে। সব মিলিয়ে মঞ্জুশ্রী খুবই বৈচিত্রময়। অনেক বিষয়ে তার আগ্রহ, উৎসাহ এবং এ সব কাজের স্বীকৃতিও সে পেয়েছে। মঞ্জুশ্রী কন্যা রঞ্জাবতীও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিল। সফল অ্যাকাডেমিক পর্ব শেষ করে মায়ের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ডান্সারস গিল্ডে একজন সক্রিয় সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। মায়ের সঙ্গে তো বটেই স্বতন্ত্রভাবেও রঞ্জাবতী দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ওদের দু'জনের সঙ্গে আমি বহু কাজ করেছি।

'অঙ্গারে' এক সঙ্গে কাজ করার পর রবিশঙ্কর বম্বে থেকে খবর দিলেন ওঁর একটা নতুন সঙ্গীত প্রয়োগ — অনেক বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'রিদম অ্যান্ড মেলডি'তে আলো পরিকল্পনার জন্য। সেটা হয়েছিল বম্বের বিড়লা মাতুশ্রী হলে। তখন তো বম্বেতে আর কোনও ভাল হল ছিল না। ওই কাজের পর আলোক পরিকল্পনার কাজ করলাম বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে। বৈজয়ন্তীমালা রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার এক অভিনব ভাষ্য রচনা করলেন। রাজ কাপুরের স্টুডিওর বিখ্যাত শিল্প নির্দেশক এম.আর. আচরেকর শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন। শুধু বম্বেতে নয় সারা ভারতবর্ষে এই নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়েছে এবং দলবল নিয়ে আমিও গেছি সব জায়গায়। সে সময়ের আর একটা উল্লেখযোগ্য কাজ 'গীতগোবিন্দ'। পণ্ডিত যশরাজ ও তাঁর স্ত্রী মধুরা যশরাজের প্রযোজনা ছিল। মধুরা ভি.শান্তারামের মেয়ে। সেই নৃত্যনাট্যে অনেকের মধ্যে ছিলেন প্রতিমা বেদি — বছরখানেক আগে যিনি এক দুর্ঘটনায় মারা যান। ষাটের দশকে আরও একটি নৃত্যপ্রধান অনুষ্ঠান করেছিলাম 'The Splendored One'. রোশন কালাপেশির পরিচালনায় টাইম অ্যান্ড ট্যালেন্টস-এর ব্যানারে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন জুবিন মেহেতো আর শিল্প নির্দেশনায় পিলু পোচকানওয়ালা। এঁদের সঙ্গে পরে আমি আরও অনেক কাজ করেছি।

নাচের জগতে আমার পরিধি তিন শহর জুড়েই নয় আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। সাধনা বসু, প্রহ্লাদ দাস, অনাদিপ্রসাদ, জয়দেব চট্টোপাধ্যায়, বালকৃষ্ণ মেনন থেকে শুরু করে বালা সরস্বতী, মৃণালিনী সারাভাই (আমেদাবাদ), চন্দ্রলেখা (মাদ্রাজ), বৈজয়ন্তীমালা, কুমুদিনী লাখিয়া, হেমা মালিনী থেকে আজকের দেবশ্রী রায় পর্যন্ত। তাই নাটকের জগতের কথা বলতে বলতে এই জগৎটাকেও একটু ছুঁয়ে নিলাম।

**অনুলিখন : আশিস গোস্বামী**

## লেখকদের প্রতি নিবেদন

হাতে বা টাইপ করে লেখা পাঠাবেন, ফটো কপি নয়। কপি রেখে পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। কাগজের দু'দিকে লিখবেন না। মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাবেন। লেখা পাঠাবার এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে তা-অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ধারাবাহিক সন্দর্ভ

# বঙ্গসংহার এবং

## সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

*[পূর্ব প্রকাশিতের পর]*

পূর্ববাংলার কথা বলার আগে উইলফ্রেড ল্যাজারাস সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। ল্যাজারাস দক্ষিণভারতীয় খ্রিস্টান। ভারতীয় সাংবাদিকতার গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে ল্যাজারাস একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পঞ্চাশের যুগে কেবল পাকিস্তানে নয়, আলজেরিয়া ও লেবাননের গৃহযুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তিনি করেছেন। কয়েকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, যুদ্ধরত দলগুলির হাতে বন্দিও হয়েছিলেন। '৭০ এর যুগে ভারত সরকার এই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিককে সচিবের পদ মর্যাদায় প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার (পি-আই-ও) পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

পূর্ববাংলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত জেলাগুলি সফর করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান করাচি ফিরে যাওয়ার পরপরই ঢাকাস্থিত পি.টি.আই-এর প্রতিনিধি উইলফ্রেড ল্যাজারাসের সঙ্গে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। ওই সাক্ষাৎকারে যোগেনবাবু পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে সরাসরি দায়ী করলেন। ওই সাক্ষাৎকারে যোগেনবাবু যা বলেছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই ঃ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা খুলনা বরিশাল সীমান্তে দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে খবর দেয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ওই সংবাদ তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীদের কাছে গোপন রাখেন। যোগেনবাবু দিল্লি ও বোম্বাইয়ের খবরের কাগজে সংবাদ দেখে ঢাকায় তাঁর নিজের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডাকতে প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই অনুরোধকে আমল দেন না। পরে যোগেনবাবু প্রাদেশিক সরকারের কয়েকজন আধিকারিকের কাছ থেকে আরও কিছু খবর পান। তখন তিনি মন্ত্রীসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে আলোচ্য-সূচির বাইরে প্রথমেই পূর্ববাংলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন। এই বিষয় নিয়ে লিয়াকৎ আলির সঙ্গে যোগেনবাবুর কথা কাটাকাটি হয়। যোগেনবাবু গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মন্ত্রীসভায় পেশ করতে বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাতেও রাজি না হওয়ায় যোগেনবাবু বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন।

কলকাতার 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' এই চারটি খবরের কাগজে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের ওই বয়ান ব্যানার হেড-লাইনে প্রকাশিত হল। এমনকী 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাও ওই সংবাদটি ছাপতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'স্টেটসম্যান' প্রথমদিকে পূর্ব-বাংলার দাঙ্গার খবর ছাপেনি। যখন বনগাঁ সীমান্তে বিশ পঁচিশ হাজার উদ্বাস্তু এসে গিয়েছে, তখন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা 'Ghost at noon' এই শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখল। এই পত্রিকা অফিসের সামনে বিক্ষোভ হল। বিক্ষোভকারীরা বাড়িটির উপর ঢিল ছুঁড়ে চিৎকার করে বলল 'ভূতেরা ঢিল মারছে।' শহরের বহুস্থানে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল। বহুস্থানে পত্রিকার কপি পোড়ানো হল। 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'স্টেটসম্যান' বিরোধী সংবাদ বড় করে ছাপতে লাগল।

অন্যদিকে পি টি আই-র সঙ্গে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন মন্ডলের সাক্ষাৎকারের বিবরণে পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি যোগেনবাবুর বিরুদ্ধে মন্ত্রীসভার 'যৌথ দায়িত্ব' ভঙ্গের এবং মন্ত্রীসভার বৈঠকের বিবরণ ফাঁস করার অভিযোগ তুললেন। অবশেষে পি টি আই'র বিশেষ সংবাদদাতা উইলফ্রেড ল্যাজারাসকে ঢাকায় তাঁর বাসভবনে গৃহবন্দি করে রাখা হল এবং ৪৮ ঘন্টার নোটিশে পাকিস্তান সরকার ল্যাজারাসকে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করলেন। প্রাইভেট বিমান কোম্পানি 'এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া'র একটি ডাকোটা বিমান ল্যাজারাসকে ঢাকা থেকে কলকাতা নিয়ে এল। দমদম বিমানঘাঁটিতে ল্যাজারাস পেলেন এক বীরের সংবর্ধনা। কলকাতার 'প্রেস ক্লাব' ও ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এবং বহু প্রবীণ সাংবাদিক তাঁকে মাল্যভূষিত করলেন। এ ছাড়া পশ্চিমবাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের পক্ষে প্রচার শাখার জয়েন্ট ডিরেক্টর পি এস মাথুর বিমান থেকে নামামাত্র ল্যাজারাসকে মালা পরিয়ে দিলেন।



এই অবস্থার মধ্যে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের এক বিবৃতি বিতর্কের ঝড় তুলল। নুরুল আমিন সাহেব ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে বললেন, পশ্চিমবাংলা থেকে চার লাখ মুসলিম উদ্বাস্তু যশোর খুলনায় ঢুকে পড়েছে এবং এর ফলে আবার উত্তেজনা বাড়ছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গে সঙ্গে নুরুল আমিনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই চার লাখ মুসলিমের নাম-ঠিকানা চাইলেন। তিনি বললেন, কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল থেকে কিছু সংখ্যক মুসলমান চলে গিয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পূর্ববাংলার লোক। জীবিকার জন্য তারা কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বসবাস করছিল। এদিকে ৬ মার্চ (১৯৫০) বিকালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধুলা সরাভাই ও ইন্দিরা গান্ধী। সন্ধ্যায় তিনি রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায় এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস এম এল এ-দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পূর্ববাংলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এই সময় বেশ কয়েকজন কংগ্রেস এম এল এ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব করলে নেহরু বলেন, 'এটা একটি দুরূহ ব্যাপার। তবুও এই বিষয়টিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।' ৭ মার্চ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই বৈঠকের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নেহরু লোক বিনিময়ের প্রস্তাব কিন্তু সরাসরি বাতিল করে দেননি। অর্থাৎ পূর্ববাংলার পরিস্থিতি তখন এমন একটা জায়গায় এসে গিয়েছিল যাতে নেহরুর মানসিকতাও এতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল যে তিনিও ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময়ের প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি। ৭ মার্চ নেহরু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে। ড. ঘোষ নিজে ঢাকা জেলার লোক এবং তাঁর অনেক নিকট আত্মীয়স্বজন সেখানে বিপন্ন। হিন্দু মহাসভার নেতা আশুতোষ লাহিড়ীর সঙ্গেও নেহরু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। তাঁদের এই আলোচনা বেশ কিছুটা উত্তপ্ত ছিল।

৮ মার্চ সকালে নেহরু তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে সীমান্ত শহর বনগাঁ রেলস্টেশন এবং ওখানে যশোর রোডের দু'পাশে পড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের মধ্যে তিন ঘন্টা অতিবাহিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ, ডা. রায় ও নেহরু একই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্যামাপ্রসাদ অনেক বাংলা শব্দ নেহরুকে হিন্দিতে বুঝিয়ে দেন। নেহরুর সঙ্গে তাঁর কন্যা ইন্দিরা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও কংগ্রেস নেত্রী মৃদুলা সরাভাইও ছিলেন। এঁরা দু'জনে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে মেয়েদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। বনগাঁ রেলস্টেশনের ত্রাণ শিবিরে নেহরু ক্রন্দনরতা এক উদ্বাস্তু মহিলার কোল থেকে তাঁর শিশুপুত্রকে তুলে নিলেন নিজের কোলে। তাকে কিছুক্ষণ আদর করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় বললেন 'জিন্দা রহো বেটা।' এরপর নেহরু এক পাশে শ্যামাপ্রসাদ ও আর এক পাশে বিধান রায়কে নিয়ে এস-ডি-ও'র অফিসের সামনের খোলা জায়গায় উদ্বাস্তুদের কাছে বক্তৃতা করলেন। পূর্ব বাংলার এই দাঙ্গা উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে কী ভয়ানক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে সেই আশংকা তিনি উদ্বাস্তুদের কাছে প্রকাশ করলেন (নেহরুর এই বনগাঁ শহরের বক্তৃতা ভারত সরকারের পাবলিকেশনস ডিভিশন ১৯৫৫ সালে প্রকাশ করে। এই প্রকাশনার শিরোনাম দেওয়া ছিল 'Selected Speechs of Jawaharlai Nehru')। নেহরু নিজে এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন)। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে বনগাঁ শহরের আশেপাশের কয়েকটি মুসলমান পরিবার পাল্টা দাঙ্গায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই সব পরিবারের কয়েকজন এখানে নেহরুর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কিছু অসুবিধার কথা বলেন। নেহরু তখন মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায়ের সামনেই স্থানীয় এস.ডি.ও কে ওদের অসুবিধাগুলি দূর করার ব্যবস্থা নিতে বলেন।

৯ মার্চ (১৯৫০) রাতে নেহরু দিল্লি ফিরে গেলেন। এক মুহূর্ত কালক্ষেপ না করে তিনি ১০ মার্চ তারিখেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানকে তাঁর প্রথম চিঠিটি লিখলেন। চিঠিতে নেহরু-লিয়াকৎকে 'নবাবজাদা' বলে সম্বোধন করেছেন। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে যে প্রজন্মগুলি এসেছে তাদের হয়ত জানা নেই যে, লিয়াকৎ আলি খান উত্তরপ্রদেশের বড় নবাব পরিবারের সন্তান। বংশমর্যাদার জন্য অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে তিনি সকলের কাছেই 'নবাবজাদা' বলে পরিচিত ছিলেন। তাই নেহরু তাঁকে সেই নামেই সম্বোধন করেছেন। চিঠিটি হল এই ঃ

New Delhi
March 10, 1950

My dear Nawabzada,

I returned from Calcutta last night after four days stay there. These four days were very exhausting, not physically so, for I am used to physical exertion. They were exhausting for other reasons. As more and more facts came to my knowledge and the effect that those facts and occurrences had produced on people's minds, I was greatly depressed.

It is not much good from any long-term point of view for us to go on accusing each other or each other people. The burden of gappling with this difficult problem, which grows more difficult and complicated, is upon us. The consequences of not solving it are terrible to contemplate for both our countries.

I have sent you from here today two telegrams. I enclose copies of them. I earnestly hope that the declaration that I suggest, and to which you have largely agreed, will be issued by both our Governments very soon. Everyday's delay may make some difference.

One fact has impressed itself upon me and that is the widespread fear among the Hindus in East Bengal and their conviction that they have no part or lot in Pakistan, no self-respect or security. Hence their desire to get away. Whether facts justify this conviction of theirs or not, may be arguable. But their feeling this way is itself a fact to be reckoned with. It is because of this that I have become convinced, against my will, that full facilities for them to come away, under adequate protection, to West Bengal should be provided. I do not wish in the slightest to encourage a mass migration. I have fought against this for a long time past and I still believe that this would be bad for the people concerned as well as for India and Pakistan. But, in the circumstances, to talk too much about their remaining where they are and preventing them from coming away, is to irritate and frighten them all the more and to increase their panicky condition. Therefore, the situation has to be tackled in another way and that is to permit them to come, if they so want to and make them feel that they can go under sufficient protection. This declaration and feeling will itself improve the conditions and lessen the state of panic. No doubt a considerable number will come away. But I feel sure that the exodus will lessen and almost stop fairly soon. The mere knowledge that one can come away removes the sense of fear and takes away from the urgency of the desire to come. If conditions improve, as we hope they will, then the exodus will stop, and it may be, that those who had come over would think of going back. This applies to both countries. I hope, therefore, that you will agree to this. I would also like you to agree to the other proposal about exchange of guards that I have made.

I am glad that your Government has ordered that no certificates, either of income tax or domicile, should be demanded from these people, who are travelling from one country to another in these circumstances. I am grateful to you for this.

The more I think of it, the more I feel that these arrangements and declarations that we may make, good as they may be, are not enough to grapple with this situation. Some kind of a psychological approach affecting people's minds has to be made. If Gandiji was here, he would undoubtedly have known what to do in the circumstances. Unfortunately we have not got him with us. Nevertheless, we have to do something to stop this rot.

I had suggested to you that you and I should visit East and West Bengal. I had done so with no political motive and with no desire to make some kind of capital out of this tour. My sole object was to help in soothing people and in bringing back some normality. You did not agree to this proposal for the reasons you gave and thought that it would not do any good. I still think that a joint tour of ours would produce a very great impression both in East and West Bengal.

I am so anxious to do something in my individual capacity that I have been thinking repeatedly of visiting some of these places, not as Prime Minister but as a private individual. It is just possible that my visit might shake people up. I attach so much importance to this that I would gladly give up my Prime Ministership and go to East and West Bengal entirely as a private citizen and stay for a while there. I would not do so with the object of carrying on an enquiry and of casting blame, but just to give some heart and confidence to the people I meet, whether Hindus or Muslims. I think I have some capacity to do so. I wish you would agree to my doing so, that is my going to Pakistan as a private individual for a stay of a few weeks.

When I was in Calcutta, I had a message from Basanti Devi (Mrs C.R. Das) saying that she would like to go to Dacca, if her visit could do any good. She is an old lady and not too well in health, but she was anxious to be of some service in soothing ruffled feelings. Perhaps you know that her family originally came from Dacca. Her suggestion was that she might go there with her daughter (Mrs Aparna Ray) and one or two companions and stay quietly in Dacca for a while, hoping that her presence itself and meeting a few old friends might be helpful. I sent word to her that I rather liked the idea of her going, but if she did so, it should be entirely in a private capacity and with no official interference on our part. I refrained therefore from bringing this matter rather officially before you. But as I am writing to you, I am mentioning it.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehru



লিয়াকৎ আলিকে চিঠি পাঠিয়েই নেহরু নিশ্চেষ্ট থাকলেন না। কলকাতা থাকার সময় তিনি যে সব সংবাদ পেয়েছিলেন এবং দিল্লিতে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল কথা তাঁর কাছে পৌঁছে ছিল, তার ভিত্তিতে ওই দিনই অর্থাৎ ১০ মার্চ করাচিতে লিয়াকৎ আলিকে একটি পৃথক তারবার্তা পাঠালেন। তারবার্তাটি হল এই ঃ

During my four-day stay in Calcutta, I was inundated with evidence from reliable sources of events in East Bengal during the past month or more. I have been powerfully impressed as well as distressed by this evidence. I am not passing all this on to you, but the basic fact came out repeatedly that non-Muslims in East Bengal live in a state of continuous fear and apprehension and all sense of security has gone. More particularly, they fell that officials, who are very largely of one community, do no function impartially. In this connection I should like to remind you of the fact that the Dacca trouble started on February 10th by a procession and a meeting of Secretariat employees. Fiery speeches were delivered and immediately after, arson, looting and killing commenced. It is significant that Government servants should have taken the lead and organised this. Reference your telegrams 1141 of 5th March, 1145 of 6th March and 1185 of 7th March. I am giving some factual information below. Other matters being dealt with separately.

2. Your information that disturbances continue in Calcutta is not correct. Except for a few stray incidents there has been no disturbance worth mentioning in Calcutta since 12th February. Such incidents in a big city like Calcutta are not uncommon even in normal times. There was great excitement in Calcutta when reports reached the city of recent attacks on trains and steamers in East Bengal and removal of large number of passengers at wayside stations. Authorities however took effective steps immediately.

3. I am surprised to read about allegation in your telegram that Hindu young men enter railway compartments on frontier and assault Muslim passengers. The story of bangles and torn blouses being thrown about in compartments is fantastic. There is plenty of evidence about attacks on these trains in Pakistan and we would welcome a full enquiry into the matter. Indeed East Bengal Government have themselves admitted these attacks on trains near Rajbari and Santahar. although they have sought to make out that these have no communal complexion.

4. No serious disturbance has taken place in Howrah since 15th February. Some days ago there was some disturbance in mill areas in Hooghly district including Chinsurah. Casualties were dead three Hindus, twelve Muslims and nineteen unidentified and injured twelve Hindus and twenty-eight Muslims. Incidents at Telinipara and Chandernagore partly due to labour communist trouble. No further incidents in Hooghly district since 4th March. Number of refugees in Hooghly Imambara is 1200, near Victoria Jute Mills about 5000. Shelter, food, sanitary arrangements and light provided for them. Four women, and no children attacked. No villages damaged by loot or arson.

5. No incident occurred in Burdwan in March and none in Murshidabad in February or March.

6. Jalpaiguri. There was some disturbance but the account supplied to you is very great exaggeration of what occurred. In all 35 small Muslim huts were burnt and 20 small shops looted. Loss of property estimated in thousands of rupees and not in crores. Top wall of a mosque slightly damaged by fire from neighbouring house. Number of dead in Jalpaiguri town 16 Muslims, one Hindu. Most stringent measures were taken by the district officer. Refugees being looked after.

7. Your information about condition of Muslim refugees in Calcutta is unfounded. I have visited their main camp in Park Circus. Adequate relief is given.

In view of these circumstances, I hope you will not be away from Delhi during these critical days and weeks for long at any period. Apart from the satisfaction of having you here and taking your advice, your presence may be needed for some step to be taken.

There is also another aspect which is important. We have too long delayed the formation of a new Council of Ministers, which should have been done in accordance with the new Constiriution. Having postponed this again and again, we thought that the right time would be after the Budget is passed. It should be done anyhow before Parliament adjourns. This means that it should be done some time in the first half of April, preferably in the earlier part. This also will need your presence in Delhi.

I mention this so that your plans might be made accordingly and the need of upsetting them later might not arise.

Yours sincerely,
Jawaharlal

বাংলার যে প্রজন্ম বাঙালি জীবনের এই শোচনীয়তম সম্ভবত জঘন্যতম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন এবং নিষ্পেষিত হয়েছেন তাঁরা অর্ধশতাব্দী আগের এই সংঘাতের দিকে ফিরে চাইলে দেখতে পাবেন দুই বাংলার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে বারংবার অনুরোধ করেছেন যে তাঁরা দু'জনে যদি যুক্তভাবে দুই বাংলা সফর করেন, তাহলে সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়েরও সায় ছিল। কিন্তু লিয়াকৎ আলি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। নেহরুর কলকাতা অবস্থানকালে (৬-৯ মার্চ) দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তীদেবী নেহরুকে বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে তিনি কিছুদিন ঢাকা গিয়ে থাকতে চান। নেহরু এই বিষয়টি লিয়াকৎ আলিকে লেখেন। কিন্তু তাতেও পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি। এ সম্পর্কে নেহরু ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে লিখলেন ঃ

New Delhi
March 11, 1950.

My dear Bidhan,

You will notice that Liaquat Ali Khan vehemently opposes any idea about our going to the other side or vice versa. It is clear that he would not agree to it. We need not give up this matter, but for the present, I think, we should concentrate on the declaration.

I wrote a personal letter to Liaquat Ali Khan yesterday in which I dealt with these matters. In the course of the letter I mentioned that I had been approached by Basanti Devi and that she had expressed a desire to go to Dacca. I added that while I welcome this idea I did not want to make this visit an official one, and did not, therefore, wish to take any official step.

I feel it would be a good thing if Basanti Devi and her daughter, accompanied by one or two persons (not P.R. Das) went to Dacca for some time just quietly to stay there without any fuss. I do not know what steps you are taking about it. Probably Mridula, who was to have gone to Dacca, might have mentioned this to Nurul Amin informally.

I hope to be with you on the 14th forenoon.

Yours,
Jawahar

দাঙ্গার সময় এবং দেশত্যাগকালে হিন্দু মেয়েদের উপর যে নির্মম নিষ্ঠুরতার খবরগুলি খবরের কাগজে বের হচ্ছিল সে সম্পর্কে ক্ষুব্ধ অরুণা আসফ আলি নেহরুর কাছে ছুটে গিয়ে ছিলেন কিছু জানতে। অবশ্য তার আগেই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে নেহরু মৃদুলা সরাভাই এবং বাংলার বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্তকে ঢাকা পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নেহরু অরুণা আসফ আলিকে যে চিঠি লেখেন, সেটি হল এই ঃ

New Delhi
March 12, 1950

My dear Aruna,

Thank you for your letter of the 3rd March. I do not quite understand why it should require a letter from me to Krishna for him to help you to go to Russia. Anyhow I have written to him about this.

We are having a very bad time in Bengal, both East and West. The actual major incidents are over. But the situation is tense and explosive. An evil fate seems to pursue us, reducing many of us to the level of brutes.

I am going to Calcutta again in a day or two.

Yours,
Jawaharlal

১৪ মার্চ নেহরু আবার কলকাতায় আসেন। কিন্তু কলকাতা রওনা হওয়ার আগে তিনি ১৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে এক সাংঘাতিক কড়া ভাষায় একটি চিঠি লিখলেন। ওই চিঠিতে তিনি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কর্মচারীরা কীভাবে দিনের বেলায় হিন্দুদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। পূর্ব বাংলার দাঙ্গার খবর কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে পৌঁছানোর পর পশ্চিমবাংলার তখনকার চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন দ্রুত ঢাকা চলে যান সেখানকার চিফ



সেক্রেটারি নিয়াজ মহম্মদ খানের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে সুকুমার সেন কীভাবে ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের মারমুখি সরকারি কর্মচারীদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বিবরণও নেহরু ওই চিঠিতে লিয়াকৎ আলিকে জানান। চিঠিটি এই ঃ

New Delhi
March 13, 1950

My dear Nawabzada,

I have had no answer from you to my latest telegrams as well as my letter. I am writing this letter late at night and very early tomorrow morning, I am going to Calcutta again.

2. I have taken the liberty to write these rather personal letters, although there is nothing personal in them, because it is easier to write frankly in this way than if one follows the official method. I have felt as I have told you previously, that the issues before us are so serious and so dangerous in their possible consequences, that no effort should be spared to solve them. Events have occurred repeatedly which have stirred the public mind and roused it to a pitch of excitement and passion. I have myself felt the impact of these events deeply, but I have tried, to the best of my ability, not to allow myself to be swept away by emotion. It is no small matter for me to see something happening which might well mean the ruin of all that one has lived for and worked for. I would do an ill-service to such ideals as I have possessed, if I forgot them in this hour of crisis.

3. For the last two years and a half, there has been a continuing crisis in Indo-Pakistan relations. Sometimes it appeared to tone down a little and we hoped that some kind of an equilibrium would be established. But again it blazed up and now we face it in all its intensity. Ever since this Bengal affair started, I have been convinced that the time has gone by for patchwork remedies. We might not be able to cure the disease suddenly, but we have to think and apply measures to root it out, and not merely rely on some cooling ointment. Cooling ointents are good enough in their own way, because they relieve pain for a moment, but something else has got to be done to cure the patient. As a temporary measure, to relieve tension and to enable people who were struck down by fear and panic, to regain their composure and to travel from one country to another if they chose to, I suggested a joint statement to be issued by both our Governments. That was a very small thing, which hardly scratched the surface of the problem. Even that has not been agreed to by you so far. Meanwhile, time passes and the value of it, such as it was, fades away and we have to face the big problem.

4. One of the objects of the proposed declaration was to put some fear in the minds of evil-doers and to make them realise that they would have to pay for their evil deeds. That I felt was quite essential. What has happened in the past is that people who have been notorious for murder and worse have gloried in it and profited by it and posed as heroes of the people. If that is so, then we put a premium on murder and pillage. Unless we make the burden of the ill-deed follow the evil-doer, we will not stop him from a repetition of it. I suggested to you punitive fines or collective fines, as has been the practice in the past. In addition to this, the individual concerned must be made to suffer heavy penalty and some financial burden should fall on him. On the other hand those who suffer must be helped and compensated. This would not only be rough justice but also a deterrent.

5. I have been reading Pakistan newspapers as well as statements made by various persons in Pakistan. I am not much of an admirer of the press anywhere, when it comes to moments of crisis or excitement. I have disapproved strongly of the writings in some of the Indian newspapers recently. But I must confess that the way the Pakistan press has dealt with the Bengal situation has taken my breath away. Falsehood has been piled on falsehood and the most amazing inventions have been made. The Dawn, as usual, carries the palm for its inventive genius and vitriolic and malicious attacks. How can there be peace between India and Pakistan, if this kind of campaign is carried on. If facts are disputed and these wild allegations are made, it is better to have them investigated properly and thoroughly and let the truth come out, whether we like it or not. I think it is time we dealt with this matter effectively. I am prepared to face the truth, whatever it is, and take the consequences. It is an impossible situation for these charges and calumnies to be hurled at one and no opportunity for sifting them or establishing or disproving them given.

6. Much evil has happened in East and West Bengal and in Assam. It may be that I have not got all the facts. Indeed it is difficult to get all the facts. But I think we have enough to form a general judgement. I am deeply grieved at the evil deeds that have taken place in any part of Indian territory and, to the best of my ability, I want to punish those who have done them. But I am astonished when a comparison is made between what has happened during the last six weeks in India and in Pakistan. There has been a good deal of arson and looting on both sides. I believe, from such facts as I have, that much more of this has happened in East Bengal than in any part of India. Then as regards killings, I would welcome a correct estimate based on investigation. Our own information is that killings in East Bengal were very heavy indeed and ten or twenty times as much as in India.

7. I am not trying to measure or balance evil. It is bad enough wherever it occurs and it serves little purpose to justify one act by another. But when these amazing charges are made in the public press and repeated by responsible public men, then one has to think of this.

8. Perhaps you know that while killing and arson and looting are very bad, nothing moves people's passions so much as assaults on and abduction of women. Also that forcible conversions stir people's minds and passions. If a person wants to change his religion, so far as I am concerned, he is perfectly free to do so. That should be the right of every man. But compulsion in such matters is humiliation and destruction of the spirit of man.

9. I would like you to find out if there has been a single authenticated case of assault or abduction of a woman or rape in West Bengal during these past six weeks. Or if there has been any attempt at forcible conversion. To my knowledge, there has been none. But, to my knowledge again, there have been a considerable number of such cases, both of assault on and abduction of women and forcible conversion under fear of death in East Pakistan.

10. There is one other important aspect to which attention must be drawn. It is well-known that the troubles in Dacca were started on the 10th February by the Secretatiat employees there. These people nearly mobbed the Chief Secratary of the West Bengal Government and then went in procession and had a meeting. Immediately after the meeting, looting and arson and killing started. Not much investigation is necessary to prove that these Government servants were the investigators and perpetrators of all this. Individual Government servants may have misbehaved elsewhere, but I do not know of any other instance when a large group of them, functioning together, started a major disturbance and killing. If Government servants are to behave like this, what then of others, and who are the people to look to for protection. How can those people continue to live in a place where the very people who are supposed to protect them, have indulged in an orgy of killing and arson and looting.

11. I am sorry to enter into this business of making charges, but I could not help it after reading all that is being written in the Pakistan press. Also because if we have to root out this evil, we must understand it and deal with it throughly. I honestly believe that the root of this evil was the intense communal policy which led to Pakistan and which Pakistan has followed since. There is enough of communalism in India also today. But, at any rate, it is not the policy we pursue and we combat it. In Pakistan it is the State policy and this nurtures the feeling of hatred, violence and religious bigotry. I have no feeling against Islam. I have honoured it as one of the great religions of the world and some of my most intimate friends have been Muslims. But this conversion of the State into a citadel of communalism inevitably leads to far-reaching evil consequences. It makes the lives of all those in that State who do not accept the predominant religion, unhappy and insecure. It makes conflict with other States where other religions may prevail. It makes for continuing conflict between Pakistan and India till we exterminate each other or survive in some wretched form.

12. I have no business to interfere with your State policy or anything else that you may consider desirable in your country. But if that policy creates continuous conflict and leads us to the verge of complete break, then obviously I am much interested in it, as it concerns me and my country. Also if it leads to frequent killing, arson and looting and abducation of women and all the rest of it, and demoralisation of vast numbers of human beings who have been and are intimately connected with us, then I am affected.

13. I have written to you frankly, because the utmost frankness is necessary when dealing with these tremendous issues affecting vast populations. We must face them and try to solve them instead of trying to injure each other all the time and drifting to major conflict. There has been an extraordinarily unintelligent charge brought against India that we seek to put an end to Pakistan or to compel it to join India. Some foolish persons may have said so. But if anything is certain, it is this : that no intelligent Indian wants that to happen for the simple reason that it would be bad for India. We want to live at peace with Pakistan and we would rejoice in having normal friendly relations with it so that both countries may cooperate and prosper. We are on the brink of grave dangers and, as I have said above, any patchwork remedies are of little use now. I am prepared to meet you to discuss these matters in all seriousness before it becomes too late to discuss them.

14. I trust you will appreciate the spirit in which I have written this letter and forgive me for my frankness. I would not be true to myself or to you, if I did not tell you how I felt.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehru

নেহরুর নদীয়ার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি সফরের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিখিল সেন নামে একজন প্রবাসী বাঙালি। নিখিলবাবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গনে 'রয়টার' এর সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। যুদ্ধ শেষে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইটালিতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ওই সময়ে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে নেহরুর সঙ্গে ইটালিতে নিখিলবাবুর পরিচয় হয়। এই যোগসূত্র ধরেই নেহরু নিখিল সেনকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর ইটালির পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য ওই সময়কার বিভিন্ন সরকারি ফাইলে নেহরু উদ্বাস্তুদের সমস্যাবলির আলোচনাকালে বিভিন্ন নোটে ও চিঠিপত্রে নিখিল সেনের নাম উল্লেখ করেছেন (নিখিলবাবু ছিলেন জয়পুরের বিখ্যাত বাঙালি সংসার সেনের নাতি)। কিন্তু নদীয়া জেলার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি দেখে যাওয়ার পর নেহরু দিল্লিতে প্রবাসী বাঙালিদের সভায় কিছু মন্তব্য করেন, যার জন্য তিনি কলকাতার খবরের



কাগজগুলি ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের তীব্র আক্রমনের সম্মুখীন হন। নেহরু বলেছিলেন, "উদ্বাস্তুরা যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে আসছে, এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমি বেশ কিছু উদ্বাস্তু মেয়েদের গলায় সোনার হার, কানে দুল হাতে সোনার চুড়ি দেখেছি।" নেহরু সরকারি ফাইলে এই কথাগুলি লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, ফেব্রুয়ারির (১৯৫০) প্রথম সপ্তাহ থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ববাংলার দাঙ্গা যখন তুঙ্গে তখন যে ১৮ থেকে ২০ লাখ হিন্দু চলে আসে, তারা একেবারে নিঃস্ব এবং 'আনসার' (মুসলিম লিগের যুব শাখা সংগঠন) বাহিনীর লোকদের দ্বারা ট্রেনে, স্টিমার থেকে নামার সময় নদীর ঘাটে ঘাটে লুণ্ঠিত হন। কিন্তু মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানি পুলিশ 'আনসার' বাহিনীকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে আসা উদ্বাস্তুরা কিছু সোনার গহনা এবং টাকাপয়সা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ওই সময়ে পূর্ববাংলার সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্র কীভাবে মারাত্মক 'আনসার বাহিনীর' হাতে চলে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।

নেহরুর দ্বিতীয়বারের সফরের সময়ে কলকাতার কিছু মুসলমান প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীকে জানান। তাঁদের অভিযোগ ছিল, যে সব মুসলমান পরিবার কলকাতার দাঙ্গার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের শিয়ালদা স্টেশনে আক্রমন করা হচ্ছে এবং ছুরিকাঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। এ সম্পর্কে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা (যিনি বেলেঘাটায় দেশবিভাগের সময় গান্ধীজির সঙ্গে ছিলেন) নেহরুকে কিছু দুঃখের কথা লিখিতভাবে জানান। নেহরু ১৬ মার্চ কলকাতা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি হল এই —

Calcutta
March 16, 1950

My dear Bidhan,

The Pakistani press contains references to harassment and ill-treatment of Muslims at Sealdah station. I enquired about this from some people who came to see me both Hindus and Muslims. Independently they told me that this was so and indeed that there was some danger of stabbing of Muslims there.

Amtus Salam, who used to be with Gandhiji, has come back from Dacca. She tells me that some women, whom she met there (one of these used to go to Gandhiji) also complained of a great deal of harassment at Sealdah station when she was leaving

Calcutta some days ago. This women has written rather a pathetic letter to me saying that it has broken her heart to have to leave India which was her home, but conditions became impossible for her to stay on here.

I hope you will issue directions for the proper treatment and protection of Muslims at Sealdah station. This is just what we are claiming from Pakistan and we cannot behave otherwise ourselves.

It is clear that Muslims in Calcutta are in a state of extreme panic. Their departure in large numbers is sufficient proof of this.

I am informed that Hindus are taking forcible possession of many Muslim houses so as to get the Muslim into trouble.

I gave a note to Amal Home today to be shown to some newspaper editors. I asked him to give you a copy. I feel that Calcutta papers are responsible for a great deal of mischief and this must be brought home to them. They are playing very irresponsibly with fire.

Among the worst papers appear to be the R.S.S. Swastika, Jugantar, Basumati and Amrita Bazar Patrika.

The Azad paper of Dacca is coming here and doing a good deal of mischief. Amtus Salam suggested that separate compartments might be provided for Muslims going away from Calcutta by train. This is what the Pakistan people are doing for the Hindus coming here. This will afford protection to them.

The Peace Committee people came to see me today and, among other things asked for help from the police in order to trace lost people. I understand some people have a tendency to be separated from their families and get lost. This apparently applies to Muslims specially in the circumstances.

The Peace Committee people also said that some Muslim workers who were trying to get back the Muslims to their houses have been arrested apparently because they were found in the neighbourhood.

Amtus Salam told me that the East Bengal Government had done something (not much) towards rehabilitating Hindus. They had given some money to each family and sent them back to their old homes. This had produced some impression. She suggested that a beginning might be made towards rehabilitating the Muslims here who had fled from their houses or whose houses had been destroyed. I understand that a very large number of houses were destroyed in Maniktola etc.

Among the Muslim houses raides by local Hindus and East Bengal refugees is said to be House No.2. Chhaku Khansaman lane, Elmhirst Street. It is reported that the inmates were forcibly driven out and their belongings were thrown out.

According to both French reports and other reports, Ram Chatterjee and Shishi are rather notorious gangsters of Chandernagore. The French say that they have committed a good few murders. Apparently they were partly responsible for the trouble in Chandernagore and round about I am told that they have been appointed as relief workers for Muslim refugees in Chandernagore and are securing certificates of good character from the Muslims.

I am mentioning this as it has been decided to make a further change in the administration of Chandernagore.

You remember that the merchants who came to see me were very anxious that their Muslim workers should go to the factories. Some have apparently gone back, but on the other hand, I understand that there is a tendency to push them away to Pakistan by train. If they go away, our production will suffer.

Individual stabbings appear to continue in and round about Calcutta. It is difficult to deal with this kind of thing. Nevertheless, this has a very bad effect both in India and in Pakistan. On the whole, East Bengal appears to be, for the moment, free from such incidents.

The Hindu Mahasabha and R.S.S. propaganda both for war and for a Hindu State has a very bad effect in the present tense situation. I wonder if this can be discouraged.

Yours

Jawaharlal

১৬ মার্চ রাতে নেহরু কলকাতা থেকে দিল্লি ফেরার পর জানতে পারেন গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটে ও রাজবাড়ি (ফরিদপুর জেলার সদর) স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নারী নিগ্রহ লাঞ্ছনা ও



অপহরণের ঘটনাগুলি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি করাচিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে এই তারবার্তাটি পাঠালেন ঃ

Cable to Liaquat Ali Khan[1]

I have just received in Calcutta your three telegrams Nos. 1291 and 1294 of 13th March and 1302 of 14th March.

I regret I cannot accept explanation of Goalundo steamer incident.[2] On the face of it this explanation is extraordinary and our information is opposed to this.

Regarding declaration would like you to consider matters referred to in my letter to you dated 13th March[3]. I feel that at this stage mere repetition of what has been separately said already would be rather strange and produce little impression. Some reference to basic problems and method of implementation appears necessary.

I am returning to Delhi this afternoon.

এরপর নেহরু তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে এমন একটি চিঠি লিখলেন যাতে পূর্ববাংলার ঘটনাবলি তাঁর যে কতখানি মর্মবেদনার কারণ হয়ে পড়েছে, তা ধরা পড়ে। বিজয়লক্ষ্মী তখন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত। তিনি তাঁকে লিখলেন, "বাংলার পরিস্থিতি ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে।" এই চিঠিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এ কথা ভেবেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকেও তিনি বিপন্ন মানুষের কাজে যখন লাগতে পারছেন না, তখন একজন 'সাধারণ মানুষ' হিসাবেই ওই মানুষগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান। বিজয়লক্ষ্মীর ডাক নাম 'নন' এবং ওই নামেই তিনি বিজয়লক্ষ্মীকে এই চিঠি লিখলেন —

1. Calcutta. Undated. Probably seen on 16 March 1950. J.N. Collection.

2. Liaquat Ali had written on 13 March, that facts as ascertained from the passengers on the steamer Goalundo were that at Rajbari a some Muslims and Hindus approached passengers and requested them not to leave their homes unnecessarily for West Bengal only to be put to extreme discomfort as refugees. About 200 passengers after persuassion disembarked and later took a steamer back to their homes. Allegations of attacks and molestation by local hooligans on these people were said to be false.

3. On 14 March, Liaquat Ali had referred to his modifications made in an earlier telegram and the suggestion that the declaration should be issued on 16 March without any further delay.

New Delhi
March 20, 1950

Dear Nan,

... I am writing to you today, however, rather briefly, to tell you about something which you may consider of some importance. Do you remember my hinting to you, just before you went, about the possibility of my resignation from the Prime Ministership. I can advance very many reasons for this and it would be possible to advance a good many reasons against it. But the real reason is a hunch or call it what you will. Recent developments have driven me more and more to the same conclusion. These developments have taken place both in our New Delhi sphere and in Bengal. The Bengal situation is developing very dangerously for the future of India. I feel troubled at the prospect and my whole nature rebels against sitting here in an office, when I should be up and doing. Of course, a Prime Minister can do much. But in the circumstances I cannot do much. I want to go back for a while at least to the people and to try to influence them. Many of them are moving in a wrong direction. I am not vain enough to imagine that I can make very much difference. Indeed I do not quite know what I shall do. But negatively, I feel sure that my mere going away will do good and will shake up things.

So today I spoke frankly and quietly to the Cabinet, I have also written to the President. This does not mean that I am resigning immediately. It is some kind of a previous notice which I thought only fair to all parties concerned. My present intention is to take further action sometime in the first week of April, after the budget is passed.

Presumably I shall go to Allahabad from here soon after and then possibly to Bengal. But I really do not know what I shall do then.

I want to tell you not to worry at all. Also that you must stick to your post, unless something happens which makes it impossible for you to do so. It would be improper and undesirable for you to take any action, simply because I have faded out of the Governmental picture.

This must of course be kept absolutely secret.

Yours

Jawaharlal

(সমাপ্ত)

# ধান চাল ভাত

## অমিতাভ দাশগুপ্ত

শাদা কাগজের জমিতে
এই যে একটির পর একটি শব্দ রোপন,
এর নাম — ধান।

চোখের সবটুকু আলো নিংড়ে
এই যে একটির পর একটি কবিতা লিখে যাওয়া,
এর নাম — ফসল।

মাঠের শস্য এল ঘরের দাওয়ায়।
তা ঝাড়াই বাছাই ক'রে ছাপা হল যে কবিতার বই,
তার নাম — চাল।

সেই চাল ফুটিয়ে পাঠকদের সামনে
কবি যা বেড়ে দেন,
তা — অন্ন।

এখন আপনারাই দেখুন
ওই ভাত ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়েছে কি না।
আপনারা বসে পড়ুন। আমি যাই।
ফের বীজতলা তৈরির কাজ তো আমাকে
এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

# যে বাঁচে

## পবিত্র মুখোপাধ্যায়

যে বাঁচে, পাথর থেকে রস নিঙড়ে নিয়ে তবে বাঁচে
দশটা আঙুল তার অশথের ব্রহ্মাস্ত্র-শেকড়
শাখাপ্রশাখায় রোদ শুষে নিয়ে
নিঃশব্দে বানায়
কি বিপুল জৈবরস। খায় —
প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে
তাবৎ মেধার সৃষ্ট
দান।

আমাদের বেঁচে থাকা জড়ো করে নিত্য অসম্মান।
শেকড়ের মাটি এতো আলগা, আঙুল
এমনই নির্ভার — হেঁটে গেলে বা দাঁড়ালে
চিহ্ন তার পড়ে না ধুলোয়;
চেতন বা নিশ্চেতন, কেউ
তা নিয়ে সজাগ
হয় না। মৃতই —
ভাবে তারা।

আজকের সভ্যতা উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা —
যতদূর চোখ যায় খর্বকায় নারী ও পুরুষ
শান্তি নয়, সাফল্যের পরিসংখ্যানের উর্ধ্বরেখা
বুঝে নিতে অত্যধিক মনোযোগী হতে
দেখি। চোখ, প্রতিভায় নয়, লোভে
জ্বলে; করে কেতাবি সৌজন্য বিনিময়
দেখা হলে; তারপর —
দু'জন দু'দিকে।

এ রকম নিরাশ্রয় পৃথিবীতে যারা আছি টিকে,
জৈবিক খিদের উর্ধ্বে প্রেম নেই, আছি পরস্পর
চুক্তিবদ্ধ সংসর্গের দায়
পালনের অসহ্য দুর্ভার
বুকে নিয়ে, তারা
বেঁচে, আছি মরে।

বসাতে পারিনি দশ আঙুল বটের মতো
নির্দয় পাথরে।

# বুঃ বঃ

## ঈশ্বর ত্রিপাঠী

ঝিলকিয়ে উঠেছ তুমি, সমুদ্র যদিও ছিল কাছে
আকাশ কম্পিত চোখে, জন্ম মৃত্যু হাজার হাজার
ভালবাসা থেকে প্রেম, স্পর্শ! স্পর্শ! আগুনের শাঁস,
গড়িয়ে পায়ের নীচে বয়ে যেত অদ্বিতীয় তোমারই অসীম সময় —

রীতিমতো বৈরী ছিল তবুও তা, নিশ্চয়তা জীবনে উধাও
আশা অবসাদ স্বস্তি ক্ষণিকের, দম আটকে আসত প্রায়শই
দেবতার অস্বীকারে নতুন দেবতা তুমি উঠেছিলে জেগে
মানুষের মুখ নিয়ে অবিকল, অক্ষম, দুর্বল আর অভিশপ্ত, ক্ষুধিত যৌবন

অমৃত পিপাসা ছিল, তাই তুমি ভারতীয় হয়েও বিশ্বের
নক্ষত্রসভায় স্থান পেয়ে গেছ, গন্ধ রূপে আছ আজও মৃদু
ব্যথা ব্যর্থ হয়নি তো, সহজাত রাজত্বের ঋণ
ভাষার কামুক দল বয়ে চলে এখনও, মায়াবি টেবিল ছুঁতে ছোটে

এই দূর প্রান্ত থেকে জন্মদিনে, বুঝেসুঝে তোমারই মতো
আত্মার আপন সত্তা যে মুহূর্ত —
মৃত্যুর মৃদঙ্গ তার কাছে কিছু নয়।

# ওই মুখ

## গৌতম হাজরা

যেন সংগ্রহশালা থেকে উঠে এল প্রিয় ওই মুখ

নিটোল চাঁদের জ্যোৎস্না আজও মসৃণ মুখে লেগে আছে
যেন অবাকলাগা হালকা বাতাসে উড়ে উড়ে ভাসবে
এখনই

ঘাতকের হিংস্রতা ছুঁয়ে যাবে এ রকম কারুকার্য নেই
দু'হাতে সরিয়ে দিলে আচ্ছন্ন কুয়াশা ও আলো

প্রিয় মুখ, উজ্জ্বলতা, আলো যত্ন করে ধরে রাখা
আছে
আশ্চর্য মাটির মূর্তি কথা বলে, বুকের দু'পাশে
উঠে আসে।

# নিষিদ্ধ জাগরণ

## সৌমিত্র নন্দী

শীত শেষ হয়ে এল। ফুরিয়ে এল খোলস-আড়ালে ঘুম।
পেরিয়ে এলাম দীর্ঘ শান্ত হিম ওষধি করিডোর। এখন
সাদা ও স্বপ্নহীন শীতঘুম শরীর থেকে উঠে এসে
নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছে খোলসের পরতে পরতে। এখন
গাঢ় ও গম্ভীর ছায়া সরিয়ে ফিনকি দিয়ে তীব্র সুরে
নিজেদের মেলে ধরছে উষ্ণতার বিন্দুগুলি, আর,
এই গভীর বিস্মৃতির পরেও আমার মনে পড়ছে তোমাকে।
আমার মনে পড়ছে তোমার সমস্ত শরীর কীভাবে ঢেকে গিয়েছিল
হলুদ, শুকনো পাতায়; শীত শুরুর সময়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
তুমি উঠে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই খসে পড়তে লাগল প্রাচীনগন্ধ পাতাগুলি,
আর, আমারও শরীর এখন জ্বলছে অমোঘ উত্তাপে।
এই তো আমার শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নির্বিকার ঘুমন্ত খোলস।

তারপর
মৃদু
অপেক্ষা।

একটি মাতাল ছোবলের
ক্রমশ উত্থান ....

# বংশক্রম

## সুবীর ঘোষ

হাত কত লম্বা হলে শিকড়ের তলদেশ
ছুঁয়ে ফেলা যায়
তলদেশে বাস্তুসাপ শীতঘুমে অচেতন হয়ে
আগলায় অপসৃয়মান সভ্যতার শিলাখণ্ডগুলি।
শিকড় আরাম দেয়।
শীতল ধূসর মাটি জন্মদেবতার মুদ্রাদোষ
লিখে রেখে দেয়।
আমাদের জীবনের পাতাগুলি একদিন সবুজ ছিল
এখন অনেক লোক চলে গেছে ভিন্ন পথে
এদিক-ওদিক
যারা আছে তারা আমাদের চেনে না আদপে।
আমাদের গল্পগুলি বিন্দুমাত্র সুখ দেয় না তাদের।
এখন বস্তুত একা; শীতঘুমে বাস্তুসাপ যদি হই
বর্তায় না অনুপল গুনেগেঁথে
হিসেব মেলানোর দায়
এমনও তো হতে পারে
শেষ সূর্য ডুবে গেলে অন্ধকার কাটবে না আর
শেষ নারী চলে গেলে নিরুপায় পুরুষের
বংশক্রম রক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

# যে কথার অর্থ নেই

## মুহাম্মদ ফজলে কাদের

যে কথার অর্থ আছে
তা তো আমি বলি সবার কাছে
কিন্তু তোমার কাছে যে বলতে চাই
সেই কথা যার কোনও অর্থ নেই

একটা সময় ছিল তুমি সে কথা শুনতে
আর শুনে খুশিই হতে
তবে এখন কেন আমি পারি না
তোমায় বলতে সেই কথা যার কোনও অর্থ নেই

এখন কেন বোঝ না, বা বুঝতে চাও না
যে কথার অর্থ নেই, সে আমার নিজের কথা,
আমার মনের কথা
কাকেই বা বলি সে কথা
এখন কে আছে আমার আপনার

হে ঈশ্বর, তুমি কি হবে আমার আপনার
তুমি কি শুনবে আমার মনের কথা
যে কথার কোনও অর্থ নেই।

# তর্পণ

## (অমিয়ভূষণ স্মরণে)

## অশোককুমার দত্ত

যাব বললেই যাওয়া যায়?
এই যে ছড়িয়ে রেখেছ গাছপালা —
নদী-জল, অদ্ভুত মায়াবি বিষাদ।
রেণু-দুঃখ, কবিতা-যাপন ব্রাত্য-নিষাদ।
যাব বললেই কি যাওয়া যায়?
আমরা সব অন্তেবাসী এবার
ভূষণ রহিত হয়ে পরিধানে নেব বীরমৌলি।
তুমিও তো চেয়েছিলে তাই —
ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত, গঙ্গাজলে অন্তর্জলি।

# যে কথার অর্থ নেই

## মুহাম্মদ ফজলে কাদের

যে কথার অর্থ আছে
তা তো আমি বলি সবার কাছে
কিন্তু তোমার কাছে যে বলতে চাই
সেই কথা যার কোনও অর্থ নেই

একটা সময় ছিল তুমি সে কথা শুনতে
আর শুনে খুশিই হতে
তবে এখন কেন আমি পারি না
তোমায় বলতে সেই কথা যার কোনও অর্থ নেই

এখন কেন বোঝ না, বা বুঝতে চাও না
যে কথার অর্থ নেই, সে আমার নিজের কথা,
আমার মনের কথা
কাকেই বা বলি সে কথা
এখন কে আছে আমার আপনার

হে ঈশ্বর, তুমি কি হবে আমার আপনার
তুমি কি শুনবে আমার মনের কথা
যে কথার কোনও অর্থ নেই।

# তর্পণ

(অমিয়ভূষণ স্মরণে)

## অশোককুমার দত্ত

যাব বললেই যাওয়া যায়?
এই যে ছড়িয়ে রেখেছ গাছপালা —
নদী-জল, অদ্ভুত মায়াবি বিষাদ।
রেণু-দুঃখ, কবিতা-যাপন ব্রাত্য-নিষাদ।
যাব বললেই কি যাওয়া যায়?
আমরা সব অন্তেবাসী এবার
ভূষণ রহিত হয়ে পরিধানে নেব বীরমৌলি।
তুমিও তো চেয়েছিলে তাই —
ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত, গঙ্গাজলে অন্তর্জলি।

ছোটগল্প

# ব্রাত্য

## আরতি মুখোপাধ্যায়

আকাশের মতন মনটাও ঢেকে আছে থমথমে নিকষ কালো অন্ধকারে। ঝকঝকে ফ্ল্যাট, কাজের লোক, বুদ্ধিদীপ্ত রূপসী মেয়ে, ননইনটারফেয়ারিং স্বামী, নিজের এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সেও হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন দূরত্বে ফেলে আসা যৌবনের এক অনুগত প্রেমিক — তবুও। কদিন ধরেই রিমির সঙ্গে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। বেশ বুঝতে পারছি রিমি ওর নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থাকবে। এতদিন ধরে তাসের ওপর তাস তারও ওপর ... তিল তিল করে যে স্বপ্ন মহলকে ইচ্ছাপূরণের ঝাড়বাতিতে সাজিয়েছি, রিমির জিদ তাকে ধূলিসাৎ করবার জন্য প্রস্তুত। ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে অরিজিৎ প্রভাতী চায়ের দ্বিতীয় কাপের সঙ্গে খবরের কাগজে নিমগ্ন। সাংসারিক ঝড়ঝঞ্ঝার কোনও খবর ওই ছাপার অক্ষরে নেই — অতএব আমার সঙ্গে রিনির এই ঠান্ডা যুদ্ধের বারুদ গন্ধের কোনও বাতাসই ওকে উতলা করছে না।

মাথার ওপরের সেই নিকষ কালো মেঘ এখন ধারাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত। বৃষ্টি এল বলে। অরিজিতের বেরনো ইচ্ছা নির্ভর। গত বছর ডিসেম্বরে ও স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছে, কোথায় কোন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে তা আমার জানার আগ্রহ হয়নি। আশাহীন, অলস এমন একটা লোকের সঙ্গে যোগাযোগটাকেই এখনও এক দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়। কি মোহে যে....। বেরোবার ইচ্ছা না থাকলেও বেরোতে হবে। ফ্ল্যাটের এই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। ভাগ্যিস চাকরিটা ছিল, না হলে কবেই বুঝি বা ফসিল হয়ে যেতাম। দীর্ঘ তিরিশটা বছরের অভ্যেস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের জল হাওয়ায় উজ্জ্বলবর্ণের সমাদর — মাঝে মাঝে ভাবি আমার এই পাঁচফুট এক ইঞ্চির কাঠামোয়, মুখশ্রীর এই অতি সাধারণ গঠনে, যদি রংটা উজ্জ্বল না ....! ভাবতে চাই না, অনেক কিছুকেই ভুলে থাকতে চাই। অনেক ক্ষণ থেকেই বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করছি। ব্লাড প্রেসারটা একবার চেক আপ করানো উচিত। কিন্তু ক্লান্তির পাহাড় ডিঙিয়ে একটা সফল জীবনের জন্য এই আবশ্যিক করণীয় কাজগুলো করতেও এখন আর আমার মন চায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস নাভি থেকে উঠে, বুকের পাঁজর মথিত করে নিঃসৃত হল। রিনি ওর ঘরে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে হয় কবিতা না হয় গানে বাহিরভুবন ভুলে আছে। আমার ব্যাপারে ও উদাসীন থাকার চেষ্টা করছে। রিনির মেদ-মজ্জা, রক্তকণিকা, ওর বড় হয়ে ওঠা আমার তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের সুতোয় গাঁথা। কেমন যেন পরবাসী মনে হচ্ছে নিজেকে। তিনটি প্রাণী, তিনটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন ক্রমাগতই একে অপরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছি। এই জন্যই কি এতদিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি মেয়েটাকে অন্তত নিজের অতৃপ্ত স্বপ্নের সাজে সাজাতে....!

রেণু খাবারের থালা টেবিলে রেখে গেছে। পরম মমতায় এই সংসারটাকে সামলায় ও। অথচ ও তো নিতান্তই একটা কাজের মেয়ে। আজ না হয় কাল পাঁচ বাড়ি খেটে খাওয়া ওর মা নিশ্চয়ই ওর বিয়ে দিয়ে দেবে। ভয় হয় রেণু চলে গেলে এই নিঃসঙ্গ সংসার আরও নিঝুম হয়ে পড়বে। তবুও তো অরিজিৎ রিনির সঙ্গে ওর সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্কটা আছে। ওর থেকে বয়সে ছোট হলেও রিনির হাজার বায়নাক্কা মেটায় রেণু। অরিজিৎ-এর অসময়ের চা, সময়ের হিং এর কচুরি, পোস্তোর বড়া, দুধসাদা জামাকাপড় — রেণুর প্রযত্নে। অনেক বার ভেবেছি না হয় থাকলই আমাদের কাছে মেয়ের মতন, আমাদেরও তো কোনও অবলম্বন থাকবে না — কিন্তু সেই ভাবনাকে বেশি দুর এগোতে





দিইনি, সরিয়ে দিয়েছি মন থেকে পরের মেয়ের ওপর এই মায়ার বন্ধন — আমার আলগা মুঠির সংসার নিঃশব্দ উপহাস করবে — আমার স্বার্থপরতা খুঁজে বের করবে এ নিশ্চিত।

(২)

চার্টার্ড বাসটা চলে গেছে। ভি.আই.পি রোড থেকে বাসে ওঠা এক কঠিন সমস্যা, বিশেষত অফিস টাইমে। টারমিনাস কাছে হলেও তবু কথা ছিল, কিন্তু এই মাঝপথ থেকে ....। হুস্ হুস্ করে বাস বেরিয়ে যাচ্ছে আর আমার রক্তচাপ ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। কখন যে নিঃশব্দে একটি লৌহধূসর রঙের স্যানট্রো একেবারেই আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে — খেয়াল করিনি। কিছু হয়ত বলেই ফেলতাম যদি না চালিকা সহাস্যে দরজা খুলে দিয়ে বলে উঠত 'উঠে আয়'।

— 'মন্দিরা তুই? এ সময়ে?'

— 'আগে উঠে আয়, পরে কথা হবে'। শীতলতার হিমানি প্রলেপে স্যানট্রোর অন্তঃপুরে সুখের সর মাখানো। শরীরটা কেঁপে ওঠে। মন্দিরার সঙ্গে বন্ধুত্ব ইউনিভার্সিটির সেই সোনাঝরা দিনগুলি থেকে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, কফি হাউসের দমবন্ধ বাতাসে উদ্দাম আড্ডা, গঙ্গার ধার, বেলুড় মঠ, কি না কি ভাবে দিনগুলিকে উপভোগ করা। আমার সরকারি চাকরি পাওয়া আর মন্দিরার লাইব্রেরিয়ানশিপ করে সায়েন্স কলেজে জয়েন করা। একরাশ ঝরাপাতার মতন দিনগুলো কেমন উন্মনা হয়ে গেল। জীবিকার ভিন্নপথ কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধনকে ছিন্ন করেনি। টেলিফোনে, অদিতির বাড়ির আড্ডায় সম্পর্কের সুতো জোড়া আছে। — 'কিরে কিছু বল? চুপ করে আছিস কেন? নিশ্চয়ই অফিস? আমিও এসপ্ল্যানেডেই যাব। ভালই হল কতদিন পরে দেখা বল তো আজ অফিস কাটবি? আমার একটু মার্কেটিং করার আছে রে...' সেই কৃষ্ণকলি মন্দিরা এখন আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্ত এক সফল নারী। চলনে বলনে আচরণে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চিফ একজিকিউটিভের স্ত্রী। — 'নারে আজ অফিস যেতেই হবে, অনেক কাজ জমে আছে ... আর একদিন না হয় আড্ডা মারা যাবে। তোর ছেলের খবর কি? ও কী করছে এখন?' আমি পাশ কাটাতে যাই। 'ওর জন্যই তো মার্কেটিং। নেক্সট মান্থে লন্ডন যাচ্ছে। এখানকার ডিগ্রি নেওয়া শেষ। হায়ার স্টাডিজের জন্য ডা. সুপ্রতীক দাঁ এখন প্রবাসের পথে।' পুত্রগর্বে মন্দিরা অ্যাকসেলেটরে বোধ হয় একটু জোরেই চাপ দিল।

'তোর অরিজিৎ আর রিনি কেমন আছে? কী করছে এখন?' বড় দুর্বল জায়গায় হাত রেখেছে মন্দিরা। 'ওই চলছে একরকম' সন্তর্পণে ওর হাতটা সরিয়ে দিই। এস.এন. ব্যানার্জি রোডে লাল আলো পথ আটকাল। পথেই নেমে পড়ি। দরজার কাঁচ তুলতে তুলতে মন্দিরার কণ্ঠ ভেসে আসে — 'ফোন করিস, সুব্রত এখনও কিন্তু তোর কথা বলে', মিষ্টি হাসিতে নম্র কৌতুক। সবুজ সংকেতে মন্দিরা এগিয়ে যায় — এক রাশ চিন্তার মাঝখানে আমি স্থির।

আড্ডাপ্রিয় বন্ধুদের ক্যান্টিন জমায়েত। এই সব আড্ডার মধ্যমণি আমি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই সমান তালে আলোচনা চলে। পরিবেশ থেকে পলিটিক্স, আগুন থেকে জল। কিন্তু আজ .... নিস্তরঙ্গ জলে নিক্ষিপ্ত মন্দিরার হাতের ঢিলটি নিপুণ দক্ষতায় স্মৃতির জলাবর্ত তৈরি করেই চলেছে। 'সুব্রত কিন্তু এখনও তোর কথা বলে' কী কথা বলে সুব্রত? ঔৎসুক্য ঝাঁপির ঢাকনা খুলতে চাইছে ভিতরে সাঁই সাঁই তপ্ত শ্বাস। অনিল, সুব্রত, শ্রীধর, মধু, বিকাশ, রূপক ....

টানা তিনটি বছর একান্ত অনুগত থেকে আমার সেবা করে গেছে সুব্রত। নোটের কপি করে দেওয়া, লাইব্রেরি থেকে বই জোগাড়, নিত্যদিন পায়ে হেঁটে ইউনিভার্সিটি থেকে শিয়ালদা স্টেশন, লোকাল ট্রেনের ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আগলিয়ে ট্রেনে তুলে দেওয়া – তারপর নিঃশব্দ প্রতীক্ষা যতক্ষণ না ট্রেনটি স্টেশন মুক্ত হচ্ছে ত-ত-ক্ষণ। পরদিন সাগ্রহ প্রশ্ন – 'বসতে পেয়েছিলে? কোনও কষ্ট হয়নি তো....?' মন্দিরা, সুকন্যা, সোমা পিছনে লাগত — 'মোমের পুতুল গলে যাওনি তো? ভাগ্যিস রংটা পেয়েছিলি, পোড়া রঙের জন্যই স্রেফ মার খেয়ে গেলাম রে।' অজান্তেই দৃষ্টি চলে যায় নীল শিরার আলপনায় ক্লিষ্ট তামাটে রঙের হাত দুটিতে। দমকা হাওয়ায় খুলে যায় কফি হাউসের নিকোটিনের তীব্র ঝাঁঝালো এক সন্ধ্যার দীর্ণ গবাক্ষ।

সুব্রত কাতর অনুনয়ে ভেঙে পড়েছিল, 'সুদেষ্ণা প্লিজ, একবার চলো, আমি বন্ধুদের কথা দিয়েছি... বড় লজ্জা পাব...।' 'আমি তো কাউকেই চিনি না।' ধনুক ভাঙা পণে সুব্রতও তখন বোধহয় বেপরোয়া। 'চেনার কী আছে? আমারই তো বন্ধু ... বড় ভাল ছেলে ওরা। প্লিজ...।' তিনটি বছরের দাবিহীন আনুগত্য। অনুকম্পারও লজ্জা আছে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আসব কাল।' সুব্রতর আকাশ তখন পলাশ লাল। সে কি উন্মাদনা, সে কি আকিঞ্চন। কে যে কার পাশে বসাবে, কে যে কোন ফুলে অর্ঘ্য দেবে, কার লুকনো প্রতিভা কে যে কীভাবে ব্যক্ত করবে .... ধুম লেগেছিল হৃৎকমলে। দেবীবন্দনার অর্ঘ্যে কেউ আনত জীবনানন্দের ছেঁড়া পাতা, কেউ বা ক্লান্তিহীন রাতজাগা চোখে লিখে ফেলত উপাসনার মঙ্গলকাব্য। কোন একটা নেশার ঘোর একটা আচ্ছন্নতা আমাকেও ভর করে থাকত সারাক্ষণ। অঞ্জলি, পুরুষের আঁখি বন্দনা .... আমার বিলাসী মনে গড়ে তুলত অজানা আত্মতৃপ্তির নরম সুখ।

সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন। কাকভোজা কটি যুবক যুবতীর ছত্রাতপ চির নতুন চিরপুরাতন সেই কফি হাউস। শিরশির করে একটা কাঁপুনি বুকের মধ্যে প্রিম্ প্রিম্ করে বাজছিল। সেই মাদলের সুরে কখন জানি না আমার হাত ছুঁয়ে ফেলেছিল মাস-মাইনে টিউশনের পাঁচশো কুড়ি টাকার অধীশ্বর সুব্রত হাত। তড়িদাহত সুব্রত সব হিসাব ভুলে গিয়ে মহাভোজের অর্ডার দিয়ে ছিল — বন্ধুরা হতবাক। এর পরের ইতিহাস .... আমারই আগ্রহে ওরা ওদের নাম ঠিকানাগুলো লিখে দিয়েছিল আমার নীল ডাইরির সাদা পাতায়, আর মুহূর্তেই সেই সাদা পাতাটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল সাধু খাঁ, নাগ, দাঁ, অধিকারী, পাণ্ডে, দাম, পদবিওলির নির্মল আত্মপ্রকাশে। চমকে উঠেছিলাম — কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি আজীবন আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে এমন একটা না-পছন্দের পদবি। নিঃশব্দে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম পাশের টেবিলের অরিজিৎ ব্যানার্জির দিকে, এ.জি. বেঙ্গলের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। সেই শুরু ....

(৩)

— 'দিদি কোথায় রে', বাড়িতে ঢুকেই সারাটা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠল। বেডরুমে সকালের কাগজগুলো ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো, চেয়ারের হাতলে ছেড়ে যাওয়া পাজামা পাঞ্জাবি, অ্যাশট্রে উপচানো সিগারেটের দুমড়ানো মুচড়ানো টুকরো, রিনির ঘরের দরজা দুহাট করে খোলা — বিছানায় অবহেলা গায়ে মেখে পড়ে আছে ওয়াকম্যান আর গোটা দশেক ক্যাসেট। উষ্মাটা রেণুর উপরই গিয়ে পড়ে, 'কী করে রেখেছিস বাড়ির হাল? এই জন্যই কি তোকে রাখা....?' মুহূর্তেই বেদনায় দীর্ণ রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া লাগে। আহা, ওর কি দোষ! নিজের উষ্মাকে এই নির্দোষ মেয়েটির ঘাড়ে চাপিয়ে আমি কি যুক্তির আড়াল খুঁজতে চাইছি ....?

— 'মা এসেছিল দুপুরে', কথা বলতে বলতে ... এক গ্লাস ঠান্ডা জল ও আমার সামনে তুলে ধরেছে। বকুনি খেয়েও কর্তব্য ভোলেনি মেয়েটা। জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাই। ধারা স্নানে যদি এই গ্লানি কাটে।

ডোর বেলের আওয়াজে দরজা খুলেছে রেণু। মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বাইরে আসতেই আবার সেই নিভন্ত আগুনের ফুলকিগুলো চিড়বিড়িয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে গেল, 'রিনি আছে...? ও আমায় আসতে বলেছিল ... নেই? ঠিক আছে পরে আসব'.. আত্মপ্রত্যয়হীন এই ছেলেটার জন্যই রিনি এমন জিদের লাগাম টেনে ধরে আছে...! নিঃশব্দ পায়ে নীচে নেমে যাচ্ছে ঋত্বিক।

রিনি কোনও ভণিতার আড়াল খোঁজেনি। এম.এ. ক্লাসে ভর্তির পরপরই একেবারে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। 'মা, এ ঋত্বিক, আমার ক্লাসমেট আর টানা চারটে বছর ধরে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হাউ থ্রিলিং। নাটকই নাকি ওর ধ্যানজ্ঞান। এম.এ. পড়াটা শখের। কি দুঃসাহসিক সব ডায়লগ বলে তুমি যদি শুনতে...' আমি তখন জমাট বাঁধা বরফ। একটা হিমস্রোত শ্লথগতিতে মাথা থেকে বুকের ঢালে নেমে যাচ্ছে। ঋত্বিককে নয়, আমি তখন দেখছিলাম রিনির নিয়তিকে।

রিনিকে আমি চিনি। আমাদের দাম্পত্য শীতলতার মধ্যিখানে ঠোক্কর খেতে খেতে ও প্রচণ্ড জেদি হয়ে উঠেছে; খানিকটা বোধহয় রুক্ষও। কোনও কথার জবাব ও সোজা ভাবে দেয় না, বিশেষত আমার সঙ্গে। কিসের যে বৈরিতা — তা বুঝতেও পারি না। ওর জন্য কী কী করিনি, মনে মনে নিয়তই তার খতিয়ান করতে চেষ্টা করি — অঙ্ক মেলে না। অথচ বাবা নামধারী যে মানুষটা এই সংসারের শুধুমাত্র একজন সদস্য হয়েই জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিল, তার জন্য সুযোগ পেলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাকে খান খান করে দেয়। অরিজিৎ আর আমার মধ্যে দীর্ঘতম এক পাঁচিল গাঁথা হয়ে গেছে রিনির জন্মের ঠিক দু'বছর পরেই। আমার ওপর ওর রুক্ষ ব্যবহার কি সেই বেদনাসঞ্জাত ...।

রেণু চা এনেছে। সঙ্গে হালকা মশলামুড়ি। সারা দিনের ক্লান্তির পর এই এক কাপ চা সঞ্জীবনীর কাজ করে। কিন্তু আজ আর অনুষঙ্গটুকু ভাল লাগছে না। শুধুমাত্র চায়ের কাপটা নিয়ে ওকে বলি — 'কৌটোয় রেখে দে, মেসো এলে দিস।' রেণু বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল, আমার উদাসীনতায় নিঃশব্দে সরে যায়। ঋত্বিককে নিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে যে জিদের টানাপোড়েন চলছে, আটশো স্কোয়ার ফুটের বেষ্টনীতে ওর কাছে তা গোপন নেই। আমার প্রতি রিনির বিষম ব্যবহার ওকে অজান্তেই আমার কাছে এনে দিয়েছে।

(৪)

অরিজিৎকে প্রশ্ন করেছিলাম — 'তুমি রিনিকে নিষেধ করছ না কেন? ও তো তোমার কথা শোনে .. ও তো তোমারও সন্তান .. ওর ভালমন্দের জন্য কি তোমার কোনও মাথাব্যথা নেই...?' নির্লিপ্ত উদাসীনতায় ও বলে উঠেছিল, 'রিনি বড় হয়েছে। এম.এ পাশ করে বি.এড. করছে, নিজের কেরিয়ারের ব্যাপারে ও যথেষ্টই সচেতন, ও নিজে যদি কাউকে পছন্দ করে আমি কেমন করে তাকে নিষেধ করব! আর ছেলেটিও তো শিক্ষিত, রিনির কাছে যতদূর শুনেছি ওদের পরিবারও সম্ভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণও, তবে কোন অজুহাতে ওকে ... আমি তা ছাড়া সুদেষ্ণা তুমিও তো আমাকে নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিলে....' ব্যঙ্গের হাসিতে কি নির্মম উল্লাস অরিজিৎ-এর চোখে! আমি বাধ্য হয়েছি ওর সামনে থেকে সরে আসতে। অরিজিৎ ওঁৎ পেতে থাকে ছলে বলে কৌশলে আমার সেই একটি দিনের হঠকারি সিদ্ধান্তের সুযোগ নেবার জন্য।



বাবা মা স্তম্ভিত, হতবাক পরিজনেরা। বাবা বলেছিলেন, 'একবারও কি ভাববি না... ? কত ভাল ভাল ছেলে তোর বন্ধুদের মধ্যেই কত প্রমিসিং ছেলে...' কিন্তু আমার তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। মুহূর্তের হঠকারিতায় পরিব্রাত্তা হিসাবে যাকে বেছে নিয়েছিলাম তার মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলাম আজ এক অরিজিৎকে। কবি অরিজিৎ। ওর কবিতায় তখন ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে আমার অন্তর আকাশ। পরিচিত হয়ে গেছি আরও একটি ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে। এক ঝাঁক চেনা অচেনা কবির সান্নিধ্যের প্রশান্তিতে তখন আমার আঁচল পূর্ণ। পায়ের তলায় শক্ত মাটি। সদ্য পাওয়া এম.এ. ডিগ্রির হাতে হাত ধরে ধরে সরকারি চাকরির সবুজ ছাড়পত্র।

অরিজিতের হীনম্মন্যতার শুরু এইখান থেকেই। নিজেকে আড়াল করল অরিজিৎ। কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিনিয়ে নিল। নিত্যদিনের রোজ নামচায় শুরু হল দায়দায়িত্বের চাপান-উতোর। প্রকৃতির নিয়মেই এসে গেল রিনি। অরিজিৎ আমাকে নির্দিষ্ট একটা সাংসারিক-জৈবিক চাহিদার বৃত্তে পরিপূর্ণ দেখতে চায়। কিন্তু আমার মন প্রতিবাদী হয়ে অরিজিতের সেই ইচ্ছেটাকে অবহেলায় সরিয়ে দেয়। অরিজিৎকে ভালবেসে বিয়ে করিনি ঠিকই, কিন্তু বিয়ের পর তো ভালবাসতেই চেয়েছি। এ যদি আমাদের প্রথাগত সম্পর্ক হত তা হলে শুরুটা তো এই ভাবেই হত ... ! কিন্তু ওর মনের গহনে লুকিয়ে থাকা হীনম্মন্যতায় নিষিক্ত সেই বীজ ওর বিশ্বাসের আকাশকে অন্ধকারে ঢেকে দিল আর সেই অন্ধকারের হাত ধরে কোথা থেকে জানি না ও এনে হাজির করল বিকাশকে — আমার ফেলে আসা দিনের আর এক মুগ্ধ প্রেমিক। সৌহার্দে, আন্তরিকতায়, দহনে, বিষাদে ও হয়ে উঠল অরিজিতের অভিন্ন হৃদয় এক সমব্যথী। দগ্ধ অতীত আমার বর্তমানের দিনযাপনে বিবেকের মতো ঝুলে রইল আমার দৃষ্টির সামনে। মোহভঙ্গের হতাশা আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল বহির্জগতের মায়াবি আলোয়।

বিকাশকে রিনির একদমই পছন্দ নয়। ওর ঝাঁঝের উত্তাপটা টের পাই যখনই ও অরিজিৎকে ভৎর্সনা করে — 'কি দিনরাত গুজগুজ কর বলো তো? ওঁর কি কোনও কাজ নেই, সংসার সন্তান নেই দিনরাত আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকেন কেন?' অরিজিৎ মিষ্টি মিষ্টি হাসে — 'অমন করে বলতে নেই, বিকাশ তোর মামা হয়' ... 'খবরদার ও সব মামা-টামা আমার সঙ্গে পাতাতে এসো না, তোমরা আছ ভাল, একজন অকাল বার্ধক্যের বলিরেখা এঁকে ব্যালকনিতে বসে প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট ধ্বংসে করছ আর একজন তো নেত্রী হয়ে দেশোদ্ধার করে বেড়াচ্ছেন। কেন যে তোমরা আমাকে', দড়াম করে রিনি ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অফিস-ইউনিয়নে আমার কালচারাল সেক্রেটারি হবার খবরটা অরিজিৎ-ই রিনিকে প্রথম শুনিয়েছিল। বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রও কি অরিজিৎ রিনির কাছে মেলে ধরেছে...!

অরিজিৎকে কোনও ভাবেই আমি উজ্জীবিত করতে পারিনি যদিও সব কিছু ভুলে ওর কবিতাকেই আমি আঁকড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম কবি অরিজিৎ — নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি দেশ বিদেশের সফরসূচি ... । কিন্তু কোন যন্ত্রণায় যে ও কবিতার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে রহস্য আমার জানা হয়নি। বিকাশ সময় সুযোগের আড়াল খুঁজে আমাকে বোঝাতে চেয়েছে আমার জন্যই নাকি ... আমি যদি আরও কিছু সময় একান্তভাবে শুধু ওকেই দিতাম ... মানে ওই কেরিয়ার, প্রমোশন, অফিস ... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কেন যে আমি অমন নেশাগ্রস্ত হয়ে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার পিছনে ছুটে চলেছি — বিকাশ বা অরিজিৎ তা যদি জানত!

একটা ছোট্ট চড়াই কখন না জানি ঢুকে পড়েছে ঘরে আর নির্ভার সে আছে ফ্যানের ব্লেডের উপরে। ও জানেই না কারও মুহূর্তের অসতর্কতায় ঘটে যেতে পারে বিপর্যয় ওর ছোট্ট শরীরে... ! ঘরের আলো নিবিয়ে বারান্দার আলো জ্বেলে দিই। নিয়নের নীল আলোয় ও যদি পথ চিনে ফিরে যেতে পারে। চার বাই দুই এর এই বারান্দাটা আমার মুক্তির অঙ্গন। টি.ভি., গান, সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আমাকে ভোলাতে পারে না। চোখ হয়ত দেখে, কানও বুঝিবা শোনে — কিন্তু মন বালিতে মুখ লুকনো স্রোতের মতন নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলে স্মৃতির উপবন। একটা আশংকা, একটা অনিশ্চয়তা আমাকে তাড়া করে ফেরে ... আমার জীবনই কি আবার প্রতিভাসিত হতে চলেছে রিনির ভবিষ্যৎ ঘিরে... ! বারবার মনে হয় ওকে কাছে ডাকি, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দেখাই সেই হঠকারি বেদনার ক্ষত, যা তিরিশটা বছর ধরেই আমাকে তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু রিনি এখন নাগালের বাইরে।

(৫)

গতকাল মন্দিরা এসেছিল আমন্ত্রণ জানাতে। প্রতীক বাইরে চলে যাবে। নিকটজনদের নিয়ে একটু সময় কাটাতে চায়। প্রতীকের সহপাঠীরা, মন্দিরা আর সুব্রতর নিয়র সার্কেল, মাসি পিসি মামা কাকা আর তাদের বাচ্চাকাচ্চারা। নিশ্চয়ই জানতাম অরিজিৎ মুখ ফিরিয়েই থাকবে। ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সব সম্পর্ককে ও মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। আমার ছোট বোনের বিয়েতে সামান্য কথাতেই ও সম্পর্ক ঘুচিয়েছে আমার বাপের বাড়ির সঙ্গে। রিনির ব্যাপারেও সংশয় ছিল ... নজরুল মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, একাদেমি। যদিও মন্দিরা ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'না গেলে বুঝব তুই আমাকে একটুও ভালবাসিস না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম রিনির দিকে। পলক পড়ছিল না। কী অপরূপ লাগছে ওকে। বিরক্তির ছাই গায়ে মেখে মেখে

কেমন রুক্ষ হয়ে থাকে মেয়েটা। সামান্য একটু যত্নের সরে কেমন কোমল হয়ে উঠেছে ওর তরুণী শরীর। বৃষ্টি ধোওয়া সবুজের মতন। ও লজ্জা পেল। 'কী দেখছ অমন করে... ? যাবে না মন্দিরা মাসির বাড়ি? নাকি খুলে ফেলব... ?' 'না না ঠিক পাঁচ মিনিট সময় লাগবে আমার....' মেজাজের পারা পড়তে একটা ঝটকাই যথেষ্ট।

সল্টলেকের চারকাঠা জমিতে সবুজের ঘেরাটোপে মন্দিরার 'বাতায়ন'। আমরা যখন ট্যাক্সির দরজা খুলে নামছি সুব্রত এগিয়ে এল — 'অ্যাতো দেরি করে এলে... মন্দিরা কখন থেকে তোমাদের জন্য ... আয় মা আয়' রিনিকে ও বাহুর বেষ্টনীতে জড়িয়ে নিয়েছে। লিভিংরুমে সোফা সেটের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে সুকন্যা, সোমা, অদিতি — ওদিকে ফেলে আসা যৌবনের দগ্ধ দিন — অনিল, শ্রীধর, মধু, বিকাশ, রূপক। কেমন একটা সংকোচ আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কলমি-লতার মতন, ছড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায় — না এলেই ভাল হত। মন্দিরা আমার সকল লজ্জাকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিল — 'কত দেরি করলি বল তো, তোর জন্য সেই কখন থেকে ওরা হা পিত্যেশ করে বসে আছে, রিনি কই রিনি ... এই বাপ্পা এদিকে আয় এই সুদেষ্ণা মাসি আর এই রূপসী মেয়েটির নাম রিনি ... আমার আদরের বোনঝি।' প্রতিষ্ঠা বোধহয় মানুষকে সব দুঃখ-তাপ ভুলিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে চলতে শেখায়, মান-অভিমান, অনাদর-অবহেলা পেছনে পড়ে থাকে বর্জ্যপদার্থের মতো।

কারও মধ্যে কোনও কুণ্ঠা নেই, দ্বিধাদ্বন্দ্বের আভাসও। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর থেকে নিশ্চিহ্ন খড়ির দাগ। গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়া ধূলোগুলি কেবল পরতের পর পরতে জমা হতে থাকে আমার অন্তরের গহীন অন্ধকারে। একদল প্রতিষ্ঠিত পুরুষের পাশে রূপসী বিদুষী স্ত্রী। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, আই আর এস প্রবেশনাররে গর্বিত পিতামাতা। নয়ন ভরে আমি রিনিকে দেখতে থাকি এক ঝাঁক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল তরুণদের মধ্যে কেমন অনাবিল আড্ডায় মেতে আছে। পার্টি শেষ হতে হতে হয়ত মধ্যরাত হয়ে যাবে। রাত দশটায় সল্টলেক নিঝুম। আমাদের ফিরতে হবে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি — কখন যে একটি শান্ত ছায়া আমার নিঃসঙ্গ সান্নিধ্যের একান্ত কাছটিতে চলে এসেছে খেয়াল করিনি। — 'সুদেষ্ণা, রিনিকে আমাদের ভীষণ পছন্দ ছিল ... প্রতীকের জন্য... কিন্তু আমি জানি...'

## নিবেদন

'বঙ্গসংহার এবং' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী কলকাতা বইমেলায় (২০০২)। 'চতুরঙ্গ'-এর আগামী সংখ্যায় শেষ কিস্তিটি তাই আর প্রকাশ করা হচ্ছেনা। ধারাবাহিক সন্দর্ভটি এ সংখ্যাতেই শেষ করা হল। — **সম্পাদক**

## গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা এখনও যাঁরা দেননি, যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁদের তা মিটিলে দেওয়ার অনুরোধ জানাই। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭২ টাকা। বিদেশবাসী গ্রাহকদের চাঁদা US $ 12। "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে পারেন।

ছোটগল্প

# পুনর্জন্ম

## দেবকুমার সোম

'বজ্রাশনি-পরশু শক্তি-শরাশ্ববর্তে
বিদ্যুৎপ্রভাপ্রোজ্জ্বলিতং ক্বথিতঞ্চ লোহম্।।
আদ্বীপ্তশৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মুর্ধ্নি।
নো বা অহং পুনর্জনয়ে গৃহাভিলাযাম।।'

— অশ্বঘোষ।

(১)

একশো ছাবিবশটা চওড়া সিঁড়ি পরপর নেমে এসে তৈরি হয়েছে এই রাস্তা। আজ তেয়াংশি সিরিগুঞ্জা সায়ান তোংনাম; তাই লোক চলাচল কম। সিঁড়ির সব চেয়ে উপরের ধাপে পুলিশি রেইন কোট আর প্ল্যাস্টিকের ইয়র্কসায়ার টুপি পরে দাঁড়িয়ে ছয় ফুট চার ইঞ্চির নোরপু। দুপুরের চওড়া রোদে ওই ছয় ফুট চার ইঞ্চি শরীরের ছায়া বিশাল এক শকুন পাখির মতন এই একশো ছাবিবশটা চওড়া সিঁড়ির রাস্তায় বিস্তৃত। ওর মাথার পিছনে টিবেট রোডের বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠে আসা বেচারা সূর্য। নোরপু টলছে। ছায়াও তাই। বালেন্স আনবার জন্য অথবা এমনই অকারণে এক বার সে তার ডান হাতটা আকাশে তুলতেই সেই উত্থিত হাতের ছায়ায় একশো ছাবিবশতম ধাপের শেষে সমতল চত্বরে বিক্ষিপ্ত সাজানো সবজিমান্ডি রোদহীন। যেন সূর্য আচমকা অভিমানে মেঘের আড়ালে। এ রকমটা মনে হল সবজিমান্ডির ক্রেতা-বিক্রেতার। তারা অতএব সূর্যের দিকে তাকাল। এক দীর্ঘ শরীর-আকাশবাণীর মতন জলদগম্ভীর কণ্ঠের দীর্ঘশরীর। গুরু সিরিগুঞ্জা। গুরু রিম্পুচি। যেন কোথাও তীব্রতর হচ্ছে লামাদের স্তবপাঠ। দর্শকদের হতচকিত দেখে নোরপু মজা পেল। তাই ডান হাত উপরে তুলে সে প্রথম তার বাঁ পা, তারপর ডান পা এই ভাবে এক একটি [illegible]। মজাও পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজেকে রিম্পুচি [illegible] দিনের যে কর্মাপার পথ চেয়ে [illegible] সেই কর্মাপার [illegible]

তখন এ সব উদ্ভট কথা তার মাথায় আসে। আর এ ভাবে ভাবতে তার ভালই লাগে। এক অসাধারণ শিরশিরে তৃপ্তি অনুভব করে। তখন বাজারে কিংবা রাস্তায় অথবা ফ্লাইওভারের নীচের স্তম্ভগুলোর চার পাশে জমে থাকা স্যাঁতসাঁতে অন্ধকারে লোকে তাকে ভুল করে। এর কিছু পরে, যখন খোঁয়ারি কাটে, যখন তার গাল চেটে দেয় নেড়িকুত্তায়, তখন সে বোঝে অনেক বেলা হল— ঘরে ফিরতে হবে। কুঞ্জন অপেক্ষা করে করে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত। এ খেলায় জানাচেনা সবাই রপ্ত। যেমন এখন। নোরপু ক্রমশ নীচে নামতে থাকলে তার ছায়াও ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। ছায়া ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হতে থাকলে দর্শকদলের বিস্ময়ও ক্রমশ কাটতে থাকে। নোরপু সব কটা সিঁড়ি ভেঙে শেষমেশ সবজিমান্ডির মাঝখানে এসে পড়লে তার ছায়া তার শরীরের চেয়েও ছোট হয়ে যায়। তখন রেইন কোট পরা এই মাতাল ট্র্যাফিক পুলিশটিকে নিয়ে কারও আগ্রহ থাকে না। দোকানিরাও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছায়ার প্রহেলিকায় নিজেদের মুর্খামি টের পেয়ে বিরক্তবোধ করে। মাতাল অথচ গরিব খরিদ্দারের প্রতি আগ্রহ থাকা ব্যবসার ক্ষতি। নোরপুও বুঝে যায় এ সব। বুঝে মজা পায়। একটু আপসোসও। দোকানিরা এখন তাকে একটা টাকাও সুবিধা দেবে না। নোরপু এক কিলো পাহাড়ি আলু কেনে, কিছুটা রাইশাক, আধ কেজি ইসকুস।

জাতি কুশলাই?

পরিচিত কণ্ঠের ভাল মন্দ খবরাখবর নেবার লোকটিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে—সাথী হো! লা!

বিস্ময়। অনেক দিন পর! কতদিন এই বেসামাল অবস্থায় গণনা কঠিন। তবুও অনেক দিন পর কর্মার সঙ্গে দেখা। কর্মাও টেনেছে, প্রমাণ চুল অবিন্যস্ত। কাঁধের ওপর ঝোলানো চামড়ার জ্যাকেট অবহেলায়। নোরপু ছিড়িং ভুটিয়া এই বাজারের মধ্যে তার সেই ছোট বেলার সাঙ স্কুলের সহপাঠীকে পেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটতে কর্মা তাকে খবরটা দেয়। কিছুক্ষণ আগে ছোড়েনের ঠেকে এ রকম ফিসফাস শুনেছিল। ভেবেছিল মাতুদের দুঃখ ভোলবার এই এক বিলাসিতা। কিন্তু এ রকম গুরুত্বপূর্ণ কথা তো বাজারের মধ্যে হয় না। অতএব, তারা বিয়ার নিয়ে বসে পড়ে তেনজিং-এ।

পনেরো বছরের উগেন দোরদুল থ্রিনলে দোরজি যাকে সবাই জানে বর্তমান কর্মাপা, সেই তিনি টিবেটের সিংহাসন ছেড়ে চলে এসেছেন ইন্ডিয়াতে। আছেন ধর্মশালায়। খবরটা গোপন ছিল। হঠাৎ রুমতেক মনস্ট্রিতে পুজো শুরু হওয়ায় জানাজানি হয়ে গেছে। আজ সকালে ট্যাক্সি নিয়ে রুমতেক গিয়েছিল কর্মা। সেখানেই এ খবর পায় সে। রিম্পুচিরা এক দল নিয়ে নাকি ধর্মশালায় যাচ্ছেন প্রভুকে বরণ করতে। ঘটনাটা শুনতে শুনতে নোরপুর গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাশি নামগেল থেকে ইন্দিরা গান্ধী হয়ে এল.ডি.কাজি কেউ তাদের দেখেননি। ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা করে তাদের ঠেলে দিয়েছেন আরও গরিব হবার রাস্তায়। ঠেলে দিয়েছেন অন্ধকারে। সেই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসবেন প্রভু। আজ গুরু সিরিগুঞ্জার জন্মদিন। এই দিনেই এ সংবাদ প্রাপ্তিতে নোরপু আরও বিচলিত। সবাই জানে নোরপুর মাথায় একটু গন্ডগোল আছে। সবাই জানে বেচারা সেই ছোট থেকে অস্বাভাবিক। আর নেশাড়ু নোরপু মত্ত অবস্থায় সত্যিই দামাল। মেট্রো পয়েন্ট কিংবা এম.জি.মার্গ-লাল মার্কেট ক্রশিং-এর সামনে বৃষ্টি কিংবা বরফ পাতের দিনগুলোয় কেনা ছয় চারের রেইনকোট আর প্লাস্টিকের ইয়র্কসায়ার টুপিতে তাকে গান্ধীজির ছাতাহীন আবক্ষমূর্তির মতন করুণ দেখায়। এ সব সময় পরিচিতজনের দু'একটা ভালবাসার চাহনিতে আন্তরিক হয় সে। নেশা সে সত্যিই ভালবাসে না। কিন্তু কী করতে পারে সে? এই পাহাড়রাজ্যে প্রায়শ সূর্যের আলো মেলে না, তার দায় কি নোরপুর? রোদ্দুর উঠলে দু-একটা উৎসব বাদ দিলে কোন শালা মদ —। তবে হ্যাঁ নোরপু জানে সত্যভাষণের জন্য নেশা একটি জরুরি মাধ্যম। নেশায় অনেক মানুষ সত্যি হয়ে ওঠে। অনেক রহস্য গোপনতা ভাঙে।

'ওম মনি পেমে হুম' মনে মনে উচ্চারণ করে নোরপু।

(২)

গোপনীয় উদ্বেগটা পেটের ভেতর পাকাতে থাকলে নোরপু তাড়াতাড়ি উঠে আসে। কি করবে সে এই অস্থিরতা নিয়ে? মারতাম বস্তিতে ঝুঁকে আসা অন্ধকার এক ঝুপড়িতে কাঠের আগুনের পাশে বসে থাকা তার বুড়ো আমা-আপা এখনও মালা জপে। ওয়াং নেয় সুখের দিনের পথ চেয়ে। শুধু কি তারা? এই পাহাড়রাজ্যের সব গরিব মানুষই তাই ভাবে। ছোগেল ছিলেন তাদের কিন্তু তাদের কোনও দিনও দেখেননি। কাজিদের মন্ত্রণায় শর্মা, প্রধান, গুরুংরো সব ভোগ করেছে। ভুটিয়া-লেপচারা কিছুই পায়নি। তারপর এক দিন তাদের ইন্ডিয়ার সাথে জুড়ে দেওয়া হল। গলায় বকলস পরা সাহেবের কুকুর হল। একদা ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রজা। আজ ইন্ডিয়ার অনেক উপজাতির মধ্যে তারা অন্যতম। ক্ষমতার হস্তান্তরে ছোগেল জামানায় ভুঁইফোঁড় বড়লোকের দল এল ক্ষমতায়। নোরপুদের সম্মান তো গেলই ভাষাটাও কেড়ে নেওয়া হল। তার বাড়িতে সে বউয়ের সাথে কথা বলে, ছেলের সাথে কথা বলে নেপালিতে। ভুটিয়ায় নয়। তখন দিনের শেষের সূর্য ক্লান্ত রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে সিনিইয়ান চু শৃঙ্গ। কাঞ্চনজঙ্ঘার মুকুট রক্তিম। গাঢ় সবুজ সাঙ, রাঙ্কা পাহাড়ে দ্রুত আন্ধেরা নামছে। মদের ঠেকগুলোয় কিছু পাতলা ভিড় — কিছু মৃদু আলাপচারিতা, নোরপু এ সময় টালমাটাল পায়ে এবড়ো-খেবড়ো আরিথাং-এর রাস্তায় নীচে নামছিল। মনে হচ্ছিল চার দিকে লাল-সবুজ-নীল-হলুদ-সাদা লুংতা উড়ছে বাতাসে অদ্ভুত এক চঞ্চলতা নিয়ে। এক পাশে উপত্যকা জুড়ে ধাপচাষ। আলো-অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না, কোথাও আলু, কোথাও আদা। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়ায় নোরপু এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিল। এত রঙ মনে হয় আগে কখনও দেখেনি। নোরপু ভাবে জীবন যদি বাধাহীন স্বাধীন বিহঙ্গ হত তাহলে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার এ গ্লানি সইতে হত না। ভাতের সঙ্গে ইসকুস আর রাইশাক জোটাতে জোটাতে সে হিমসিম। চোখের ওপর প্রতিদিন দুর্নীতি আর বেইমানির জীবন। হাত কয়লা করবার রাস্তায় সে হাঁটতে চায় না। এই নোংরা জীবন থেকে বেঁচে উঠতে তার নেশা জরুরি প্রতিদিন। লোকে তাকে আবডালে পাগল বলে। বারবার তার হৃদয় বিক্ষত হয়েছে সততার অপচয়ে। কতদিন, কতদিন তাই সে চেয়ে থাকে শীতের আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে একদৃষ্টে। গভীর রাতে কখনও কখনও কী এক অস্থিরতায় তার ঘুম ভেঙে যায়। চুপি-চুপি বাইরে এসে দেখে গা ছমছমে আঁধারে কে যেন মনস্ট্রির ছাদে আলো হাতে পায়চারি করে। ধর্মচক্রের তোরণদ্বারে কার ছায়া শরীর দেখে সে চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে ঘুমের ভেতর কেঁদে ওঠে সে। এক বার এ রকমই এক রাতে ঘুমের ঘোরে নোরপু ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। পাইন, জুনিপারের ভেতর দিয়ে কোন এক নির্দিষ্ট আলোর উদ্দেশে। পর দিন অনেক বেলায় তার অচেতন শরীর আবিষ্কৃত হয় পাহাড়ি নদীর পাশে। সৌভাগ্য নদী তখন অগভীর। নোরপুর বুক তরাসে কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে এক বার পুব আকাশে তাকায়-ঘন কালো আকাশের রহস্যময়তা অনুভব করে দ্রুত বাড়ির ভেতর ঢুকে যায় সে।

পেমাকে ভালবেসে সানু বলে নোরপু। ছোট-পৃথিবীর সব চাইতে ছোট অথচ সুন্দরী। এ রকম হাড়-হাভাতে ঘরে এ রকম সৌন্দর্য কদর পায় না। লাচুং মেলায় পেমা এসেছিল বাপের সাথে হাউসি নিয়ে। জুয়ার মেলায় এ দোকানির, সে দোকানির



ঠেলা খেতে খেতে নোরপু পৌঁছেছিল পেমাদের ঠেকে। তখন মদ আর জুয়ায় নোরপুর পকেট প্রায় ফাঁকা। যে কটা সামান্য টাকা পড়ে আছে তা দিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। তবুও কি যে হল, একেই হয়ত বলে ভবিতব্য। নোরপু হাউসিতে বসে পড়ে। তখন ঝিনা মেঘে বাজ পড়েনি কিম্বা কোনও অলৌকিক ঘটনাও ঘটেনি। তবুও নোরপুর জীবনের গতিপথ পালটে গেল। হাউসি সে জিতল একবার নয়, পাঁচবার। জিতল মেয়ের মন। আরিথাং-এ ঘর বসাল। গরিব অথচ সুখের আতিশয্যে। তখন দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘরে ফেরা। ভোর ভোর উঠে বাগান তৈরির চেষ্টা। উদ্দেশ্য প্রথম সন্তানটি যখন আসবে তখন যেন তার এই এক চিলতে বাগান টিউলিপ, লিলি, ক্যালেন্ডুলায় উপচে ওঠে। কুঞ্জন এল বছর ঘুরতেই। যেন দেবশিশু। টকটকে লাল গাল। কুচকুচে কালো দুটো খুদে চোখ। চ্যাপ্টা নাক। মনে মনে তৃপ্ত হয় নোরপু। মনে করে প্রভুর অশেষ দান, এই শিশু। একে সে সত্যিকারের মানুষ করবে। কথাটা ভাবতেই দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। তার স্বপ্নপূরণ হল না। কুঞ্জন আর মনস্ট্রির লামা স্কুলে যাবে না। সকাল সকাল জেইন আর সেনথপ পড়ে প্রার্থনায় বসা তার হবে না। যখন সে পুরনো অ্যালবামে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবি দেখে তখন আজকের এই পোলিও আক্রান্ত পঙ্গু ছেলেটার জন্য তার কান্না গুমরে ওঠে। নেশা জরুরি হয়ে ওঠে। এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাত গভীরে যায়। তখন শুরু হয় নির্মম হিমের আক্রমণ। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র তাদের নেই। ছেলেটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে একটু উষ্ণতা দিতে চায়। মনে মনে প্রার্থনা করে, 'ওম বেচা গুরু পেমা সিতি হুম।'

(৩)

কেজং তাশি তার পড়শি। সেও পুলিশ লাইনে কাজ করে। শান্তশিষ্ট কেজং এমনিতে হাসিখুশি। সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলাটা যেন তারই দায়িত্ব। কেউ ওর খবর নিল কি নিল না তাতে সে পরোয়া করে না — সে সবার খবর নেবে। সমস্যা মন দিয়ে শুনবে। দরকারে সম্ভাব্য সমাধানও বাতলে দেবে। তাই এই পাঁচভাড়াটের বাড়িতে কেজং বেশ জনপ্রিয়। এই কেজংকে সম্পূর্ণ অচেনা দেখেছে নোরপু। যখন রাস্তা দিয়ে টিবেটান মিছিল যায়, যখন স্লোগান ওঠে 'রেড চায়না, ক্যুইট টিবেট।' তখন তাকে দেখতে লাগে ঠিক কেশর দোলানো টিবেটান ড্রাগন। তখন কে বলবে এই ছোটখাটো চেহারার পুলিশ কনস্টেবলটি লোসারের সময় প্রতিবেশীকে খাবজে বিতরণ না করে জল স্পর্শ করে না। হ্যাঁ কেজং তাশি টিবেটান। যেটা তার স্বদেশ সেই দেশ তার দেখা হয়নি। আর যে দেশে তার জন্ম বেড়ে ওঠা জীবনযাপন, সেই জন্মভূমি তার স্বদেশ নয়। নাথুলা পাসের বরফ জমা কাঁটাতার বেড়ার ওপাশে তার স্বদেশভূমির দিকে তাকিয়ে সে কতদিন কেঁদেছে কেউ জানতে পারেনি। ঠান্ডায় চোখের জলও বুঝি বরফ হয়ে যায়।

পেমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিতে নিতে কেজং মুখ খোলে — 'চায়না গরমেন্ট এবার বুঝবে। নিউ দিল্লির ওপর আমার আস্থা আছে।'

'আমার নেই-' ভারী গলায় বলে ওঠে নোরপু।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় কেজং।

'ইন্ডিয়া গরমেন্ট তোমার ওই চায়না গরমেন্টেরও ওপর। সবাই যে যার ধান্দা করে। কেজং কোনও প্রতিবাদ করে না। কারণ কথাটার সত্যতা সে জানে। এখানকার শুধু নয় দার্জিলিঙের পাহাড়িরাও কেউ নিজেদের ইন্ডিয়ান বলে না। হয় গোর্খা, না হয় সিকিমি অথবা টিবেটান। এ ভাবে তারা চিহ্নিত হতে বেশি সম্মানিত বোধ করে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় যারা ঘর ছেড়ে এ রাজ্যে পালিয়ে এসেছে তাদের কাছে সে শুনেছে হঠাৎ হঠাৎ শিখ মিলিটারিরা বস্তিতে ঢুকে যথেচ্ছ লুটপাট, নারীধর্ষণ করেছে।

'আমার চিন্তা অন্য জায়গায়' নোরপু বলে — 'শামার রিম্পুচি কর্মাপ্পাকে মেনে নিতে পারে না। নিশ্চয় ঝামেলা পাকাবে।'

'ঝামেলা পাকালেই হল?' হঠাৎ উত্তেজনা টের পাওয়া যায় কেজঙের স্বরে।

লোভী মানুষ যদি সন্ন্যাসীর পোশাক পরে তবে সে শয়তানের চেয়েও ভয়াবহ।

নোরপুকে চিন্তিত দেখায়।

'আজ মনস্ট্রিতে বড় পুজো। যাবে না কি ওয়াং নিতে?' প্রস্তাবের ঢঙে কেজং নোরপুকে বলে।

'না-না ওর যাওয়া ঠিক নয়। বেশ কিছুদিন শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।' পেমার অজুহাত স্পষ্ট বোঝে নোরপু। পেমা জানে দু লামার গোষ্ঠীর কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি সবেতেই নোরপু ভূমিকা নেবে। তারপর মাথা ফাটিয়ে হাত ভেঙে চোখের নীচে কালসিটে নিয়ে ঘরে ফিরবে। তবে ফেরার আগে প্রতিপক্ষের চারগুণ ক্ষতি করে সে আসবে। আর এ সব কিছুর জের চলবে এক সপ্তাহ। অতএব, নোরপুর ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয় না।

এ কথা সে কথার পর কেজং তাশি উঠে পড়ে। হয়ত নতুন করে কারও নাম সঙ্গী হিসাবে মনে এসেছে।

আজ সকাল থেকে মেঘের মুখ দেখা যাচ্ছে না। এটা হামেশাই হয়। এ সব মেঘলা দিনে কনকনে ঠান্ডায় সকাল সকাল ডিউটি অফ করে যে যার ঠেকে ফিরে যায়। মদ্যপানের আদর্শ দিন। আহঃ। একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর যেন উঠে এল পাকস্থলি থেকে খাদ্যনালী বরাবর। নোরপু অনুভব করল দামি হোয়াইট রামের

স্বাদ। নিজের পয়সায় এর ওপর ওঠা যায় না। কখনও সখনও বিয়ার। তাই জীবনে যতবার একটু ভাল মদ খেয়েছে এ সব দিনে সে সব স্মৃতি তার স্বাদ মনকে উদাসীন করে দেয়। তখন মন চায় সত্যি কথা বলার জন্য। মানুষের বুকের ভেতরটা দেখবার জন্য সুস্বাদু মদ অনেক শক্তি ধরে। নোরপু ঠিক করে আজ সি.এল. নেবে।

(৪)

আজ সকাল সকাল ঘরে ফিরল নোরপু — বেশ্ম জ্বর নিয়ে। সকাল বেলায় প্রায় সুস্থ মানুষটাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছিল পেমা। বলেছিল লালমার্কেট, আপা ছজের বাড়ি হয়ে একটু বেলা করে ফিরবে। যেটা বলেনি সেটা পেমা জানত। আপাদমস্তক মাতাল হয়ে বাজারে, রাস্তায় নিজের পাগলামির প্রদর্শন করে ঘরে ফিরবে। এটা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। এত ভাল মানুষটা কেন যে এভাবে নিজেকে কষ্ট দেয়। কুঞ্জন আপাকে শশব্যস্ত পেমা তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেয়। জুতোটা পা থেকে ছাড়িয়ে ঘরের যত গরম কাপড় আছে সব ঙতওার সঙ্গে নোরপুর শরীরে চাপাতে থাকে। পঙ্গু ছেলেটা ঘরের এক পাশে বিহ্বল হয়ে দেখে মায়ের ব্যস্ততা।

নোরপু ভুলভাল বকা শুরু করল এর আধ ঘণ্টাটাক পর থেকে। কাটা কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া 'চন্দ দাও তোমার হাতে তৈরি ওই পর্কের রান্না আমাকে দাও। আমার কোনও ক্ষতি হবে না। ওই চেরিগাছের নীচে আমার বিছানা দাও — হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি আসছি প্রভু — না না ওদের মানা করো না আসতে দাও আমার কাছে — আমি ওদের কিছু বলে যেতে চাই গোপনীয় —'

ঘোরের মধ্যে নোরপু ঘরের দেওয়ালগুলোর দিকে তাকায়। এক কোণে ভগবান বুদ্ধের মাঝারি মাপের ছবি বাঁধানো। নোরপুর মনে হয় ছবিটা পুরো দেওয়াল জোড়া। এত বড় সেই ছবি তাকাতে ভয় করে। আঁতকে ওঠে সে, 'ভগবান!'

'ভগবান' এই শব্দটি নোরপু উচ্চারণ করে। যদিও সে চিৎকার করেই বলেছিল কিন্তু তা এত মৃদু পেমা ছাড়া কেউ শুনতেই পায়নি। কেজং ডাক্তার নিয়ে এসেছে। নোরপুর বিছানার চারপাশে ভিড় করে আছে — খড়কে, সোনম, তাগা খাপা, থ্রিললে ভুটিয়া। ডাক্তার প্রসাদ মাদ্রাজি কিন্তু দীর্ঘদিন এখানে থাকার ফলে এদেরই একজন। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বিশেষ কিছু বুঝলেন তা নয়। কিন্তু সেটা তো সত্যি কথা। যা বলা চলে না। তাই বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। হঠাৎ ঠান্ডা থেকে এই রকম জ্বর হতে পারে। ওষুধ দিচ্ছি, সাবধানে দু'দিন রাখুন। ঠিক হয়ে যাবে।'

কিছু পরে রাত বাড়তে থাকায় পড়শিরা আশ্বাস দিয়ে চলে গেলে পেমা একা হয়ে পড়ে। কুঞ্জন আপার হাবভাব ঠিক লাগছে না তার। তার বারবার মনে পড়ছে আজ থেকে ছয় বছর আগে যখন সে প্রথম বউ হয়ে আসে তখন এক দিন তার শ্বশুরমশাই তাকে জানিয়েছিলেন ছোট বেলায় ঘুমের ভেতর নোরপু একা একা জঙ্গলে হাঁটত। খুব ভোর ভোর গুরু কর্মাপ্পার শূন্য আসনের কাছে চলে যেত। সারা দিন নাওয়া খাওয়া ভুলে একদৃষ্টে ওই শূন্য আসনের দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখ থেকে জল পড়ত টপটপ করে। ওর জন্মকুণ্ডলী তৈরি করেছিলেন মনস্থির লামারা। নোরপুর ভাবগতিক দেখে ওর জন্মকুণ্ডলী পরীক্ষা করে দেখেন গুরু রিম্পুচি। এবং সিদ্ধান্তে আসেন সপ্তদশ কর্মাপ্পার মহান মশাল বাহকদের জন্মলগ্নে নোরপুর জন্ম। তাই যখন আকাশবাণী হবে, যখন কর্মাপ্পা সত্যি সত্যি তার সংরক্ষিত রুমতেক মনস্থির সিংহাসনে বসবেন, মাথায় দেবেন রাজকীয় তাজ তখন নোরপুর ডাক আসবে — মহান মশাল বহনের। সেই আকাশবাণী শোনা যাবে। ততদিন নোরপুকে এই ভাবে ঘোরের মধ্যে কাটাতে হবে সময়।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পেমা কাঁদছিল অঝোর ধারায়। আর মাঝে মাঝে দেখছিল অচেতন স্বামীকে। কপালে চিন্তার ছাপ। বন্ধ চোখ দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। ঠোঁট বিড়বিড় করছে দুর্ভেদ্য উচ্চারণে। পেমা এক বার কুঞ্জনকে দেখে — পঙ্গু ছেলে তার গুটিসুটি মেরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খেতেও চায়নি। পেমা তার স্বামীর উত্তপ্ত শরীরকে জাপটে ধরে এই ডিসেম্বরের শীতে বসে রইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা সারারাত জেগে থাকবে এই ভাবে। দেখবে গোপার মতন তার ঘর কে ভাঙে। সশব্দে সে উচ্চারণ করে, 'ওম বেচা গুরু পেমা সিডি হুম।'

পেমা জেগেছিল —
পেমা জেগে থাকে —
পেমাকে জাগতে হয় —

পেমাকে জাগতে হয় তত ক্ষণ যত ক্ষণ প্লাবন না আসে। পেমাকে জাগতে হয় তত ক্ষণ যত ক্ষণ চাঁদ সাঙ পাহাড়ের পশ্চিমে না ঢলে পড়ে। পেমা জেগে থাকে সেই সময়সীমা পর্যন্ত যতক্ষণ না এক একটি করে আকাশের সব মশাল জ্বলে ওঠে। পেমা জেগেছিল — জেগেছিল। 'একি পেমা তুমি ঘুমিয়ে পড়লে!'

পরদিন ভোরবেলায় পেমার ঘুম ভাঙতে বুক ছ্যাৎ করে ওঠে। বিছানা শূন্য। নোরপু তা হলে সত্যি সত্যিই চলে গেছে পুনর্জন্মের পথে....।

দিনটা ছিল মেঘমুক্ত। রোদ ঝলমল। ভারতের প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্রের শীর্ষ সংবাদ 'কর্মাপ্পা টিবেট থেকে পালিয়ে এসে ভারতের আশ্রয়ে।'

# শিক্ষা ও গণতন্ত্র

## সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

গণতন্ত্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ পরিচালন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারে। অতএব প্রত্যেককে এই দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগিতা অর্জন করতে হবে এবং প্রথম শর্ত হবে যে প্রত্যেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে। সংবিধান অনুসারে ৬-১৪ বছরের সকলে সর্বজনীন শিক্ষালাভের অধিকারী এবং এই শিক্ষাদান হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এই সাংবিধানিক দায়িত্ব গত ৫৪ বছর ধরে অপূর্ণ আছে। শুধু তাই নয়, প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার সর্বজনীন শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করেই চলেছে, কার্যে পরিণত করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাদের সমাজ যে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এই তথ্যই প্রচারিত হচ্ছে। যে- সমাজে একজনও শিক্ষালাভে বঞ্চিত সে সমাজ অগণতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, প্রতি বছরই বর্ধিত হারে বহু ব্যক্তি শিক্ষালাভে বঞ্চিত হচ্ছে। অতএব সেই হারে গণতন্ত্রও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

গণতন্ত্রে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অন্য যে সব প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম করা যাক, যেমন উৎপাদন ও বণ্টন, অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা লাভ করা যায় উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা বঞ্চিতদের সংখ্যাই অধিক। অতএব শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করতে হলে প্রথমেই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা অগণতান্ত্রিকতাকে মুনাফা করে শাসনকার্য চালাচ্ছে তারা কি কখনও সাংবিধানিক দায়িত্বের বিষয়ে ভাবছে? না, কারণ তা হলে তাদের ক্ষমতায় থাকা চলবে না।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শ গণতন্ত্রের কোথাও স্থান নেই। যেখানে অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর সেখানে তারা জটিল রাষ্ট্রশাসনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত। তারা শাসকবর্গের শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, কৃষিনীতি, শাসন ও প্রশাসন, কর্মসংস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা কোনও প্রকার নীতি নির্ধারণেই সম্পূর্ণ অপারগ। সুতরাং এ একম শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।

রাষ্ট্রশাসনের পুরোভাগে রয়েছে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী স্বার্থান্বেষী, যারা মুখে আওড়ায় গণতন্ত্রের বুলি, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। আংশিক গণতন্ত্র অর্থে এই বোঝায় যে প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে আমরা অনেক দূরে। অথচ এই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা তাকেই গণতন্ত্র বলে চালাতে গিয়ে গণতন্ত্রকেই হত্যা করছে।

আমরা বিগত ৫৪ বছর ধরে গণতন্ত্রের প্রথম ধাপের সূচনা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এই অবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। তা হলে উপায়? গণতন্ত্রকে ভাগ করা যায় না। অতএব সর্বজনীন শিক্ষাকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কার্যকরী করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপগুলির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সে সব কী তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করাই প্রথম পদক্ষেপ। পঠন-পাঠন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ, পাঠ্যবস্তু ও পাঠক্রম নির্ধারণ, ছাত্রদের যাচাই-বাছাই করার ও পুরস্কার করার পদ্ধতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী — যার সদস্যরা কেবল শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ — তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এই জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের অবহিত করা কী কী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যে বিষয়ে কোনও পাঠ্যবস্তুর প্রয়োজন ক্ষীণতম, সেটি হল শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন। পাঠকক্ষ এবং তার বাইরে শিক্ষকরা স্বয়ং শিক্ষাদান করবে নিজেদের চারিত্রিক দৃষ্টান্ত দ্বারা। এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। অতএব এই বিষয়ে শিক্ষকদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এই স্তরে যদি ঘাটতি থাকে, তা হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন

অর্থহীন হবে। শিক্ষকরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত না হলে অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

বাস্তবে দেখা যায় যে শিক্ষকদের মনোভাব বা তাদের শিক্ষক চরিত্র রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রভাবিত। এই জন্য চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। তা না হলে শিক্ষার ইমারত ভেঙে পড়বে এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। নানাভাবে আলোচনা করে দেখানো যায় যে রাজনীতির অন্যতম কাজ হল পরস্পরের চরিত্র হনন। এই জন্যই রাজনীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্জনীয়। আমাদের দেশে এই কাজটি অর্থাৎ রাজনীতি বর্জন অত্যন্ত কঠিন, কারণ দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। যদি এই বর্জনকার্য অসম্ভব হয় তা হলে শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত। তা ছাড়া শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্রের বিরোধ থাকলে সে শিক্ষা কখনও চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে না।

গণতন্ত্রের আচরণ-বিচরণে ধর্মের স্থান কী তা নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বলে মনে করি। ইংরাজিতে সেক্যুলার শব্দটি গণতন্ত্রের আলোচনায় অনায়াসে এসে পড়ে। সাধারণত বাংলায় যে তর্জমাটি করা হয় — ধর্মনিরপেক্ষ — তা সঙ্গত মনে করি না। ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত এবং কখনওই সামাজিক হতে পারে না। ধূমধাম করে  পূজা প্রাঙ্গণ চিত্রণে, আলোর খেলায় চমক লাগিয়ে যে পূজার আয়োজন করা হয় তাতে ধর্মের স্থান নেই। এগুলি তামসিক উৎসবের অঙ্গ মাত্র। উৎসবে আপত্তি থাকতে পারে না। তবে তাকে ধর্ম বলে চালাতে গেলে মেনে নেওয়া যায় না। আমার দৃঢ়মত যে গণতন্ত্রের আচরণ বিচরণে ধর্মের অনুপস্থিতি একটি কঠিন শর্ত। তা না হলে গণতন্ত্রের স্বাধীন সত্তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আর এক রকম ভাবে সেক্যুলারিতা বোঝা যায়। যেমন বলেছেন বাংলাদেশের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যে বাড়ি ঘর উপাসনার জন্য নির্মিত নয় তা সেক্যুলার, যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ধর্মের পাঠ দেয় না তা সেক্যুলার, যে ভাবধারণা পার্থিব বিষয়ে সীমাবদ্ধ তা সেক্যুলার। অতএব দেখা যাচ্ছে যে তাত্ত্বিক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিতার মধ্যে সম্পর্ক অতি নিগূঢ়।

যে-শাসকশ্রেণী সর্বজনীন শিক্ষা ও জনসচেতনাকে ভয় করে তাকে বুর্জোয়া বলাই সমীচীন, সরকারি নথিপত্রে যাই উল্লিখিত থাক না। এই শ্রেণীর শাসকদের সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন ঃ 'মন্ত্রী মহোদয় শ্রমিক শ্রেণীকে মনে করেন বারুদের স্তূপ এবং জ্ঞান ও শিক্ষা স্ফুলিঙ্গের সামিল। মন্ত্রী মহোদয় ভাল ভাবেই বুঝেন যে ওই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যদি বারুদ-স্তূপের উপর পড়ে তা হলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা সর্বাগ্রে সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে।' ভারতীয় নব-জাগরণের পুরোধা রামমোহন রায় এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন : 'স্বৈরতান্ত্রিক শাসকশ্রেণী সর্বদাই বোঝাতে যায় যে জ্ঞানের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়বে। জনসাধারণ একবার যদি জ্ঞানের আলো পায় তা হলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে তাদের বিরাট সংঘশক্তি শাসকদের উৎখাত করতে পারবে এবং সর্বপ্রকার জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।' টলস্টয় লিখেছিলেন যে স্বৈরাচারী জার-শাসনের শক্তির উৎস হচ্ছে জনসাধারণের অজ্ঞতা।

চিন্তার রাজ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই জনগণের জ্ঞানের প্রসারতা এবং তার বিভিন্ন শাখায়-প্রশাখায় বিচরণের ক্ষমতা। বুর্জোয়া শ্রেণী অতএব শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরোধিতা কর[illegible] সুতরাং জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

গণতন্ত্র যে কতখানি শক্তিশালী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হো চি মিন-এর ভিয়েতনাম এবং ফিদেল কাস্ট্রোর কিউবা। এই দুটি ক্ষুদ্রায়তন দেশ অমিত-বিক্রম সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে পর্যুদস্ত করেছিল এবং করছে।

যে কোনও শাসন ব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষমতা আর্থনৈতিক মান নির্ধারণ করে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সোভিয়েতে সমীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছে যে কৃষিক্ষেত্রে এবং ফ্যাক্টরিতে কর্মীদের শিক্ষাদানের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০ থেকে ৬০০ শতাংশ। গণতন্ত্রের প্রভাবেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল বলা বাহুল্য। আমাদের দেশে অনুরূপ সমীক্ষার প্রয়োজন গণতন্ত্রের সমর্থনে। কেবল উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ নয়, তার সঙ্গে আছে উৎপাদন কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি। সেটিই হবে গণতন্ত্রের পক্ষে প্রাথমিক তথ্য। এটাও বোঝা দরকার যে যে অনুপাতে শিক্ষাদান বিস্তার লাভ করবে সেই অনুপাতে উৎপাদন বাড়বে। যারা শিক্ষা পায়নি এবং পিছিয়ে আছে তারাই উৎপাদন বৃদ্ধিকে খর্ব করবে। এই জন্যই বার বার উল্লেখ করা হচ্ছে যে গণতন্ত্র অংশিক হতে পারে না। গণতন্ত্র মানেই সর্বজনীন। শিক্ষাই হচ্ছে এই সর্বজনীনতার সোপান।

# গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ

## ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্র নামক নিম্নতর শৃঙ্গটি যে পৃথিবীর অনেক মানুষই জয় করে ফেলেছে, এবং যারা এখনও একটু পিছনে পড়ে আছে, তাদেরও যে সেখানে পৌঁছতে আর খুব বেশি দেরি নেই তাতে কারওরই বিশেষ সন্দেহ দেখা যাচ্ছে না।

এ অবস্থা চিরকাল ছিল না। গণতন্ত্রের গুণাগুণ নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল। অনেকের ঘোর অবিশ্বাস ছিল, কারও কারও দৃঢ় ধারণা ছিল সর্বসাধারণের শাসন মানেই mob rule. সে-শাসন আবেগ তাড়িত, ধর্মাধর্ম জ্ঞানহীন, বিচার বোধ-বিরহিত। 'Reflections on the Revolution in France' পুস্তিকায় বার্ক-এর একটি উক্তি আজ শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় ঃ 'A perfect democracy is therefore the most shameless thing in the world.' তবে কানে আঙুল দিয়েও একটু ভেবে দেখলে ক্ষতি নেই, সেই সময়ে 'a perfect democracy' বলতে কী বোঝাতে পারত এবং মনে রাখতে হবে, perfect মানে নির্দোষ, সর্বগুণসম্পন্ন নয়, নিখাদ, নির্ভেজাল, পরিপূর্ণ। এবং পরিপূর্ণ গণতন্ত্র মানে কী? সে কি এমন শাসনব্যবস্থা যাতে আপামর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার মুখে কেউ লাগাম পরাতে পারবে না?

শুধু ডেমক্র্যাসি শব্দটিই নয় সেই ধারণাটিও গ্রিক। এবং প্রাচীন গ্রিসের অন্তত কোনও কোনও অংশে, অন্তত কিছু কাল এমন এক শাসনব্যবস্থা ছিল যা ছিল তাদের মতে এবং ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারদের মতে, ডেমক্র্যাটিক। পরবর্তী কয়েক হাজার বছর কিন্তু সেই ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা আর অন্য কোথাও বিশেষ দেখা যায়নি যেমন তার আগেও দেখা যায়নি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, অগ্রগণ্য প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক পণ্ডিত, যাঁদের রচনাদি এখনও পাওয়া যায়, তাঁরা কেউই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা ডেমক্র্যাসির ব্যাখ্যা করেছেন, তার প্রশংসা করেননি। থুসিডিডিস করেননি, প্লেটো করেননি, অ্যারিসটটল করেননি। এ কথা ঠিক, এঁরা সবাই সমাজের উচ্চতর, বিত্তশালী শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাদের কায়িক শ্রম করতে হত না, এবং বলা উচিত, চিন্তা করবার অবসর এবং অভ্যাস ছিল। এঁদের পক্ষে ডেমক্র্যাসি বিপদের কারণ বলে এঁরা মনে করতেন। কাজেই এঁরা যে ডেমক্র্যাসি অপছন্দ করবেন, তাতে অবাক হবার হয়ত কিছু নেই। তবু, আমরা যারা গণতন্ত্র অত্যন্ত পছন্দ করি, তাদেরও ভেবে দেখতে দোষ নেই। এই বিরূপতা গণতন্ত্রের এমন কোনও দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে কি না, যার বিষয়ে আমাদেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। (সংক্ষেপে বলতে পারি, যাকে বার্ক বলেছেন 'পারফেক্ট ডেমক্র্যাসি' তাকে একটু খর্ব করবার প্রয়োজন যদি আমাদের সংবিধানের প্রণেতারা না বুঝতেন, আমাদের সংসদে রাজ্যসভার ব্যবস্থা থাকত না। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, বিশেষ করে ইদানীং যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে এ প্রশ্ন আবার হয়ত নতুন করে কারও কারও মনে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে যে 'পারফেক্ট ডেমক্র্যাসি'-র যেসব প্রক্রিয়াদি, তাকে একটু শান্ত, সংযত, ধীরগতি করবার জন্য সমাজে অন্য কী ধরনের কর্মতৎপরতাও এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।)

বেশ কথা। বুঝলাম, এ-বিষয়ে ভেবে দেখতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু ভেবে দেখে লাভ কী? তত্ত্বের দিক থেকে রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, অধ্যাপক, সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে দেখতে পারেন। এমনকী এ ধরনের কথাও কেউ হয়ত বলতে পারেন যে নির্বাচনের ব্যবস্থাটাই গণতন্ত্রের পরিপন্থী (বোধহয় সেই জন্যই প্রকৃত অর্থে যাকে নির্বাচন বলা যায় কোনও কোনও 'গণতন্ত্রে' তার স্থান থাকে না) অনেকে যেমন বলেন, জনসাধারণের কী চাই, জনসাধারণই তার শ্রেষ্ঠ বিচারক, তাদের সেসব চাহিদা যখন তারা মেটাতে পারে, তখনই বলা যায় তারা স্বাধীন। নানা জনের নানা চাহিদা, প্রায়শই সেসব চাহিদা পরস্পর-বিরোধী। নির্বাচনেই এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়।

তেমনই আবার রাজনৈতিক তাত্ত্বিক চিন্তার আরেকটি বাধাও আছে। এই মত অনুসারে, লোকে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেইটিই যে তাদের প্রকৃত প্রয়োজন, তা না হতে পারে। কিসে তাদের প্রকৃত স্বার্থ, সে বিষয়ে লোকের ভুল হতে পারে। স্বাধীনতা মানে এই নয় যে খেয়ালখুশি মতো কে কী চায় না চায় তাকেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিতে হবে। যা তাদের প্রকৃত প্রয়োজন সেইটার প্রাপ্তিই

হল স্বাধীনতা। সেই প্রাপ্তিতে অন্যেরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, রাষ্ট্র সাহায্য করতে পারে। জনসাধারণ যাতে সঠিক জিনিসটাই চায়, রাষ্ট্র সেই-রকম চাহিদা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে। তখন তারা যা চাওয়া উচিত তাই চাইবে, যা তাদের চাই বলে মনে করেছিল তা আর চাইবে না। মনে পড়ে রুশোর একটি বিখ্যাত উক্তি, 'মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন করা যেতে পারে।' এ ক্ষেত্রে নির্বাচনের আর তেমন দরকার থাকে না, যা দরকার তা হল রাষ্ট্রের এমন সংগঠন যাতে মানুষের 'প্রকৃত ইচ্ছা' নিজেকে চরিতার্থ করতে পারে।

বুঝলাম, কিন্তু এ-সব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় আজ আর কোনও লাভ আছে কি না এ-প্রশ্ন মনে না জেগেই পারে না। সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন যদি এখনও নাও হয়ে থাকে, অন্তত আমাদের দেশে এই-সব রীতি-নীতি এখন গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলে আমরা সবাই মনে করি। নির্বাচন এখন প্রায় একটা জাতীয় উৎসবে দাঁড়িয়েছে। সুদুর গ্রামাঞ্চলে সাধারণ নির্বাচনে কাজ করার সুযোগ বর্তমান লেখক একদা পেয়েছিলেন। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তখন তিনি দেখেছিলেন, যে-রকম মেলা বসে গিয়েছিল ভোট-কেন্দ্র ঘিরে, সে কথা যখন মনে পড়ে, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না, যে জগন্নাথের রথের চাকা এখন আর উল্টো দিকে ঘোরানো সহজ হবে না।

ব্যালট বাক্সে যে ইচ্ছা ব্যক্ত (ধরে নিচ্ছি নির্বাচন ঠিক মতো হয়েছে) তাকে অমান্য করা এখন আর সহজ নয়। তার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়া দরকার হতে পারে। কিন্তু ব্যালট-বাক্সকে শিরোধার্য করেও কিছু কিছু প্রশ্ন তুললে অন্তত এটুকু লাভ হতে পারে, যে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের অপ্রতিহত প্রভাব খানিকটা খর্ব করবার কথা এবং সেই সঙ্গে সমাজের গরিষ্ঠ-সংখ্যকের গায়েও যাতে ...ীন মক্ত-বুদ্ধির হাওয়া একটু লাগতে পারে, সে-বিষয়ে ... কথা কেউ কেউ ভাবতে আরম্ভ করতে

... স্বার্থের

পরিধির মধ্যেই যদি চিন্তা করা যায়) নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কিংবা নিজের শ্রেণীর, কিংবা নিজের অঞ্চলের মঙ্গলসাধনও যে সমাজের, দেশের অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়, সেটা উপলব্ধি করতে গেলে, কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, বিচারবোধের কিছু বিকাশের, উদারতর ভাবনাচিন্তার দিকে কিছু exposure-এর প্রয়োজন।

অবশ্য এমনিতেও 'পারফেক্ট ডেমক্র্যাসি'-র একাধিপত্য সংযত করবার ব্যবস্থা সংবিধানে আছে, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা আছে। আইনের শাসন, সর্বত্র সমান কার্যকর না হলেও, দেশ থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়নি। সংখ্যালঘুর জন্য বিবিধ রক্ষাকবচ তো আছেই, (বস্তুত যে সংখ্যালঘু, সংখ্যায় খুব লঘু নয়, তাদের দলবদ্ধ ভোটের ওজনও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। এও এক রক্ষাকবচ) কিন্তু ডেমোক্র্যাসিকে বশে রাখবার জন্য পদে পদে যদি জুডিসিয়ারির শরণাপন্ন হতে হয়, তা হলে আর সে ডেমক্র্যাসির মর্যাদা কোথায় থাকে, কোথায় থাকে তার শক্তি?

যতই আমরা স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার গর্ব করি, এ কথা ভুললে চলবে না, গণতন্ত্রে ক্ষমতা জন-প্রতিনিধি, অর্থাৎ আমরা নির্বাচন করে যে-সব প্রতিনিধিদের সংসদে এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় পাঠিয়েছি তাঁদের হাতে। আমরা নির্বাচন করে যাদের সমাজ-বিরোধী বলে আমরা নিজেরাই জানি, যাদের অসাধুতা, ভ্রষ্টাচার আমাদের অগোচর নেই, তাদেরকে বিধান সভায় সংসদে পাঠাব আমাদের শাসন করবার জন্য। আর, তার পরে আদালতে গিয়ে আর্তনাদ করব, ধর্মাবতার এই সব দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। এই যদি এ দেশে রীতি হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে বলতেই হবে আমরা গণতন্ত্রের যোগ্য নই।

মনে রাখতে হবে দক্ষিণ ভারতের যে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বরখাস্ত হলেন, তাঁর দলকে তাঁর রাজ্যের জনগণ বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি সে দলের আনুগত্য অপরিসীম। এবং নির্বাচনে যে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি, এমন অভিযোগও শোনা যায়নি, অর্থাৎ আদালতকে এগিয়ে এসে জনপ্রতিনিধিদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হল।

... মানে, ব্রিটেনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সময়ে ... সদস্য যে বলেছিলেন, 'Let us now ... আমাদের দেশে এখনও ... নাম সই

প্রবন্ধ

# নারী শক্তি সঞ্চারণ

## রেণুকা বিশ্বাস

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আজ্ঞা জারি হয়েছে নৌবিভাগের শিপ-বিল্ডার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার্স সংস্থার উপর যে 'Empowerment of Women' বিষয়ে কার্যক্রম করতে হবে। তাদেরই নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এই সংস্থার মহিলা কর্মীদের সামনে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে হল। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু প্রতিশ্রুত দায়িত্বে গুরুত্ব কতখানি দেওয়া হবে সারা দেশে সেটাই বিবেচ্য। Empowerment of Women বিষয়ে সরকারি মহলের কতখানি ঐকান্তিকতা আছে জানা মুশকিল কারণ কেন্দ্রীয় সরকার পুরুষ অধ্যুষিত। এদের অনেকেই মহিলাদের সঙ্গে নিজেদের সমান অধিকার স্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মনে হল empowerment কথাটাকে বাংলায় সঞ্চারণ বললেই ঠিক হবে। শক্তি যেখানে নেই বা শক্তির যেখানে অভাব সেখানেই শক্তি সঞ্চারণের বিষয়টি আসে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের চাপে পড়ে অন্য দেশের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও সরাসরি মেনে নিয়েছে যে মেয়েদের শক্তি কম এবং সমাজ তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। সে জন্যই সমতা সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। তাই মেয়েদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারণের প্রয়োজন। যেমন বলব energy কম হলে infusion of energy প্রয়োজন। এ বছরটা সেজন্য নারীশক্তি সঞ্চারণ বর্ষ বলে পালিত হচ্ছে। নারীর শক্তির অভাব বলেই শক্তি সঞ্চারণের প্রশ্ন। না হলে তারা স্বনির্ভর কী করে হবে?

কিন্তু মেয়েদের শক্তি কম হল কেন? গত প্রায় দু'তিন দশক ধরে সব দেশে বহু আলোচনা হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে নারী শক্তি সম্বন্ধে। নারীর সামাজিক পরিস্থিতি সকলকেই যেন একটু আধটু সচেতন করেছে। সচেতনতা এসেছে যে সত্যিই সমাজ নারীর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছে এবং এখনও করছে। তাদের প্রতি নানা ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার অত্যাচার অবাধে চলছে। বর্তমান কালেও অধিকাংশ দেশে নারী পরনির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, অসহায়। তাদের সর্ব বয়সে রক্ষা করতে হচ্ছে, তাদেরকে ভরণপোষণ দিতে হচ্ছে। তারা পরিবার বা সমাজের গলগ্রহ। কিন্তু কেন সেটা হচ্ছে? এটা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে গতানুগতিকভাবে সমাজটা চলছে। যে ভাবে সমাজ চলে আসছে তার মধ্যে একটা নিশ্চয়তা বা স্থিতি রয়েছে। বর্তমান অবস্থাকে প্রায় সবাই আমরা মননে মেনে নিয়েছি। পুরুষ ও নারী সবাই। অতএব সমাজে নারী ও পুরুষের স্থিতি, ভূমিকা, সমস্যা, সংকট ইত্যাদি নিয়ে কেন অযথা প্রশ্নের ঢেউ তোলা? মেয়ে জন্মেছে। সবাই জানে তাকে গৃহকর্মে পারদর্শী হতে হবে। তাকে বিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হতে হবে। সে পরের ঘর করবে। এসব তো জানা কথা। এই পরিচিত কথার ফসিল নিয়ে নাড়াচাড়া কেন? তিক্ততা সৃষ্টি কেন? এতে লাভ কী? পুরুষ এবং নারী, দু'দিক থেকেই প্রশ্নগুলো আসে। বিস্তৃত স্থিতাবস্থা বা status quo কে মানা হয় এখনও। ফলে নারীর নিম্নাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

মেয়েদের উপর দু'ঘা, বা অন্যায় আচরণ যদি স্বামীদের দিক থেকে আসে, (সকলের বেলায় না হলেও) তাতে কী এসে যায়?

কি বলার আছে? মেয়েদের যদি অল্পবয়সি বা বয়স্ক পুরুষ যৌন হয়রানি করে, কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য যদি স্থানসঙ্কোচন ঘটে (স্বামীরই তো তাদের খাওয়ানো পরানোর কথা!), তারা যদি আর্থিক দুর্গতির শিকার হয়, তারা যদি নিজ গুণাবলির সম্ভাব্য বিকাশে অসমর্থ হয়; তাদের যদি সতীর্থেরা অপমান-অবহেলা করে বা বৈষম্যের শিকার করে তোলে তা হলে তাতে অত হইচই করার কী আছে? অনেক যুবক ও যুবতীর মুখেও শোনা যায়, 'এ রকম তো হয়ই। মেয়েদের তো ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণু হতে হবে। ওদের উচিত তো সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলা!' যেন মানিয়ে নিতে না পারলে সংসারকে গড়ে তোলা অসম্ভব। তাদের উপরই তো সংসার গড়া ও ধরে রাখার দায়িত্ব! পরিবার, স্বামী ও সন্তানদের জন্য মেয়েদের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। কারণ স্বভি-সন্তোষ, জীবনের অনুভূতি এবং পরিপূর্ণতা আসে মেয়েদের পরিবার, স্বামী ও সন্তানের মাধ্যমে। এ ধরনের চিন্তাধারায় এখনও কি পুরুষ ও নারী সকলেই অভ্যস্ত নয়? বহু মেয়েরাই প্রশ্ন তুলতে না নারীর শক্তিমতি হওয়া না হওয়া নিয়ে; পুরুষের কথা তো বাদই দিলাম। আশার কথা তবু যে কিছু স্ত্রী ও পুরুষ অন্তত এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছে এবং পরিবর্তনের চেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে। সে জন্যই নারী শক্তি সঞ্চারণ প্রযুক্তির আবির্ভাব।

সত্যিকার পরিস্থিতি কী দেখা যাক। ভারতবর্ষের সংবিধান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সমাজ এই সাংবিধানিক বিধান পুর্ণভাবে প্রবর্তন করতে পারেনি। কারণ হল, সমাজের অধিকাংশ নেতারা এবং পুরুষেরা এই বিধানকে গুরুত্ব দিতে পারছেন না। 'সমতা' তাই অনুপস্থিত। মনে রাখা দরকার যে দেশের আইনকানুন তৈরি করে পুরুষেরা। তারাই শাসনযন্ত্রের পুরোভাগে থাকে, নেতৃত্ব দেয়, পরিশ্রম করে সংগ্রাম করে (কখনও বা লোকসভা ও বিধানসভায় মারামারি, ঘুষোঘুষি, চেঁচামেচি, চেয়ার ছোড়াছুড়ি করে, কখনও বা বাইরে খুনোখুনি করে) আইনকানুন পাশ করে। তারপর সেগুলির প্রবর্তন হয়। এই আইন কানুন হয় ৫০০ মিলিয়ন পুরুষ ও ৫০০ মিলিয়ন নারীর জন্যই তো! অথচ মেয়েদের সঙ্গে কেউ এ সব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করে না। মুষ্টিমেয় মহিলা সাংসদ বা বিধায়কের বক্তব্য বা মতামতকে অন্যেরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় না বলে মনে হয়। তাদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় গুন্ডাবাজির হুংকার এবং হট্টগোলে। মহিলা সাংসদ বা বিধায়কদের আবার নিজেদের রাজনৈতিক দলগুলির, যেগুলো কিনা পুরুষ-প্রধান, মতামত মেনেই আওয়াজ তুলতে হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কা আছে না হলে। ফলে তাদের প্রভাব অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়ে। কারণ দেশের সকলের স্বার্থের চেয়ে দলগত স্বার্থকেই তাদের প্রাধান্য দিতে হয়। অতএব বলা চলে যে আইনকানুন তৈরির কাজে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব শূন্য না হলেও উল্লেখযোগ্য নয় বিশেষ।

পাঁচশো মিলিয়ন মহিলা কি বোঝে যে প্রতিনিয়ত যে আইন কানুন মেনে তাদের চলতে হয় তার সৃষ্টিতে, রূপায়ণে বা সঞ্চালনে মহিলাদের অংশ অকিঞ্চিৎকর? তাদের প্রতিনিধিত্ব অকিঞ্চিৎকর? শুধু আছে ভোটাভুটির লোকমুখোশ। আছে জবরদস্তির দমন শাসন। কতজন মহিলা উপলব্ধি করে যে আইনকানুন রচনায় তাদের বিশেষ কোনও স্থান নেই? আসলে ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পুরুষের স্বার্থানুগ এবং পুরুষতন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখারই যন্ত্র হয়ে পড়েছে।

মহিলাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব, নেতৃত্ব বা সক্রিয় অংশগ্রহণ আইনকানুন প্রণয়নে সম্ভব হয় না কেন? বৃন্দা কারাত প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে মেয়েরা নেই কেন? উত্তরে সি.পি.এম-এর দলীয় নেতা হরকিষণ সিং সুরজিতের উত্তর ছিল, নেতৃত্বের যোগ্য মেয়ে নেই। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিছুটা সত্য, শিক্ষার অভাবে মেয়েদের অজ্ঞতা, সুবিধাসুযোগ গ্রহণের অক্ষমতা এবং সংসারের দায়িত্বের চাপে সময়ের অভাব খুবই সুস্পষ্ট যেটা কিনা নেতৃত্ব নেওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে আছে পুরুষশাসিত দলগুলির বৈষম্যমূলক আচরণ। বস্তুত অজ্ঞতা মেয়েদের জন্য সৃষ্ট ব্যবস্থা সমাজে। সাম্প্রতিক আদমসুমারিতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৫৪.২৮% মহিলা সাক্ষর ৭৫.৯৬% পুরুষ সাক্ষরের তুলনায়। অজ্ঞ মানুষকে সহজে চালনা করা যায়, দমন-শাসন করা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে সেজন্যই কি পরিকল্পিতভাবে নারীশিক্ষা ব্যাপারে যত অনীহা, অব্যবস্থা বা কম গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা? 'পরিকল্পিত ভাবে' বলছি এ জন্য যে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারি পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য বা Target গুলির পর্যালোচনা প্রমাণ করবে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। মহিলাদের জন্য স্কুল, কলেজ, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশান মহিলা জনসংখ্যার অনুপাতে এবং পুরুষদের শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনায় কম। জনসাধারণ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। তা ছাড়া বৈষম্যগুলোকে সহজ ভাবে মেনে নেবার মানসিকতা আমাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের (socialization) মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। সাধারণত পরিবারে এবং সামাজিক বাতাবরণে শিশুদের যে ভাবে মানুষ করা হয় তার ফলেই সৃষ্টি হয় যত বৈষম্য। বৈষম্যমূলক শিক্ষাদান এবং আচরণ আমরা সবাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিই।

যেমন দেখা যায় সমাজে মহিলাদের শিক্ষার চেয়ে, স্বনির্ভরতার প্রস্তুতির চেয়ে, বিবাহকেই একমাত্র লক্ষ্য ধরা হয়। প্রকৃত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সম্বন্ধে পরিবার এবং সমাজ মেয়েদের বেলায় বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। দরকার কী? মেয়েটার তো বিয়ে হয়ে যাবে, পড়ছে পড়ুক — ভাবখানা এই।



অর্থার্জনের জন্য তাকে তৈরি করার প্রয়োজন কি? পুরুষকে লেখাপড়া শেখানো, অর্থকরী বৃত্তি, বিদ্যা শেখানোর প্রয়োজন আছে। কারণ তারাই পরিবারের আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে। মহিলারা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নেবার সিদ্ধান্ত নিলেও দেখা গেছে নিজেরাই তার উপর গুরুত্ব দেয় কম। পরিবার তো প্রাধান্য কম দিয়েই থাকে। কিছু দিন আগে সরকারি একটি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমাকে অনুরোধ করলেন যে তাঁর এম. এ. পাশ মেয়ের উপযোগী কোনও কাজকর্মের খোঁজ জানাতে। প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমার মেয়ের পয়সা রোজগারের তেমন প্রয়োজন নেই। এমনি কিছু একটা করতে চায় আর কি।' মনে হল ভদ্রলোক মেয়ের উচ্চশিক্ষাকে স্বনির্ভরতার উপায় বলে মূল্য দিচ্ছেন না। এ মন্তব্য সম্ভবত নিজের ছেলের সম্বন্ধে তিনি করতেন না। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তাঁর মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রীকে বোঝালেন যে পরীক্ষার ফল যাই হোক না কেন তার চিন্তার কিছু নেই। কারণ ছাত্রীটি সুন্দরী। তার ভাল বিয়ে হবে। ছাত্রীর ব্যাখ্যানে প্রফেসর তার বিজ্ঞানে যে অনুরাগ বা তার বিজ্ঞান শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন। তার অর্থার্জনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন না কারণ স্বামীই তার ভরণপোষণের ভার নেবে ভবিষ্যতে।

অর্থার্জন মেয়েদের জন্য 'সেকেন্ডারি' অর্থাৎ কিনা গৌণ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রয়োজন ও দায়িত্ব। প্রাথমিক প্রয়োজন ও দায়িত্ব তার গৃহকর্ম, সন্তানপালন, সেবা অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম। অর্থার্জন এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্বগুলি পুরুষের উপর ন্যস্ত করে সবাই সন্তুষ্ট। পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব প্রধানত পুরুষের। আর্থিক দিক থেকে যত চাপ তাই পুরুষের ওপর বর্তায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা এই চাপের ভাগ নিতে পারে না। স্বনির্ভর নয় বলে। বিবাহ এবং পরনির্ভরতাকে প্রাধান্য দেবার ফলে অধিকাংশ মেয়ের অর্থার্জনে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা কম দেখা যায়। অধুনা পারিবারিক নানা চাপের মুখে অর্থার্জনে লিপ্ত হলেও সে কাজ তার পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্বই হয়ে থাকে। সেভাবে চিন্তা করতেই সকলে অভ্যস্ত।

মেয়েদের ঘরের বাইরের কাজকে সমাজ বিশেষ মূল্য দেয় না বললে অত্যুক্তি হয় না। মেয়েরা সাজসজ্জা এবং অন্যের মনোরঞ্জন করাকে বেশ মূল্য দেয়। সমাজও ঠিক সেভাবে মেয়েদের সজ্জার জন্য উপচে পড়া ভাণ্ডার তৈরি করে দেয়। সৌন্দর্যচর্চাকে উৎসাহিত করে নানাভাবে। মুখশ্রী প্রসাধন, কেশপরিচর্যা, শীর্ণকায় হবার দিকে ঝোঁক অর্থাৎ বিনা শারীরিক দুর্বলতার চর্চা ইত্যাদিকে খুবই মহত্ত্ব দিয়ে থাকে সমাজ এ কথা বলা বাহুল্য। আত্মরক্ষার কৌশলাদিতে নিপুণতা না থাকার জন্য কোনও দোষারোপ মেয়েদের ওপর করা হয় না যেমন হয় পুরুষদের বেলায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষার (Self defence) কৌশলাদিতে মহিলাদের প্রশিক্ষিত করা হয় না। অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় তাদের সে জন্যই।

মহিলারা সম্পূর্ণভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলেই তারা পরিবারের বোঝা হয়ে পড়ে। সে জন্য মা, বাবা এবং পরিবার কন্যাকে পাত্রস্থ করে ভারমুক্ত হতে চায়। স্বামীর এবং স্বামীর পরিবারের ওপরই তখন এ মেয়ের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষন এবং নিরাপত্তা নির্ভর করে। পরিবারের ওপর ভার হয় বলেই মেয়ে জন্মকে ভীতির চোখে দেখে, ভয়ের কারণ বলে মনে করে অনেকে। প্রায় সব দেশে কন্যাসন্তানের জন্ম পুত্রসন্তানের জন্মের তুলনায় অবাঞ্ছিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। আমেরিকার মতো দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করা গেল প্রথম সন্তান হিসাবে তারা কী চায়। ৮২ ছাত্রছাত্রী বলল পুত্রসন্তানই কাম্য। জন্মের আগে ভ্রূণহত্যা বা জন্ম হলে তাকে শৈশবে বিনষ্ট করতে দ্বিধা কম দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে। ভারতীয় সমাজে কন্যাভ্রূণ বিনষ্টি বা কন্যাহত্যার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে।

আর একটা ব্যাপারও দেখা গেছে মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের ব্যবস্থায়। তাদের শেখানো হয় বিনা প্রতিবাদে, বিনা দ্বিধায় সব কিছুকে মেনে নিতে, ন্যায় অন্যায় বিচার-অবিচার, অত্যাচার-অনাচার যাই হোক না কেন। শাস্ত্রের এবং সামাজিক রীতির দোহাই দিয়ে, সেবা-আত্মত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে অথবা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের বাধ্য করা হয় সব কিছুকে মেনে নিতে।

পূজাপার্বন, অতিথিসেবা এবং উৎসবাদিতে মেয়েদের নানা ভাবে নিযুক্ত করা হয়। এসব কাজের ও দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয় প্রায় সব ধর্মগোষ্ঠীতে। সকলের জানা আছে যে হিন্দু মেয়েরা নানা ব্রত পালন করে। তাদের উপবাস থাকার রীতি আছে। এর জন্য ত্যাগের এবং পরিবারের কল্যাণের বাহানা দেওয়া হয়। মেয়েদের কম খাওয়ার নজির সৃষ্টি করা এর মূলে থাকা সম্ভব। মেয়েদের কম খাওয়াকে কোনও কোনও সম্প্রদায়ে স্বামীর অর্থ বাঁচানোর উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কোনও কোনও পরিবারে পুত্রবধূকে পেটভরে খেতে দেওয়া হয় না। যোষপুর পার্কের একটি উচ্চশিক্ষিত সম্পন্ন পরিবারের মেয়ের বিবাহের পরদিন থেকে তার শ্বশুরবাড়িতে ঝি চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হল। পুরো তিনতলা বাড়ি পরিষ্কার রাখার ভার পড়ল নববিবাহিত পুত্রবধূর ওপর। মুশকিল হল যখন এত খাটাখাটুনির পর শ্বশুরবাড়িতে পুত্রবধূর খাওয়া বেঁধে দিলেন শাশুড়ি। ঠিক মতো খেতে না পাওয়াতে মেয়েটির টি.বি. হল বছর না ঘুরতেই। অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাপের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হল। মেয়ে লজ্জায় তার পরিস্থিতির কথা মা-বাবাকে জানায়নি। এটা একটা মাত্র উদাহরণ। বহু ক্ষেত্রে পুত্রবধূর খাওয়ার দিকে

নজর রাখা হয়। এমনই বহু ঘটনা ঘটছে শহরে, গ্রামে। এ প্রসঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে মেয়েদের দুর্বল হওয়াতে বা তাদের দুর্বল করাতে সমাজের উৎসাহের কমতি নেই। সৌন্দর্যের দোহাই, ধর্মের দোহাই, স্বামীর অর্ধাঙ্গিনীর দোহাই ইত্যাদি নানা উপায়ে সমাজ মেয়েদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিবাদের পরিবর্তে এ পরিস্থিতিকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয় বহু মেয়ে। পরমুখাপেক্ষী এবং পরনির্ভরশীল বলেই না। শ্বশুরবাড়িতে পুত্রবধূর অবস্থার মতো পুত্রের বা কন্যার সংসারের ওপর নির্ভরশীল অনেক "মা"কে ও খাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বনির্ভর হলে এবং সব কিছু মেনে নেবার অভ্যাস না করলে এ নিগীড়ন সম্ভবত প্রকাশ হয়ে পড়ত।

বস্তুত দুর্বল এবং রোগগ্রস্ত হয়ে মেয়েরা নিজেদের এবং পরিবারের সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্বামীগৃহে সমস্যা হলে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা অনেকের থাকে না। ফলে যে অসহায়তা এবং আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয় সেটা বহু মেয়েকে আত্মহনন বা পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। নান্য পন্থা। কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব এবং সমাজের সংবেদনশীলতার অভাব।

সব দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় সমাজের মধ্যেই মেয়েদের শক্তিহীনতার মূল রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ধারার মধ্যে নারীর অসহায়তার, দুর্বলতার এবং অক্ষমতার কারণ দৃঢ়মূল। ২০০১ সালেও একই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাহীন হয়ে রয়েছে অধিকাংশ মেয়ে। শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণই এর জন্য দায়ী। আমাদের বিশ্বাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং কাজকর্ম সব কিছুই সামাজিকীকরণের ফল। শুধু পুরুষই মেয়েদের হীনতর ভাবে তাই নয়। মেয়েরা নিজেরাও ভাবে।

নারী ও পুরুষের অবস্থায় সমতা আনতে হলে নারী শক্তি সঞ্চারণ একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত মেয়েদের নিজেদেরই ক্ষমতাকাঠামোর প্রচেষ্টায় লেগে যেতে হবে। শক্তি সঞ্চারণের ক্ষমতা মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই আছে। এটা বিশ্বাস করতে হবে। সৌন্দর্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তিচর্চার উপরেও জোর দিতে হবে। সন্তানপালন কালে পুত্র ও কন্যা দু'জনেরই স্বাস্থ্যগঠন, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যচর্চার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত আত্মরক্ষার কৌশল শেখার প্রচেষ্টা মেয়েদের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দৈহিক এবং মানসিক অত্যাচার, হয়রানি (Harassment), নিপীড়ণ ইত্যাদি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। প্রকৃতি কিন্তু প্রতিটি নারীও পুরুষকে আত্মরক্ষার ক্ষমতায় (Potential) ভূষিত করেছে, পশু পাখি, সমস্ত প্রাণীকে যেমন দিয়েছে এ ক্ষমতা। যখনই বিপদ আসে কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। দেখা গেছে বিপদের বিন্দুমাত্র আভাস ঘটলে রক্তের প্রবাহ শরীরের চামড়ার নিম্নভাগে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। শরীরকে এ প্রক্রিয়া শক্ত করে দেয় তাকে সংগ্রামের বা প্রয়োজনে পলায়নের উপযোগী করার জন্য। সত্যি করে বিপদে আত্মরক্ষার শুধু দুটি উপায় আছে, 'সংগ্রাম' (যে ভাবেই হোক) অর্থাৎ fight কিংবা বিরুদ্ধশক্তির ক্ষমতা অধিক অনুধাবন করলে 'পলায়ন' বা flight। প্রতিটি প্রাণীর এ বিপদমুক্তি প্রক্রিয়া ঘটে। কিন্তু অনুশীলনের অভাবে এবং সামাজিক ভুল মূল্যবোধের ও বাধ্যবাধকতার কারণে মনুষ্য স্ত্রীরা এই আত্মশক্তি প্রক্রিয়াকে হারিয়ে ফেলে। জন্তু জানোয়ারের আচরণ লক্ষ করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। যেমন একটি ছোট্ট বিড়াল বা কুকুরছানা কোনও আগন্তুককে এগিয়ে আসতে দেখলে রুখে দাঁড়ায়, সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধে সক্রিয় হয়। অথবা পলায়ন করে আত্মরক্ষার চেষ্টায়। বিড়ালি, কুকুরী বা সিংহিনীকে কোনও বেড়াল কুকুর বা সিংহ সহজে দৈহিক বা যৌন আক্রমণ করতে পারে না। জন্তুজগতে পুরুষজন্তুর স্ত্রী জন্তুকে রক্ষার ভার নিতে হয় না। শুধুমাত্র মনুষ্যজগতে তার বৈপরিত্য দেখা যায়। স্ত্রীর পুরুষ নির্ভরতা ঘটেছে কয়েক হাজার বছর ধরে। Homo Sapien সমাজে এ ঘটনা কোন সহস্রাব্দ থেকে ঘটতে শুরু করেছে এখনও তা নির্ধারিত হয়নি। তবে এখনকার জগতে মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল না জানা থাকলে তাদের বারে বারে নানা অত্যাচারের শিকার হতেই হবে।

তৃতীয়ত, সামগ্রিক শিক্ষালাভে মনোযোগ চাই, যে-শিক্ষা নারীকে পূর্ণমানুষ হতে সাহায্য করবে। শুধু অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা লাভের কাম্য হতে পারে না। হংসমেহেতা কমিশন ১৯৬২ সালেই বলেছে যে মেয়েদের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত সব কিছুর শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে নিজ অধিকার সম্বন্ধে, আইনকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের জানা দরকার আইনি অধিকার (legal rights) কার কী, নারী ও পুরুষ হিসাবে।

চতুর্থত, মেয়েরা নিজেদের গুণাবলির বা সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ করতে উৎসাহ পায় না। এগুলির বিকাশে সময়, শক্তি (energy) এবং অর্থব্যয় করার জন্য দ্বিধা এবং বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শুধু বিবাহযোগ্যতা অর্জনের দিকে নজর দেয়। ফলে কত প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশ পায় না, কত সম্ভাবনা ও সৃষ্টির ক্ষমতা সূর্যের আলো দেখতে পায় না বা অকালে বিনষ্ট হয়। এ অবস্থা মেয়েদের উন্নতির পরিপন্থী। এতে সমাজ ও দেশের ক্ষতি, পরিবারের ক্ষতি তো বটেই। দেখা গেছে বিবাহের পর, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া বিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী, ইঞ্জিনিয়ার, নৃত্য-গীত-চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী অনেক মহিলা তাদের বৃত্তি পরিত্যাগ করে শুধু হেঁসেলে হাঁড়ি



ঠেলছেন ও সন্তানপালন করছেন অর্থাৎ বিনা শুধু গৃহকর্ম করছেন। হামেশাই এটা হচ্ছে। অন্য সব প্রতিভাবান মহিলারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই হাল। চিকিৎসাবিদ্যা প্রশিক্ষণে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য সরকারের ব্যয় হয় প্রায় চার লক্ষ টাকা। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষায়ও দেশের এবং পরিবারের বহু অর্থ ব্যয় হয়। অতএব শিক্ষা সমাপ্তে এ বিদ্যা কোনও কাজে লাগে না। এ সব মহিলাদের শিক্ষায় ব্যয়িত অর্থ বিনষ্ট হয় সম্পূর্ণভাবে বললে ভুল হবে না। মেয়েদের এ শিক্ষা দ্বারা অর্জিত ক্ষমতা সার্থকতার শীর্ষে পৌঁছতে পারে না যদি বর্তমান মনোভাব এবং আচরণ সমাজে বিধৃত থাকে। অতএব ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের এবং তাদের পরিবারের এ বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

নারী শক্তি সঞ্চারণে সমাজকী করবে? শৈশব থেকেই পুরুষ ও নারীকে একভাবে মানুষ করতে সমাজ পারে না কি? একই ভাবে সন্তানদের মানুষ করার প্রয়োজনীয়তায় মানুষের বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ জাগানো যায় না কি? মনে হয় সকলের মধ্যেই এ বিশ্বাস ও মনোভাব জাগানোর প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আধুনিক প্রচারমাধ্যম আমাদের খুবই বেশি প্রভাবিত করে। সেই মাধ্যমের সহায়তায় মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে সমান শিক্ষা, সমান সুযোগসুবিধা প্রদানে মানুষের বিশ্বাস জাগানো নিশ্চয়ই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের স্বনির্ভর হবার জন্য জোর দেওয়া যেতে পারে। তাদেরও যে অর্থার্জন করা একান্তভাবে জরুরি বিষয় এদিকে আগ্রহের সঞ্চার করতে হবে। প্রচারমাধ্যমের সহায়তা এখানেও ফলপ্রসূ হতে পারে। পুরুষের মধ্যেও গৃহকার্যে এবং সন্তানপালনে আগ্রহ জাগানো সম্ভব একই ভাবে।

এ দেশে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া এবং পণের বিরুদ্ধে আইনকানুন আছে। সেগুলি রূপায়িত করার জন্য বা আইনভাঙার অপরাধে শাস্তি প্রদানের জন্য কোনও আগ্রহ সমাজে নেই। সব শেষে বলা যায়, মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা বা violence প্রতিরোধে যে সমস্ত আইনি সহায়তার ব্যবস্থা আছে, সেগুলির প্রচার হলে আইনগুলি কার্যকর হতে পারে। Life without violence is women's human right এই অনুভাবনা মানুষের মনে সঞ্চার না করতে পারলে নারীর শক্তি সংহত হতে পারবে কী করে? ম্যানিলাতে সাম্প্রতিক এক বিশ্ব নারী সম্মেলনে সব দেশকে আহ্বান করা হয়েছে মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা ও নিপীড়ন দূর করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে। মেয়েরা যে মানুষ, শুধু মেয়েমানুষ নয় বা ভোগ্যবস্তু নয় এ বিষয়টি শিক্ষা, আচরণ ও প্রচারমাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেয়েরা পুরুষের মতোই মানুষ। এ বাতাবরণ সৃষ্টি সম্ভব হলে মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে কম। তাকে ভারও মনে হবে না। নারী শক্তি সঞ্চারণও সহজ হবে। এ ঘটনা ঘটাতে শুধু নারী নয়, পুরুষ এবং নারী অর্থাৎ কিনা গোটা সমাজকে সচেতনভাবে, সংবেদনশীলতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এ বিষয়ে সচেতন নারীর দায়িত্ব রয়েছে অনেক বেশি।

মেয়েরা সন্তানপালনের দায়িত্বে আছেন। স্ত্রী ও পুরুষের সমতার মনোভাব তারা তো সন্তানের মধ্যে বপন করতে পারে না। প্রখ্যাত সমাজসেবিকা ও শিক্ষাবিদ কমলা মুখার্জি একটি ঘটনা বলেছিলেন। তাঁর বাড়ির কাছে একটি বস্তিবাড়ি। রোজ তিনি দেখতেন এ বাড়ির ছ'বছরের মেয়েটি রাস্তার কল থেকে বালতি বালতি জল ধরে আনছে। এ বাড়িরই আট বছরের ছেলেটি কিন্তু বারান্দায় টুলের ওপর বসে স্কুলের পড়া পড়ছে। ছয় বছরের মেয়েটি এই অল্প বয়স থেকেই সংসারের কাজে নুব্জ হয়ে পড়েছে। তার শিক্ষার কথা তার মা বাবা ভাবছে না। মেয়েটির ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে গেছে। এর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ-ও তো একই ধারায় বিবর্তিত হবে। শুধু বস্তিতে কেন সমাজের অন্যত্রও এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়।

মেয়েরা যদি তাদের ছেলে এবং মেয়ে — দু'জনকেই ঘরের এবং বাইরের দুটো কাজের জন্যই প্রস্তুত করে, তাদের সমান দায়িত্ব নিতে শেখায়, দু'জনকেই স্বনির্ভর হতে শেখায়, স্কুল ও কলেজ সর্বত্রই একই ভাবে সমান শিক্ষার সুযোগ দেয়, তা হলে ভবিষ্যতে তারা দু'জনেই সমান সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী হবে। শুধু মাত্র বিবাহের জন্যই কন্যাসন্তানকে তৈরি না করে পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই সমানভাবে সম্পূর্ণভাবে মানুষ হবার শিক্ষা দেওয়া দরকার। আরও মনে হয়, মেয়েদের পরিবারে এবং সমাজে নানা কর্মযজ্ঞে সামিল হতে হবে। সমাজ ও দেশটা কেবল পুরুষের নয়, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলের। এ ভাবনায় সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতাকে পরিবর্তিত করার সময় এসেছে। সময় এখন। "নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার অধিকার" নিজেকে অর্জন করে নিতে হবে। বহু যুগ ধরে অমানিশার অন্ধকারে নারীদের অবস্থান। এখন রোদ চাই, সূর্যরশ্মি চাই। এ রোদ বা রশ্মি আমাদের সকলের মধ্যে আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থসমালোচনা

# রোরুদ্যমান হৃদয়ের তাজা স্পর্শ রয়েছে বইটিতে

## আবদুর রাউফ

'বা মপন্থী আন্দোলনের স্মৃতি কিছু কথা কিছু কাহিনী' বইখানি পড়ে অনেক দিন পরে আবার নয়ন অশ্রুসিক্ত হল। একদা যাদের অনেকেই ছিল আমার সমবয়সী, সেই সব অসামান্য তরুণ তরুণীর অকাতরে প্রাণদানের অন্যতম সাক্ষী যে আমি নিজেও। গ্রন্থের লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অলকা অগ্নি মিত্র সৌরভদের আত্মত্যাগের কাহিনি। এ রকম অজস্র কাহিনি যে আজও অকথিত রয়ে গেল। লেখিকা আরও কিছু কিছু মহৎপ্রাণ নরনারীর আত্মোৎসর্গের কথা মূল বক্তব্যের আনুষঙ্গিক হিসাবে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'দেশের ও দশের কাজে এদের যে আত্মত্যাগ আমি স্বচক্ষে দেখেছি — তা হয়তো কোনদিন কোন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না। শুধু পরিচিত জনের মনের মণিকোঠায় এরা থাকবেন স্মরণীয় বরণীয় হয়ে।' (পৃ. ৮৪) খুবই ঠিক কথা। প্রকৃতপক্ষে মনের মণিকোঠায় তাঁরা আজও 'স্মরণীয়-বরণীয়' হয়ে আছেন বলেই তো এই জাতির জীবনে অনাগত দিনগুলির উপর ভরসা রেখে যাই। পুরোপুরি হতাশায় নিজেকে মগ্ন করতে পারি না। মনের কোণে আশা জেগে থাকে যাঁদের স্মরণ করলেই হৃদয় আজও অসীম বেদনায় ভারাক্রান্ত হয় তাঁদের আত্মত্যাগের ধারা বেয়েই আবার উত্থান ঘটবে তেমনই সোনার ছেলেমেয়েদের।

আবার আমরা নতুন করে ফিরে পাব প্রাণোচ্ছল অলকানন্দা রায়কে। লেখিকা তাঁর প্রাণের বান্ধবী অলকার কথাই একটু বেশি করে শুনিয়েছেন আমাদের। অকপটে স্বীকার করেছেন, না শুনিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। রূপে, গুণে, হৃদয়বত্তায় অসামান্য অলকার সেবাব্রত, ভালবাসা, আত্মবলিদান — এ সবের ঘনিষ্ঠ সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে— 'তাঁর বক্ষে বেদনা অপার .....'। এই অলকা আমারও চেনা। হয়ত আমার চেনা অলকা লেখিকার বান্ধবী নন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অলকা নামী স্কুলের স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্রী। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলেও তিনি কৃতীদের একজন। তাঁর অসামান্য রূপের স্নিগ্ধতায় সবাই মুগ্ধ হয়। তিনি ধনী ঘরের কন্যা। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। বাড়ির রাজসিক রান্নাবান্নায় তাঁর অরুচি। তিনি দু'বেলা নিজের হাতে হবিষ্যান্ন রান্না করে খান। কালিঘাটের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে আর্তের অক্লান্ত সেবায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অশক্ত বৃদ্ধার মল-মূত্র কলুষিত কাপড়চোপড় তিনি পরিষ্কার করতে পারেন নির্বিকার চিত্তে। অলকা স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার লড়াইয়ের অক্লান্ত কর্মী।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন অলকারই অমোঘ আকর্ষণে। অবশ্য পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে লেখিকার এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি ছিলই। তাঁর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, দাদাও শিক্ষক আন্দোলনের সূত্রে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। কিন্তু দাদার হাত ধরে নয়, লেখিকা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার দায় মাথায় নিয়ে পথে নেমেছিলেন অলকার আদর্শ নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে। তখন এই পথ এখনকার মতো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। পার্টির তহবিল সংগ্রহ করতে হত কৌটা কাঁকিয়ে। মিটিং-মিছিল করার অধিকার বাধাবন্ধহীন ছিল না। কথায় কথায় চলত লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি। সদাই মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হত জেলে যাওয়ার জন্য। লেখিকাও জেলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন অলকার সঙ্গেই। এই পর্বে তিনি বলেছেন সেই সব আদর্শনিষ্ঠ আত্মত্যাগী মানুষের কথা যাঁদের নিঃস্বার্থ, নিরলস পরিশ্রমের ফলে, অপরিসীম নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করতে পারা এবং বহুক্ষেত্রে আত্মবলিদানের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, এ দেশের জনচিত্তে শ্রদ্ধার আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তারপর আসে পার্টি ভাগ হওয়ার পালা। অসংখ্য আত্মত্যাগী মানুষের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা পার্টির ভাগ হয়ে যাওয়াটাকে লেখিকা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তিনি সমর্থন করতে পারেননি ডাঙ্গে পন্থীদেরও। কারণ ডাঙ্গেপন্থী কমিউনিস্টরা তৎকালে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তিকে পছন্দ করেছিল। লেখিকার ভাষায় 'যে কংগ্রেসের বড় থেকে ছোট পর্যন্ত অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ, যারা জনগণের কথা ভুলে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। নিজেদের দুর্নীতিকে তারা কাল ব্যাধির মতো ছড়িয়ে দিয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয়রা ছিল সৎ, দেশপ্রেমিক, ধর্মভীরু, সামাজিক মূল্যবোধে, নির্ভেজাল সততায় ও মায়ামমতায় পূর্ণ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসী শাসনে সব



গেছেবদলে।' (পৃ. ৪৬) স্বভাবতই এ হেন কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি তাঁর পছন্দ হয়নি। ফলে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা নীরব দর্শক হয়েই থেকে যান। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। পরিস্থিতি তখন এমনই অলকার মতামত জানানোও সুযোগ তিনি পাননি।

তবে একথা তিনি বুঝতেন, '.... নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক বদলে দেশের কোনও উপকার হবে না। শাসনযন্ত্রের কাঠামোটিকে বদল করতে হবে। ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তি-সম্পত্তি রক্ষার আইন আছে— কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্ন যোগাবার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ক্ষুধিত মানুষ যদি ধনীর উপছে পড়া ভাণ্ডারে খাবারের জন্য হাত বাড়ায় — তবে পুলিশের গুলি ক্ষুধিতকেই রক্ষা করবে বিত্তবানের বিত্ত রক্ষার জন্য।' (পৃ. ৪৮) তাই পার্টি ভাগ হওয়ার পর সি পি আই এম নেতারা যখন শান্তিপূর্ণভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে পার্লামেন্টে দখল করার লক্ষ্যপূরণকে, ক্ষমতা দখল বলে গণ্য করতে চাইলেন, লেখিকার ভাষায় 'তাঁরা বিপথগামী হলেন'। (পৃ. ৪৯) ১৯৬৭ সালে সি পি আই এম রাজ্য সরকারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ফলে অলকাও এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। এক দিন বৃষ্টিঝরা দিনে বান্ধবীর কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'দলের দুরবস্থা দেখছ ত? কোনও দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়নি কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পথ ছেড়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবদলে পৌঁছেছে। অথচ আমরা নিজেরাই কবর খুঁড়ছি। এই আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের মঙ্গল কিছুতেই সম্ভব নয়। মন্ত্রীত্ব নিয়ে আজ কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবকে দুর্বল করে দিচ্ছে।' (পৃ. ৫৫)

পার্টি ভাগ হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই অলকার কাছেই লেখিকা শুনলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের কথা। তখনও অলকা সি পি আই এম দলেরই সদস্য। নকশালবাড়ি আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই আপাতদৃষ্টে কিছুটা পুরুষবিদ্বেষী অলকার জীবনে এসেছেন অগ্নি মিত্রের মতো আদর্শ বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। অলকার পুরুষবিদ্বেষী হওয়ার কারণ নিজেদের পরিবারে পিতার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের প্রতি তাঁর ঘৃণা। যে কারণে অসামান্য রূপসী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ স্তাবকদের তিনি ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির সুযোগ দেননি কখনওই। সম্ভবত সেই কারণেই লেখিকার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব কোনও কোনও সময় লেসবিয়ানিজমের মাত্রা ছুঁয়ে যেত। কিন্তু অগ্নি মিত্রের মতো বিপ্লবী ব্যক্তিত্বকে নিজের জীবনে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে অলকার চরিত্র আরও চিত্তাগ্রাহী হয়ে ওঠে। অগ্নি ও অলকার মিলিত জীবন আরও বেশি করে বিপ্লবের জন্য নিবেদিত হয়। তাঁরা মিলিত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন নকশালবাড়ি আন্দোলনের শিক্ষাকে গ্রামে গ্রামে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজে। অগ্নি মিত্র সি পি আই এম দলের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একবার লেখিকাকে বলেছিলেন, 'বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা ও লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেওয়ার লোভ, অনড় কর্তৃত্ববাদ, সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রবণতা বা আপস — এই সমস্ত চারিত্রিক লক্ষণগুলো পার্টির মধ্যে ফুটে উঠেছে।' তাই বিপ্লবের ধারা অব্যাহত রাখতে সি পি আই এম দল ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখদের নেতৃত্বে সি পি আই এম এল নামে নতুন দল গঠন করে অলকা-অগ্নি মিত্ররা নামলেন মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার কাজে।

কিছু কিছু মুক্তাঞ্চল গড়েও উঠল। মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে এমনই এক মুক্তাঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন অলকা-অগ্নি মিত্ররা। স্বল্পকালের জন্য হলেও মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা তাঁরা ওড়াতে পেরেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকার সুযোগ হয়েছিল এই মুক্তাঞ্চল দেখার। প্রথম দর্শনের কথনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'অনেক দিন পরে মিলিত হলাম অলকা ও অগ্নিদার সঙ্গে, আরও সব যুবক-যুবতীদের সঙ্গে, চোখেমুখে যাদের অনির্বাণ আলোর বিদ্যুৎ, মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়েও যারা ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। ..... অগ্নিদা ভীষণ ব্যস্ত। দলে দলে যুবক-যুবতী শিক্ষার্থীদের বিপ্লবের দীক্ষামন্ত্রে শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ..... অলকার মধ্যে দেখলাম রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দীপ্তি। শিক্ষার্থীদের শুটিং শেখানো, রাজনৈতিক তত্ত্ব বোঝানো, আহার যোগানো ইত্যাদি নানা কাজে সদা ব্যস্ত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের সাধারণ মানুষ ওদের দেবতার মতো ভক্তি করে।..... এখানকার কিশোর ও যুবকরা দেশের ও দশের প্রয়োজনে যেমন জীবন দান করতে প্রস্তুত — তেমনি জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলোকেও উপভোগ করে সমস্ত অন্তর দিয়ে।' (পৃ. ৯৯) কিন্তু এমন আনন্দময় মুক্তাঞ্চল বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায়নি। সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির চূড়ান্ত আঘাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল অচিরেই।

তখন পুলিশের তাড়নায় আবার লেখিকাকেই যেতে হয়েছিল অলকা-অগ্নি মিত্রকে আইডেনটিফাই করার প্রয়োজনে। সেই যাত্রায় পর্যুদস্ত মুক্তাঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, '.... রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত গোপীবল্লভপুর যেখানে একদিন দেখে গেছি কতগুলো নির্ভীক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর প্রাণচাঞ্চল্য, স্বাধীন কৃষকদের সংগ্রামে জয়ের আনন্দ-আজ তা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে — সর্বত্র বিরাজ করছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। .... পর পর শায়িত মৃতের মিছিল। .... দেখলাম অগ্নিদাকে দেখলাম অলকাকে — মুক্ত আকাশের নীচে ওরা রচনা করেছে মিলন-বাসর। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, সেই অনির্বচনীয় হাসির রেশটুকু ঠোঁটের কোণে। ওরা শুয়ে আছে

বিজয়ীর মতো পাশাপাশি।' (পৃ. ১১০-১১) এ ধরনের আরও অজস্র মহৎ প্রাণের বলিদান কি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল? আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হয়ত তাঁদের ভুল ছিল। কিন্তু সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের গণমুক্তির স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্য নতুন পথের সন্ধানে কেউ কি নেমেছে?

বরং উল্টোটাই ঘটছে। লেখিকা কংগ্রেসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কংগ্রেস দেশের জন্য ভাল কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু মন্দ যেটি করেছে তা হল জাতির নৈতিক চরিত্রকে সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়া — সর্বক্ষেত্রে শিক্ষায়, চিকিৎসায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে।' (পৃ. ১০৪) কিন্তু ১৯৭৭ সালের পরে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে টানা পঁচিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে সেই অধঃপতিত নৈতিক চরিত্রের উন্নতি কি কিছু ঘটেছে? যা ঘটেছে সে সম্পর্কে লেখিকার বয়ান — 'আজকের বুদ্ধিজীবীরা, রাজনৈতিক ও সামাজিক নায়করা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্থ, বিপথগামী। পিতামাতার আদর্শহীনতা সন্তানে সংক্রামিত। .... লোভ আর লোভ। এই লোভ মানুষকে এমন এক অন্ধকারের জগতে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ন্যায়-নীতিবোধ, দয়া-মায়া-ভালোবাসা সমস্ত বিলুপ্তপ্রায়।' (পৃ. ১০৪)

তা হলে অলকা-অগ্নি মিত্রদের আত্মদান কি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েই গেল? আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকার মতোই আমারও এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। তবুও যে আকুতি নিয়ে তিনি এই বই লিখেছেন, ভালবাসার যে বেদনা তাঁকে এই বই লিখতে বাধ্য করেছে তা পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত হোক — অনেকখানি এই বাসনা থেকেই বইটির আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছি। বইটিতে রয়েছে প্রবীণা লেখিকার রোরুদ্যমান তাজা হৃদয়ের উত্তাপ। যে উত্তাপের কাছে গৌণ হয়ে গেছে বইটির ভাষার ত্রুটি, বর্ণনার বিশৃঙ্খলা ও ছাপার ভুল। এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও বইটি বহুল প্রচারিত হলে লেখিকার রোরুদ্যমান হৃদয়ের স্পর্শ হয়ত আমাদের বিবেককে জাগ্রত করবে। গণমুক্তির লক্ষ্যে নতুন পথের ভাবনায় আমরা প্ররোচিত হব।

**বামপন্থী আন্দোলনের স্মৃতি কিছু কথা কিছু ভাবনা** — অপরাজিতা / পুস্তক বিপণী, কল — ৯/ ৩৫.০০

# সংগ্রহে রাখার মতো বই

## ঝরনা ধর

চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কটি বাজারে পণ্যমূল্য নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় — অর্থনীতির এই বর্ণপরিচয় আমাদের জানা। তবে চাহিদা যোগানের 'ডিম আগে না মুরগি' — রহস্য আজও অধরা রয়ে গেল আমার কাছে। বহুদিন আগে উনিশ শতকের জনৈক নামহীনা গোত্রহীনার একটি বইকে মাইক্রোফিল্ম করার অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে। নিরুপায় হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, যে-বইয়ের চাহিদা নেই, তা সংরক্ষণ করা হয় না। চাহিদা-যোগানের গোলকধাঁধাঁর সেই শুরু। যে-বইয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অধিকাংশ পাঠকের ধারণা নেই, তার চাহিদা হবে কীভাবে?

আজ ছবিটা বদলে গেছে। নারীবাদী আন্দোলন আর চর্চার জেরে সাহিত্যে মেয়েদের অবদান সম্পর্কে সচেতনতা জেগেছে, জানার তাগিদ এসেছে। বেরিয়েছে অনেক বই। তৈরি হয়েছে বাজার। চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অনেক সময় যোগানের গুণগত মান হয়ত ঠিক থাকেনি, তবে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল, চাহিদার রেখা ক্রমবর্ধমান। সমালোচ্য বইগুলি এর যথার্থতাই প্রমাণ করে। গোলাম মুরশিদের 'নারীপ্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী' এবং যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' দু'টি বই-ই পুনর্মুদ্রিত এবং একাধিকবার। তৃতীয় বই বাসন্তী বাগচীর 'সেকালিনীর আত্মকথা' অবশ্য এই প্রথম প্রকাশিত হল।

৮০-র দশকের গোড়ায় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মুরশিদের Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernisation, 1849-1905' বইটি এ বঙ্গের বিদগ্ধমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরে ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় তার বঙ্গানুবাদ 'সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া।' বর্তমান বইটি তারই পুনর্মুদ্রণ। কেবল বদলে গেছে তার নাম ও ঠিকানা। নতুন নামে বইটি বের করেছে কলকাতার 'নয়া উদ্যোগ'।

পাঁচটি পরিচ্ছেদ এবং তিনটি পরিশিষ্টে বিভক্ত বইয়ের সূচনাতেই লেখক তাঁর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করেছেন। উনিশ শতকের আধুনিকায়নের ধাক্কায় বাঙালি মহিলাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল, বা পুরুষের উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলন কেমন করে বর্তমানের নারী আন্দোলনের চেহারা নিল — তথ্যে বিশ্লেষণে এমনই অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। প্রসঙ্গত সময় ও রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ আন্দোলনের জোয়ার ভাঁটার ছবিও তুলে ধরেছেন।





উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যা মূলত নারীমুক্তি আন্দোলনে গিয়ে ঠেকে, তার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই লেখক ওই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকটি তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত এসেছে পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলনের কথা, এসেছে তুলনা। উনিশ এবং বিশ শতকের মহিলাদের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা বোঝাতে 'সূচনা'য় লেখক 'আধুনিকায়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, শব্দ ব্যবহারের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মুক্তি বা 'emancipation' শব্দটি এক্ষেত্রে যথাযথ নয়, 'liberation' শব্দটি তো আরওই নয়। যৌনতার দিক দিয়ে 'লিবারেটেড' নন এমনকী সে সম্পর্কে ধারণাও নেই বলে একালের শিক্ষিত বাঙালি মহিলারা 'লিবারেটেড' নয়, বলে লেখকের মন্তব্যটি অবশ্য একটু একপেশে বলে মনে হয় কেন না এ সমাজের নারী পুরুষ সাধারণভাবে কেউই এ বিষয়টা নিয়ে তেমন ভাবিত নন, পাশ্চাত্যের তুলনায় এদিক থেকে সত্যিই আমরা বড় বেশি 'ঐতিহ্যিক'। তবে পাশ্চাত্য সমাজও যে ঐতিহ্যের বৃত্তেই ঘোরাফেরা করে, ক্লিন্টন-মনিকার গল্প বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যুযুধান প্রার্থীদের দাম্পত্য প্রণয়ের বিজ্ঞাপন জাহিরের মধ্যে রয়েছে তার পরিচয়। আসলে ভরকেন্দ্র হল পিতৃতন্ত্র। তার ভিত ঠিক রাখাটাই জরুরি।

দেশ-কাল-সংস্কৃতি-ভেদে তার চেহারার হেরফের হতে পারে। কিন্তু মূল জায়গায় চিড় ধরার আশঙ্কা দেখা দিলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। নারীমুক্তি আন্দোলনের জেরে পাশ্চাত্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম স্তম্ভ 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য জেগেছিল তার মোকাবিলাতেই কি রাষ্ট্রসংঘকে 'পরিবার বর্ষ' উদ্‌যাপনের নিদান দিতে হয়নি? সেখানেও তো সেই ঐতিহ্যেরই প্রশ্ন!

নারীমুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এবং তার ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে সমাজসংস্কার আন্দোলনে ধীরে ধীরে লেগেছিল ভাঁটার টান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আসলে উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধ-আন্তরিক সমাজসংস্কার প্রয়াসের মধ্যেই এই রক্ষণশীলতা নিহিত ছিলো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও পরিবর্তন না-করেই অথবা ন্যূনতম পরিবর্তন করেই এই সংস্কার — আন্দোলন সমাজকে সময়ের দিক দিয়ে আধুনিক করতে চেয়েছিলো।' (পৃ. ১১৫)। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলেই সংস্কার আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছত কিনা, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে।

আসলে আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসচর্চার দু'টি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, অন্যটি সামাজিক। প্রথম ধারায় গুরুত্ব পেয়েছে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কৃষি, বাজার-অর্থনীতি বা আইনের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর এসেছিল মূলত তার কথা। অন্যদিকে সামাজিক ইতিহাসের প্রতিপাদ্য প্রধানত উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন। প্রথম ধারায় আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির পরিচয় পাওয়া গেলেও, জানা যায় না স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ওই রূপান্তরের প্রতিক্রিয়ার কথা। অন্য দিকে সামাজিক ইতিহাসে সংস্কার আন্দোলনের বিশদ বিবরণ থাকলেও কদাচিৎ জানা যায় ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী তন্তুজীবীদের দুর্দশার কথা। সে হিসাবে কোনও ধারার ইতিহাসেই সামগ্রিক ছবিটা পাওয়া যায় না। বইয়ের গোড়ায় গোলাম মুরশিদও ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে অন্য দিক থেকে। তিনি বলেছেন, শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত যে শ্রেণীকে ঘিরে সংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, তারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫ %, অতএব 'এ ইতিহাস আংশিকমাত্র।'

১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধের পর একাধারে ব্রিটিশ শাসন তথা শোষণ শুরু হল। প্রশাসনিক আর সামাজিক কর্তৃত্বের জোরে ভারতের সম্পদ শুষে নিয়ে জমা হতে লাগল ইংল্যান্ডে। এ দেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই ওদেশে লাগল শিল্পবিপ্লবের জোয়ার। স্পিনিং মিল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত — ধারাবাহিক উদ্ভাবনের পালা। এ দিকে পরিণতিতে ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার বহু প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলেন, অন্যদিকে ১৭৭১-এ ব্রিটিশ কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের রাজস্ব গেল বেড়ে। অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন, ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস না করলে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব আদৌ সম্ভব হত না। লাগামছাড়া শোষণে সঞ্চিত মূলধনের দৌলতেই ওই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঢেউ। গোলাম মুরশিদের মতে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন যদি 'বঙ্গদেশে কিংবদন্তীমূলক ধনসম্পদ হরণ করে থাকে, বিনিময়ে সে বঙ্গদেশকে দিয়েছিল তার উদার শিক্ষা এবং চিন্তাধারা এবং তার ফলেই বঙ্গীয় সমাজ আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়।' (পৃঃ ১১৯) স্মর্তব্য, এই 'বঙ্গীয় সমাজ' কিন্তু সমাজের ৫ % উচ্চবর্ণের মানুষের সমাজ। সংস্কার আন্দোলনের মূলেও স্থান পেয়েছিল উচ্চবর্ণের সমস্যাগুলি। এ কথা বলার মানে এই নয় যে, ওই সমস্যাগুলি ছিল না। ছিল এবং ভীষণ ভাবেই ছিল। যা বলার সেটা হল, ওই সময়ের নারীসত্তাকে বুঝতে কেবল সংস্কার আন্দোলন যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এও তো ঠিক, পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ওই আন্দোলন প্রশ্ন তুলেছিল কেবল ভারতীয় সমাজ ও পরিবারের রীতিনীতি বা প্রথা নিয়ে, অর্থনৈতিক শ্রেণীসম্পর্ক নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল সামান্যই। ইংলন্ডে কিন্তু ওই আন্দোলনে সেই প্রশ্নটি ছিল রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। আসলে মোড়ক যাই হোক না কেন, মহিলাদের নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার ওই প্রচেষ্টা নিছক সামাজিক ছিল না, ছিল রাজনৈতিক। সংস্কার

আন্দোলনের পেছনে সেই স্বার্থের তাগিদ ছিল অনেকটা। শাসক হিসাবে ব্রিটিশদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বকে শাসিতের মননে-চৈতন্যে সুদৃঢ় করাও ছিল জরুরি। পরবর্তীকালে রসবেরিকে লেখা এলগিনের চিঠিতেও ওই মনোভাব স্পষ্টই বোঝা যায় — 'We could only govern by maintaining the fact that we are dominant race.' বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে কতকটা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছিল উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার তথা নারীমুক্তি আন্দোলন যে ভাবে চাপা পড়ে গেল, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিকেরা। গোলাম মুরশিদের মতে, সংস্কারের মাধ্যমে মহিলাদের কিঞ্চিৎ আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন পুরুষেরা, কিন্তু এর ফলে মহিলারাই একদিন পুরুষাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন সেটা মানতে পারেননি। ফলে সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তি আন্দোলনের ওপরেই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন তারা। এতদ্ব্যতীত, জাতীয়তাবাদী চেতনাও রয়েছে এর মূলে। জাতীয় চৈতন্যে তখন আধুনিকায়ন পাশ্চাত্য প্রভাবিত বিদেশি একটি ধারণামাত্র। জোয়ানা লিডল (Joanna Liddle) এবং রমা যোশীর মতো গবেষকেরা অবশ্য এর কারণ বিশ্লেষণে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নটি টেনে এনেছেন। তাঁদের মতে, এক দিকে জাতীয়তাবাদ অন্য দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের রাজনৈতিক কর্মসূচি — এই দুয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ফলেই নারীমুক্তি আন্দোলনে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসের এমন সরলরৈখিক পর্যবেক্ষণে অবশ্য অনেকেরই আপত্তি আছে। সুমিত সরকারের মতো ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রেক্ষিতে একদা-সংস্কারপন্থীদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধারণভাবে প্রত্যাগমন (retrogressive) বলে মনে হলেও তাকে রক্ষণশীল পশ্চাদ্‌গামীতা (backlash) বলে ধরাটা ঠিক নয়, বরং সংস্কার আন্দোলনের ওই সীমাবদ্ধতাই স্বাভাবিক। কেননা ঔপনিবেশিক পরিবেশে বুর্জোয়া আধুনিকতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। বড়জোর, তার 'দুর্বল ও বিকৃত' হাস্যকর অনুকরণই প্রত্যাশিত। সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতও কতকটা সে রকম। তিনি মনে করেন, নারীসম্পর্কিত প্রশ্নটি 'প্রগতিশীল' এবং 'জাতীয়তাবাদে'র মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিকেই প্রকট করে তুলেছিল। তাঁর মতে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই জাতীয়তাবাদীদের আচারআচরণকে প্রত্যাগমন (retogressive) বলে মনে হতে পারে।

আসলে ভারতীয়ত্ববোধকে সুদৃঢ় করতেই জাতীয়সংস্কৃতির 'আত্মিক নির্যাসকে' রক্ষণ ও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস, ওই সময়ে নারীমুক্তির প্রশ্নটি বির্তকের মূল কেন্দ্র থেকে কেবল 'অদৃশ্য' হয়ে গিয়েছিল, বলপূর্বক তাকে 'দমিয়ে' রাখা হয়নি। সংস্কার-আন্দোলন পাছে মহিলাদের পাশ্চাত্যমুখী করে ভারতীয়ত্ববোধে ধস নামায় — এই উদ্বেগ ছিল নিরন্তর। গোলাম মুরশিদও বলেন সংস্কারকেরা ইহলৌকিক সুযোগ সুবিধের জন্য পুরুষের পাশ্চাত্যায়নকে সমর্থন করলেও মহিলাদের 'ঐতিহ্যিক' হিসাবেই দেখতে চাইতেন।

সংস্কার আন্দোলনের পরে জাতীয়তাবাদের সময় সংস্কারকদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন লেখক। এমনই আরও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ও তথ্যে সমৃদ্ধ বইটি।

তিনটি 'পরিশিষ্টে' ঠাকুরপরিবার, বামাবোধিনীপত্রিকা ও বাঙালি মহিলাদের পোশাক নিয়ে বিশদ আলোচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। 'পরিশিষ্ট'- ৪-এ সখীসমিতির সদস্য এবং ৫-এ ডিগ্রিপ্রাপ্ত মহিলাদের তালিকা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু পরিশিষ্ট-৬-এ নির্বাচিত লেখিকাদের তালিকার ভিত্তি সম্পর্কে জানালে পাঠক আরও উপকৃত হতেন। সব মিলিয়ে সংগ্রহে রাখার মতো বই।

'কেশব জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা'র সাম্প্রতিক সংস্করণটি সম্ভবত চতুর্থতম পুনর্মুদ্রণ।

কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর (২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪) এক মাস পরেই তাঁর আত্মজীবনীটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'মহিলা' পত্রিকায় (১৩১৪-র পৌষ থেকে শুরু হয়ে ১৩১৬ সনের আশ্বিন মাস পর্যন্ত মোট ১২ কিস্তিতে)। আত্মকথাটির অনুলেখক ছিলেন লেখিকার নাত জামাই যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর। বই-আকারে এর প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সালে। বেরিয়েছিল ঢাকার ভারত মহিলা প্রেস থেকে। অনেক পরে শারদীয় 'এক্ষণ' (১৩৯০) পত্রিকা এর পুনর্মুদ্রণ বের করে। সে পত্রিকাও এখন দুর্লভ। এ বছর তাই 'নয়া উদ্যোগ'-এর উদ্যোগে পুনর্মুদ্রিত হল 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা'। পুনর্মুদ্রণের এই পুনরাবৃত্তিতে বোঝা যায় বইটির গুরুত্ব। আরও বোঝা যায় সারদাসুন্দরীর আত্মকথা নয়, বরং কেশবজননী হিসাবে তাঁর পরিচয়ই ছিল সেই গুরুত্বের কারণ। অন্যথায় রাসসুন্দরী দাসীর মতোই অবস্থা হত তাঁর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজৈবনিক গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একশো বছরেরও বেশি সময় লেগে যায় 'আমার জীবন'-এর পুনর্মুদ্রণে! সমালোচ্য বইটির 'ভূমিকা'তেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এ সত্য 'তাঁর জীবন-কাহিনী অনুলিখনে উত্তর প্রজন্মের আগ্রহের অনেকখানি কারণই তাঁর পুত্র — ধর্মগুরু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।' বই-আকারে প্রথম সংস্করণের 'নিবেদনে' যোগেন্দ্রলালও জানিয়েছিলেন অনুলেখনের সময় একে তিনি 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ'



হিসাবে মনে করতেন এবং 'সহস্র বৎসর পরে নববিধানাশ্রিত লোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া লিখিতাম।' এই উদ্দেশ্যেই নববিধান প্রচারক গিরীশচন্দ্র সেনের 'মহিলা' কাগজেই বেরিয়েছিল লেখাটি।

সমালোচ্য সংস্করণের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ভিন্ন। 'মাতা-মাতামহী পিতামহীদের সলজ্জ সঞ্চয়ের বৈভব' উদ্ধার এবং 'ঘোমটার আড়ালে আবছা মুখের ছবি' খোঁজাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্যে সফল নয়া উদ্যোগ।

এই প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরল বাসন্তী বাগচীর নিজের কথা 'সেকালিনীর আত্মকথা'। হেমন্তবালাদেবীর কন্যার আত্মজীবনীটি দুটি পর্বে বিভক্ত — ঘর ও বাহির। ঘর-পর্বের শুরু লেখিকার জন্মকাহিনি দিয়ে 'শঙ্খ-অভাবে কাঁসার থালা'ই যেখানে আগমনীর সুর শুনিয়েছিল। বাহির-পর্বের বিষয় বিবাহ পরবর্তী জীবন।

পিতৃ-মাতৃসূত্রে জমিদারি ঘরানার মানুষ বাসন্তীদেবী। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর বড় হয়ে ওঠা, মায়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ। মামার বাড়িতে ছিল সঙ্গীতচর্চার ধারা, মামা বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। গানের ওপর আজন্ম টান ছিল বাসন্তীদেবীর। ১৪ বছর বয়সেই স্বরলিপি তৈরিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী জীবনে নানা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কৈশোরেই সাহিত্যপ্রতিভারও পরিচয় রেখেছিলেন বাসন্তী। কালিদাস নাগের উৎসাহে অভিনয়ও করেছিলেন। ঘর-বাহির পর্বে ছড়িয়ে আছে এমনই অনেক কথা। ঘর পর্বের তুলনায় বাহির পর্বের আয়তন দ্বিগুণ। বাহির পর্ব জুড়ে লেখিকার 'গানের ভুবন'। গানের সঙ্গে এসেছে সংস্কৃতি জগতের বহু পরিচিত বর্ণময় চরিত্রের গল্প, প্রসঙ্গ। সৈয়দ মুজতবা আলি, প্রবোধ সান্যাল, নরেন দেব, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল-কন্যা মায়া দেবী, চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবী, চন্দ্রাবতী দেবীর কথা।

বাহির পর্বে বিখ্যাত সব মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছে শ্বশুরবাড়ির মানুষজনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, অন্দরমহলের নিভৃত ছবি। 'লেখিকা পরিচিতি'-তে সম্পাদক অলকরঞ্জন বসুচৌধুরীও বলেছেন এ কথা। তবে কিছুটা যেন অভিযোগের ভঙ্গিতে। তাঁর মতে 'বিবাহিত নারীর নিজের ঘর যে স্বামীর সংসার' সে সম্পর্কে লেখিকা বিশেষ কিছুই বলেননি। স্বীকার করছি, তত্ত্বগতভাবে নারীবাদে বিশ্বাসীদেরও এ জায়গায় একটু যেন অস্বস্তি হয়। সামাজিকীকরণের জোর এখানেই। স্বামীর সংসারই যে নারীর জগৎ — লক্ষ্মণরেখার সে গণ্ডি পেরিয়ে কদাচিৎ এগোয় আমাদের চিন্তা চেতনা। পুরুষের লেখায় বহির্জগত আর নারীর লেখায় অন্দরমহলের ছবিই আমাদের কাছে 'স্বাভাবিক'। অথচ অনেক সময়ই সে হিসাব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আত্মকাহিনিতে বাসন্তীদেবীর স্বামী (সম্পাদকের ভাষায় 'সর্বাধিক উপেক্ষিত') তেমন গুরুত্ব পান না। একশো বছর আগে একই ভুল করেছিলেন বোধ হয় রাসসুন্দরী দেবী। নিজের কথা বলতে বসে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল বই প্রায় ফুরিয়ে এল, স্বামীর কথা তো বলা হল না!

আত্মকাহিনিতে সে সময়ের রাজনীতির কোনও ছাপ পড়েনি। সম্পাদকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমরা এক মত। এই ফাঁকগুলি ভরাট হলে লেখাটির বৈচিত্র এবং ক্যানভাস নিঃসন্দেহে আরও বাড়ত। বইয়ের শেষে সংযোজিত 'প্রসঙ্গকথা'য় যত্নের ছাপ আছে। পাঠক উপকৃত হবেন। প্রচ্ছদও সুন্দর। তবে বানান সম্পর্কে আর একটু সতর্কতা দরকার ছিল। সবশেষে একটা কথা, ২০০ টাকা দামের বইয়ের বাঁধাই এমন হবে কেন যে কয়েকবার ওল্টালেই পাতা খুলে হাতে চলে আসে! দামটাও কি বেশি নয়?

**নারীপ্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী — গোলাম মুরশিদ**/ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ৬/১০০

**কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা — যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর**/ নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ৬/৫০

**সেকালিনীর আত্মকথা — বাসন্তী বাগচী**/ ভাষা বিন্যাস, কলকাতা - ৩৯/২০০

# শিক্ষকতার দায়

## নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মাত্র ৮০ পৃষ্ঠার ছোট্ট বই 'ঐতিহ্য, বিস্মরণ ও শিক্ষকতার দায়'। লেখিকা মৃণালিনী দাশগুপ্ত। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করেছেন। তাঁর কথায় '১৯৬১ থেকে কলকাতার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে সাতাশ বছর কাজ করেছি। শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরিও করেছিলাম বছরে ১২০ জন হিসাবে।' সাধারণ হিসাব অনুযায়ী তিনি ৩২৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর তৈরি শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার

অগ্রগতি, শিক্ষা-দান পদ্ধতি এবং শিক্ষকের দায় প্রসঙ্গে তিনি ভেবেছেন অনেক। সেই ভাবনারই প্রতিফলন দেখি বর্তমান বইটিতে। বারোটি ছোট ছোট প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। একটি পরিশিষ্টও আছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পারস্পরিক যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। 'বিগত ৬০ বছর ধরে তিনি শিক্ষাসেবী হিসাবে' যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন 'সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে' তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে আজকের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মৃণালিনী দাশগুপ্তের অভিজ্ঞতার আলোয় আমরা আলোকিত হতে পারি। আগামী প্রজন্মের শিক্ষককুল তাদের মূল্যবোধের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারেন। 'প্রাককথন'-এ তাঁর প্রত্যাশা : 'একুশ শতকের শিক্ষকরা আসুক নতুন ব্রত নিয়ে, বুঝিয়ে দিন শিক্ষকতা শুধুমাত্র পেশা নয়।' এই প্রত্যাশার পিছনে একটি আক্ষেপ রয়েছে 'বিগত শতকের ১৯৪১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত শিক্ষকতা করে এসে আজ জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে শিক্ষা জগতের বিশৃঙ্খল অবস্থা বিশেষতঃ শিক্ষার কাজকে ব্যবসাদারী পেশাতে পরিণত করায় যে অবনমন ঘটেছে, শিক্ষাকে ভোগ্যপণ্যের পর্যায়ে এনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে ইজারা দেওয়ার ফলে সমাজে মূল্যবোধহীনতার তাণ্ডব মনকে বড় পীড়া দিচ্ছিল।' এই পীড়ন থেকে মুক্তি আসবে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সংকলিত প্রবন্ধগুলি গভীর চিন্তন ও অনুভূতির স্পর্শে সজীব। শিক্ষার বিকাশে নানা প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'যে সমস্যাটি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তা হল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও শিক্ষককুলের বর্তমান অবস্থা। কিন্তু জনগণ, জনমত বা রাজনৈতিক নেতা এঁদের খুব বেশি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন মনে হয় না।' প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছে। এই নৈরাজ্যের জন্য শিক্ষার বর্তমান পরিকাঠামো যেমন দায়ী, তেমনই শিক্ষককুলও সে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। লেখিকার মতে, শিক্ষকেরা আজ ভোগবিলাসী হয়ে উঠেছেন, মূল্যবোধ তাঁদের নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছাত্রসমাজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখলে অস্বীকার না করে উপায় নেই। তবে গোটা শিক্ষককুল ভোগবিলাসী এবং মূল্যবোধহীন তেমন ভাববার কোনও কারণ নেই। শিক্ষার্থীর অভিভাবক-অভিভাবিকারা সকলে কি যথোচিত দায়িত্ব পালন করেন? সমাজের অন্যান্যদেরও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার কথা, তা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাতে পারে। সামাজিক দায়-দায়িত্বহীন মানুষের কাছ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অশালীন আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই 'আজ ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি এসে শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্বন্ধে অসম্মানসূচক মন্তব্য করে।' একটা সময়ে পারিবারিক-সামাজিক শিক্ষা এমনই ছিল যে ছাত্র-ছাত্রীদের অশালীন আচরণ বাড়িতে বরদাস্ত করা হত না।

মৃণালিনী দাশগুপ্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি লিখেছেন, 'মেধা, প্রতিভা, চিন্তাশক্তি, মননশক্তি, তার বিকাশ, চর্চা তো শিক্ষা-জগতে বিলুপ্ত। ধনবাদী ভোগবাদ গ্রাস করছে, মানুষের চাহিদা ও লোভকে ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে।' এ তো আজকের সামাজিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা শুধুমাত্র শিক্ষকের পক্ষে কি সম্ভব! আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আবার উদ্ধৃত করি, 'কুসংস্কার, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার' জন্য সমাজের সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলির বিরুদ্ধে শিক্ষককেও লড়াই করতে হবে অন্য সকলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে। কারণ, এটি সামাজিক কর্তব্যকর্ম। আর সামাজিক দায়িত্ব সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষক-নির্ভর নয়, সমাজের সর্বস্তরের ইতিবাচক ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। 'শিক্ষকের কাছে সমাজ বেশি প্রত্যাশা করে যেহেতু তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক।' কিন্তু এই বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ-প্রদর্শকের পাশে সমাজের অন্যান্যরা না দাঁড়ালে কর্মে ও উদ্দেশ্যে সিদ্ধি আসবে কি করে! আশা করা যেতেই পারে, 'শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা এগিয়ে আসবেনই।'

এই বইয়ের ছত্রে ছত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস প্রকাশিত। সেই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কেও লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বইটি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দলিল হিসাবে গণ্য হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

**ঐতিহ্য, বিস্মরণ ও শিক্ষকতার দায়/ মৃণালিনী দাশগুপ্ত/** নয়া উদ্যোগ, কলকাতা — ৬। / দাম ৩৫.০০

# ভাষার সমাজ বিজ্ঞান

## হেদায়েতুল্লাহ

স্যার উইলিয়াম জোন্সের শকুন্তলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়। এর অনেক পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মু. শহীদুল্লাহের প্রথম ছাত্র হিসাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের



বিভাগে ভর্তি হওয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। এর পরে সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, আবদুল হাই প্রমুখের পদচারণা উপমহাদেশের ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ও তৌলন পদ্ধতির অনুশীলন করেছিলেন। তাঁদের কাছে ভাষাতত্ত্ব ছিল মানবিকী বিদ্যা (Humanities)। ফলে ভাষার সঙ্গে জড়িত সমাজ, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী সেস্যুরের যুগান্তকারী এক নয়া তত্ত্বের ফলে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন ঘটে। তাঁর মতে ভাষা হচ্ছে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। নোয়াম চমস্কি এই বিজ্ঞানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর আবার পেছনে ফিরে তাকাতে হল। কারণ কখনও কখনও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার অবস্থান নির্ণয়ের দরকার হয়ে পড়ল। ফলে ষাটের দশকে ভাষাবিজ্ঞানের এক নতুন শাখা খুলে গেল — সমাজভাষা-বিজ্ঞান।

১৯৫৮ সালে মু. শহীদুল্লাহ 'ভাষা ও সমাজ' নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কগুলো তুলে ধরেন। তবে তা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মৃণাল নাথের 'ভাষা ও সমাজ' বইখানা বাংলাভাষায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণা পাশ্চাত্য দেশে অনেকখানি হলেও, আমাদের দেশে ততখানি অগ্রগতি হয়নি। সে ক্ষেত্রে মৃণালবাবু পথিকৃতের দাবিদার। তিনি সমাজভাষা বিজ্ঞানকে চার ভাগে ভাগ করেছেন — ১. অন্যোন্যক্রিয়াবাচক সমাজ ভাষা বিজ্ঞান (Interactional socio-linguistics), ২. পরস্পর সম্বন্ধী—সমাজভাষাবিজ্ঞান (Correctional sociolinguistics) ৩. ভাষা-পরিবর্তন এবং ভাষা-সংযোগ সমাজভাষাবিজ্ঞান (Language change and language contact sociolinguistics) এবং ৪. ভাষা সমস্যার সমাজভাষাবিজ্ঞান (Language problems sociolinguistics)।

বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলো যে নবতর সংযোজন সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সমাজভাষা-বিজ্ঞান খুবই বিস্তৃত এবং জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে আরও গবেষণার অবকাশ আছে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের অনেক নতুন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। অন্যোন্যক্রিয়াবাচক সমাজভাষাবিজ্ঞান পর্বে তিনি ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যোন্যক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কথনের ভাষাগত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষিক আপেক্ষিকবাদ আলোচনা কালে তিনি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাভারেজ ইয়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে এস্কিমো ও হোপি ভাষার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। স্ট্যান্ডার্ড অ্যাভারেজ ভারতীয় ভাষার সঙ্গে আন্দামানের ওঙ্গি, সেন্টিনেলিজ এবং গ্রেট আন্দামানিজদের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা এখানে করা হয়নি।

বিভিন্ন কারণের জন্য ভাষার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অঞ্চল ভেদের জন্য উপভাষাও সৃষ্টি হয়। পরস্পর সম্বন্ধী সমাজভাষা বিজ্ঞান ভাষিক ও অভাষিক হেতুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে।

তৃতীয় আক্রমে তিনি আলোচনা করেছেন ভাষার পরিবর্তন, তার পেছনে সামাজিক কারণ এবং ভাষা সংযোগের ফলে ভাষার পরিবর্তন, নতুন ভাষার উদ্ভব, বিকাশ বা ভাষার মৃত্যু। ভাষা সর্বদা চলমান। তাই তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনের পেছনে অনেক সামাজিক, রীতিগত বা পরিস্থিতিগত কারণ বিদ্যমান। এই পরিবর্তনের সূত্রগুলো তিনি আবিষ্কার করেছেন। চতুর্থ আক্রমে তিনি ভাষার বিভিন্ন সমস্যা দেখিয়েছেন। প্রত্যেক ভাষারই কিছু সমস্যা আছে। আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষা পরিকল্পনা করা হয়। বানান সংস্কার, পরিভাষা নির্মাণ, অভিধান রচনা প্রভৃতি ভাষা পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে। তবে একে ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনা বলে। আর যখন কোনও ভাষার রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন করা হয়, তখন তাকে মর্যাদা পরিকল্পনা বলে। যেমন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা কালে তিনি অনেক পরিভাষা রচনা করেছেন। তবে সবগুলোই যে গ্রহণযোগ্য হবে, এ কথা এখনই বলা যাবে না। যা হোক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এমন বিস্তৃত আলোচনা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যে অভিনব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

**ভাষা ও সমাজ — মৃণাল নাথ /** নয়া উদ্যোগ, কলকাতা - ৬ / ১২৫.০০

# ভাল আছ কবিতা?

## নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২০০১ সালে যখন ধ্বংস, নাশকতা, অপহরণ এবং আত্মহননের সংবাদ দিনের শুরুতেই আমায় প্রবল ধাক্কা দেয় কিংবা আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তখন কি কবিতাপাঠ আমাদের কাছে বিরক্তিকর কিংবা অর্থহীন মনে হয়? বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমাদের অন্দর মহলে হামলে পড়ছে। ক্রমশ আমরা হয়ে উঠছি কমপিউটার-অনুগত। মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুদ্ধ-হুমকি, চরম বেকারত্ব, মানবিকতার অবিশ্বাস্য অবমূল্যায়ন, নারী-নির্যাতন, অপুষ্টি এবং ওষুধের অভাবে তৃতীয় বিশ্বে শিশু-মৃত্যু, মাদকের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আসক্তি আমাদের সমাজের ভিতটাকেই যখন ভয়ঙ্করভাবে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তখন আমাদের এই সন্ত্রাস-আক্রান্ত, বিক্ষুব্ধ জীবনে কবিতা কতটা জায়গা পাবে? এই সময়ের মারণ-উত্তাপ নিতে নিতে একজন কবিতা পাঠকের মনে এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসতেই পারে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রশ্নগুলো নিয়ে ক্রমশ মনে হচ্ছে, সময়ের চালচিত্র দ্রুত বদল হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে কবিতাকেও ক্রমশ প্রকৃত অর্থে সময়ের আধার হয়ে উঠতে হবে। প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি কবিতার আবহমান বিষয়। প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা একজন কবির বাস্তবিক অনুশীলন। কিন্তু শুধু বিষয়ের অনন্যতা এবং প্রকরণগত কলাকুশলতার সীমিত বৃত্তে কবিতাকে আবদ্ধ রাখলে তা ক্রমশ পাঠকের আকর্ষণ হারাবে। কবিতাকে হয়ে উঠতে হবে সন্ত্রাসময়, দুর্বোধ্য ও জটিল সময়ের স্বচ্ছ দর্পণ। সময় ও সমাজের ঘনিষ্ঠ তাপ কবিকে মর্মে মর্মে অনুভব করতে হবে। উৎপীড়িত ও বিভ্রান্ত মানুষের চেতনায় আলো ফেলতে হবে। কবির দায়িত্ব এ রকমই মহান।

এখন ঠিক কীরকম কবিতা লেখা চলছে? কিছু কাব্যগ্রন্থ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ে দেখা যাক।

দেবী রায় ছ'-এর দশকের কবি। প্রায় ৪০ বছর কবিতা লিখছেন। কবিতার শরীরে নারীসুলভ পেলবতা দেবীর কোনও কালেই পছন্দ নয়। তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, একজন আবেগবর্জিত এবং অদৃষ্টবাদী মানুষ জীবনের সব খেলাকেই তির্যক দৃষ্টিতে দেখছেন। এই অন্য ভাবে, কিছুটা বিক্ষুব্ধ, রুক্ষ ও মায়াহীন ভঙ্গিতে জীবনরহস্যকে উদ্‌ঘাটন করার নিরন্তর প্রচেষ্টাই হল এই কবির রচনার আসল মজা। লেখালেখির শুরু থেকেই দেবী অন্যদের কারও মতন নন। নিজের মতন। তাঁর কবিতাকে অনেক সময় অ-কাব্যিক মনে হয়। এখানেই দেবীর বিশেষত্ব। তিনি চাঁচাছোলা এবং নির্মেদ এক ভাষায় বড় বেশি অপ্রিয় সত্যিগুলো পাঠকের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন। 'এই সেই তোমার দেশ' কবিতায় দেবী লিখেছেন — 'এই সেই তোমার দেশ — যেখানে একই সঙ্গে একই কালে/ভরপুর-আস্থা বিজ্ঞান আবার ছায়ার মতো চালিত হয় কুসংস্কার/এই সেই তোমার দেশ — যেখানে একই সঙ্গে একই কালে/গ্রহণ করে আধুনিকতা মেনে-ও নেয় পাশাপাশি রক্ষণশীলতা'। ঠিকই তো। এই অস্বস্তিকর স্ববিরোধিতা সমাজে, ব্যক্তিজীবনেও। আমাদের প্রত্যাশা মতন দেবী তো তাঁর সময়কেও বিশ্লেষণ করেন কবিতায়: 'যে যুগে স্বপ্নেও কোনো স্বাধীনতা নেই।/ যে যুগে কেউ না কেউ তোমায় দূর থেকে/ তীক্ষ্ম নজর রাখছে-ই'। অনেকের মতন দেবীও তো ভাবিত সঠিকভাবেই — 'যখন বেঁচে থাকতেই আমাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে/ তখন আমি কি ভাবে লিখবো?'

ছ'-এর দশকের আর এক প্রধান কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তী গীতিকুশলতা, নস্ট্যালজিয়া এবং প্রেমের তীব্র আকুতি দিয়ে তাঁর কবিতাকে ভীষণভাবে পাঠযোগ্য করে তুলতে পারেন। অর্ধেন্দুর কবিতায় শব্দরা প্রতীকী। ছন্দ ব্যকরণসম্মত। ছন্দ-ভাঙার খেলাতেও তাঁর স্ফূর্তি। অপরূপ সব চিত্রকল্পের সমাহার অর্ধেন্দুর কবিতা। তিনি লিখেছেন : 'ভেজা জাহাজের রাত, তিতিরের মৃত্যুডানা খোলা,/তাঁতঘরে ছায়া-আকারের ফুল,/এই হচ্ছে শূন্যতা তোমার।' মাঝে মাঝে তিনি সময়ের সমালোচনাতে নির্মম : 'হরেন সাঁই পাঁচ-পাঁচ বার জেলফেরত, পাতি ক্রিমিনাল/আজ সভাধিপতি, বান্ধবী অনিতা সাঁই, ওরফে রক্ষিতা।' আর একটি কবিতায় তৃতীয় বিশ্বের ছবি — 'তৃতীয় বিশ্বের মাঠে মাঠে/ রোদে পোড়া অড়হর, গাছপাথর,/ভাঙা প্রাইমারির লাউডগা।/ কাছে দূরে থিকথিকে জীবন/তাতে ঘুণপোকার শব্দের মতন/চাপা কণ্ঠ 'মা, ভাত দাও।'' তবে হীরকপ্রভাসহ এক একটি লিরিকেই অর্ধেন্দুর অপরিসীম দক্ষতা। একটি অসাধারণ লিরিকের উদাহরণ: 'এ-মাসের নাম মৌরীফুল/এ রকমই ভাবা যাক/চলো ভ্রান্ত হয়েই থাকি/ জীবনের নীল ফিকে,/এসো শরীরে জড়িয়ে চিনি/এবার কুসুম হবে খালধারে'—।

অর্ধেন্দু বা দেবী-র সমসাময়িক আর এক লিরিক্যাল মেজাজের কবি প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ। শব্দের চাতুর্য, ছন্দের দক্ষতা, কল্পনার বর্ণময়তা, চিত্রকল্পের নিগূঢ় উদ্ভাবনা এঁর করায়ত্ত। প্রত্যূষপ্রসূন খুব বেশি কোনও দিনই লেখেননি। কিন্তু যা লিখেছেন



তাতে সব সময়েই ঝলসে উঠেছে তাঁর মেধার প্রখর দীপ্তি। তাঁর কবিতার পাঠক সীমিত। কিন্তু তাঁরা সকলেই মনস্ক পাঠক। সুলিখিত গীতিকবিতার উদাহরণ — 'এখন খেলা সাঙ্গ করো পাতার করতলে/কৃষ্ণচূড়া ফুলেরা জানে পাতার আবডালে,/ আভূমি তুমি প্রণত থাকো জন্মদিনের পায়ে/ যে নদী ঢেউ বিলিয়ে দিয়ে তোমার চোখে/আলোর রেখা জাগিয়েছিল, জেগেছে তৃণভূমি/ সবুজ বন, গভীর নীল আকাশ এলো নেমে/নম্র হলো বুকের ভিতর, হাওয়ার হাত ধরে ....'। শহুরে জীবনের গদ্যময় নাগরিকতা এই কবিকে মুগ্ধ করতে পারেনি কোনও দিন। প্রকৃতির সাহচর্যে, স্বপ্নে এবং কল্পনায় তিনি অর্জন করেন তাঁর উৎসর্জন। প্রকৃতির ঘন-গভীর ছবি প্রত্যূষপ্রসূনের কবিতাকে বর্ণময়তার বৈচিত্রে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'দিনলিপি' কবিতায় তিনি লিখেছেন — 'এখন খয়েরি বালিতটে পুরনো নিয়মে খেলা,/বুড়ো আঙুলের দাগ গেঁথে গেঁথে গর্ত খুঁড়ে/ ফের সমুদ্রের জলে ভরাট করেছি।/ .... সূর্যের গাঢ় আলোছায়া পৃথিবীর কাছিম পিঠের/ওপর দিয়ে বহে যায়, কপিশ স্মৃতির নীল, বিস্মৃতির আলো।'

ষাটের আর এক বিশিষ্ট কবি অনন্ত দাশ কবিজীবনের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন — 'আমার নিজস্ব কোন দুঃখ নেই, তবু/ সারাটা জীবন আমি দুঃখে ডুবে আছি/ জন্ম-প্রজন্মের চিন্তা নিয়ে বহুকাল আমি/ঘনিষ্ঠ পাপের কাছে শুয়ে উত্তাপ চেয়েছি।' অনন্তের কবিতার বিশেষ কয়েকটি গুণ পাঠকের কাছে তাঁর রচনাকে অন্য ভাবে উপভোগ্য করে তোলে। ছন্দের সাবলীলতা, শব্দ-ব্যবহারের দক্ষতা, প্রতীকী ভাবনার সহজ প্রকাশ তাঁকে আলাদা ভাবে চেনায়। উপলব্ধির গভীরতা হল তাঁর কবিতা রচনার উৎস। তবে আপাদমস্তক দুঃখবাদী হওয়ায় অনন্ত শুধুই ক্ষয়, মৃত্যু, অন্ধকার আর পতনের অনন্ততায় যেন বাঁধা পড়ে আছেন। 'বোধের বিষণ্ণ অগ্নি' তাঁর কবিতায় সর্বদা বহ্নিমান। অনন্ত লিখেছেন : (ক) 'আমার যৌবন যেন কলঙ্কিত নদী/ যখনি হাতড়াই স্মৃতি, উঠে আসে পাঁকমাটি, শামুকের খোল'। (খ) 'সময়, আমার কণ্ঠে বিষ হয়ে আছে/আমি তার উৎকণ্ঠিত নীলে/একরাশ দুঃখশোক, ঘৃণা ও ব্যর্থতা নিয়ে/যন্ত্রণাজর্জর হয়ে ঘুরি।' এখানে আলোচ্য অনন্তর 'নির্বাচিত কবিতা'-র শেষ কবিতা 'রেখে যাচ্ছি' থেকে ১২ লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না — 'রেখে যাচ্ছি দীর্ঘ ভালবাসা/ রেখে যাচ্ছি অসমাপ্ত বাড়ি/ রেখে যাচ্ছি ধুলো আর ধোঁয়া/ রেখে যাচ্ছি সাট্টার জুয়াড়ি -/ রেখে যাচ্ছি পরাবাস্তবতা/ রেখে যাচ্ছি শান্ত ক্যাথিড্রাল/ রেখে যাচ্ছি বিষণ্ণ মমতা/ রেখে যাচ্ছি আজন্ম-আকাশ-/ রয়ে গেল ধূর্ত রাজনীতি/রয়ে গেল চোরা নির্বাচন/রয়ে গেল ধারাবাহিকতা/ রয়ে গেল রবীন্দ্রসদন।'

দেবব্রত চৌধুরী চার দশকেরও বেশি সময় প্রবাসী। স্থায়ী ভাবে লন্ডনে বাসরত। তা সত্ত্বেও তিনি যে বাংলাভাষার চর্চায় এখনও মগ্ন এবং নিয়মিত কবিতা রচনাতে আগ্রহী এই তথ্য আমাদের বাঙালিদের গর্বিত করে। 'নির্বাসিতের একশোটি কবিতা' দেবব্রতর সুমুদ্রিত গ্রন্থ। 'সহমর্মী নির্বাসিতদের জন্য'— উৎসর্গীকৃত। কিন্তু 'নির্বাসিত' শব্দটি কি দেবব্রতদের ক্ষেত্রে সঠিক? এ রকম তো নয় যে এই ভারতবর্ষ কিংবা পশ্চিমবাংলা কিংবা বাংলাদেশ দেবব্রতদের মতন আরও অনেককে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। ফলে তাঁরা প্রবাসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। হয়ত জীবিকার তাগিদেই তাঁরা পরদেশবাসী হয়েছিলেন। তারপর ক্রমশ প্রবাসের স্বচ্ছন্দ জীবন, চাকরির উঁচু মান, বিলাস বৈভবের মধ্যে বাঁচবার আকর্ষণ তাঁরা কাটিয়ে উঠতে না পেরে সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছেন। এই নির্বাসন তো দেবব্রতদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত। অতএব, আমাদের ধারণা, কবিতা গ্রন্থটির নাম হওয়া উচিত ছিল : 'আত্মনির্বাসিতের একশো কবিতা'। স্বীকার করতেই হবে দেবব্রতর কবিতার হাত খুবই বলিষ্ঠ। ভাষা, চিত্রকল্প এবং ভাবনাও আধুনিক। বাংলা কবিতার মূল স্রোত থেকে তাঁর প্রবাসজীবন যে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি গ্রন্থের কবিতাগুলি তার প্রমাণ। প্রবাসবন্দি হয়েও দেবব্রত স্বদেশের মায়াবি শহরকে ভুলতে পারেননি। 'নাকি এক মায়াবী শহর' – কবিতায় তাঁর স্মৃতিমেদুর উচ্চারণ : 'সে নাকি তিলোত্তমা শুনেছি তো বহুকাল আগে,/ ছড়ানো আলোর মালা দীপান্বিতার মত/আঁধার সেখানে ঘুমোয় সোনালী প্রদীপ জ্বেলে/ সেখানে হলোনা যাওয়া এখনো আমার,/ সেই তিলোত্তমা এখনো কি তেমনি আছে/ বালকের সেই স্বপ্নপুরীর মত/আমি শুনতে চাই সব কিছু তার ভালো মন্দ/ সে যে আমার স্বপ্নের নারী, রহস্যময়ী–'।

বাংলাদেশের তরুণ কবি আহমদ রফিক তাঁর 'ভালোবাসা ভালো নেই' কাব্যগ্রন্থে মোট ৪২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের কবিতায় ভালোবাসাকেই বিশ্লেষণ করেছেন এই ছন্দহীন, অস্থির, রক্তাক্ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। রফিকের ভালবাসা কখনও 'চেতনার প্রথম বিস্ময়', কখনও 'তুষারমৌলি অহঙ্কারের কুহক', আবার কখনও সেই ভালোবাসা – শুধু চরম দুঃখবোধের উৎস : 'খালি হাত নিয়ে/ঘরে ফেরা একা নিজেরই কাছে/ মনে হয় যেন বিশ্বভুবন বিকিয়ে গেছে।'

তরুণ কবি বিকাশ শীল অন্য রকম, স্বতন্ত্র এক কবিতার ভাষা আবিষ্কার করতে চাইছেন। কারোর মতন নয়, নিজের মতন লিখব — এই সঙ্কল্পই তো একজন কবিকে ব্যতিক্রমী করে তোলে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল কাব্যভাষার উদাহরণ — 'আমি তখন ভাবনার কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে/মুক্ত/প্রস্তুত/ আংরো রাখব বলে/ দোলপ্রান্তরেই খুঁজতে লাগলুম/জলচৌকি/চন্দনকাঠ/ বৈরাগী জলের আড়াল'-। লিখে যান বিকাশ। ' বেশ খাসা' স্বাদ আপনার কবিতার!

**স্বনির্বাচিত কবিতা — দেবী রায়**/ইউনির্ভাসিটি বুক পাবলিশার্স, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—১২০৭/৫০.০০

**জল যখন একাকী — অর্ধেন্দু চক্রবর্তী**/পূর্বা, কলকাতা/৩৫.০০

**শ্রেষ্ঠ কবিতা — প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ**/প্রমা, কলকাতা-১৭/৫০.০০

**নির্বাচিত কবিতা — অনন্ত দাশ**/রক্তকরবী, কলকাতা-৯/৩৫.০০

**নির্বাসিতের একশোটি কবিতা — দেবব্রত চৌধুরী**/ক্যাম্প পাবলিকেশনস, কলকাতা-৩৯/ ১০০.০০

**ভালোবাসা ভালো নেই — আহমদ রফিক**/গণপ্রকাশনী/ নয়ারহাট, ঢাকা – ১৩৪৪/৩৫.০০

**এ বেশ খাসা আছি — বিকাশ শীল**/জনপদপ্রয়াস, চুঁচুড়া/২০.০০

# বিতর্কিত তসলিমার তর্কাতীত পুরুষবিদ্বেষ

## মীনাক্ষী ঘোষ

বহু বিতর্কিত তসলিমা নাসরিন অন্তত একটি বিষয়ে তর্কাতীত — পুরুষ বিদ্বেষ। সম্প্রতিকালের 'ফরাসি প্রেমিক' উপন্যাসটিতে ফরাসি দেশ ও সমাজ সম্পর্কে নানা চমকপ্রদ তথ্যকে ছাপিয়ে ওই পুরাতন অনুভবটি আরও একবার তীব্র দম্ভে সুপ্রতিষ্ঠিত। লেখিকা দেখিয়েছেন, পুরুষ স্বার্থপর নারীকে সে ভালবাসে না, কেবল নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করে মাত্র। পৃথিবীর সব দেশেই (ভারতে, ফ্রান্সে) ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় পাগল নারীকে বার বার ঠকতে হচ্ছে, অপমানিত, অত্যাচারিত হতে হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক, সুবিধাবাদী, ভোগসর্বস্ব পুরুষের কাছে।

পুরুষের অবহেলার শিকার হিসাবে উপন্যাসে দুটি পার্শ্বচরিত্র আছে — নায়িকা নীলার মা, মিঠু। উভয়ের মৃত্যুর জন্যই দায়ী করা হয়েছে পুরুষকে। এই দুটি মৃত্যু সম্পর্কে নীলার সৎ, গভীর করুণাবোধ পাঠককে সহজেই স্পর্শ করে। বিশেষত মা সম্পর্কে নীলার বেদনা, মায়ের স্নেহচ্ছায়া ফিরে পাবার জন্য জীবনের বাঁকে বাঁকে তীব্র ব্যাকুলতা, চিরদুখিনী মা-কে এক ফোঁটা শান্তি দেবার জন্য অবুঝ কাতরতা এবং মা-মেয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মহত্ত্ব উপন্যাসটিকে বিশেষ সৌন্দর্য দিয়েছে। আবার এই সৌন্দর্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নায়িকার পুরুষবিদ্বেষের বীজ। এ কাহিনিতে পিতা, পিতা হয়ে উঠতে পারেনি, সে আসলে এক নির্যাতিত, বঞ্চিত মায়ের স্বেচ্ছাচারী, আত্মসুখী স্বামীমাত্র। নীলার জীবনে পিতা থেকে যে-পুরুষ বিদ্রোহ শুরু হয়েছে তা শেষ হয়েছে ফরাসি প্রেমিকে। নীলার মনে সামান্য বিশ্বাস ছিল বুঝি বা 'সাদা ভালো'। কিন্তু কাহিনির শেষে (পৃঃ ৩০২) দেখি সে বিশ্বাসের 'সামান্যটুকুর শেষ কণা নিশ্চিহ্ন করা সহজ নয়, সে জানে, তবে সে কঠিন কাজটি করে তৃপ্তি পেয়েছে।' ফরাসি প্রেমিককে নিষ্ঠুর ভাবে তাড়িয়ে দিয়ে 'তৃপ্তি' পাওয়াই প্রমাণ করে নীলা তার মা বা মিঠুর মতো হেরে যাওয়া নারী নয়, পুরুষের সঙ্গে (সে সাদা বা কালো যেই-ই হোক) মোকাবেলা করবার ক্ষমতা তার আছে।

উপন্যাসের আগাগোড়া এই লড়াই — বাবা, দাদা, দাদার বন্ধু সুনীল, ভারতীয় প্রেমিক সুশান্ত, ফ্রান্সে ভারতীয় স্বামী কিষাণ এবং সবশেষে ফরাসি প্রেমিক বেনোয়ার সঙ্গে লড়াইতে জেতার পর কালোদের মধ্যে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে নীলা। এই ইচ্ছার মধ্যে উপন্যাস শেষ হয়ে যাওয়াতে প্রশ্ন জাগে ওটা ঠিক কী ধরনের ইচ্ছার ইঙ্গিত। সাদা এবং বাদামি পুরুষদের প্রতি বিতৃষ্ণা হবার পর নিগ্রো ছেলে মোডিকো-র ফোন নম্বর, ঠিকানা জানতে চাইল কেন নীলা। এবার কি তার কালো-পুরুষ জয়ের অভিযান? অন্তত চরিত্রটিকে তো গোড়া থেকে সেই ভাবেই গড়া হয়েছে। সে কারণেই চরিত্রটি পাঠকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তীক্ষ্ম পুরুষ বিদ্বেষের মধ্যে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারীর যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে অহঙ্কার স্পষ্টতর হয়ে যাওয়াতে নীলার পক্ষে পাঠিকা-পাঠক-হৃদয় জয় করা কঠিন। অকাতরে টাকা পয়সা খরচ করেও নীলা উদারচরিত্র বলে চিহ্নিত হচ্ছে না এই অহঙ্কারের কারণেই। অবাক লাগল যখন দেখলাম এমন একজন স্বাবলম্বী, স্বাধীনচেতা, তেজি মহিলা অতি সহজে দাদার বন্ধু সুনীলের বাহুতে ধর্ষিত হচ্ছে, মনে মনে ঘৃণা করলেও ঘটনার সময় সে জোরালো কোনও আপত্তিই জানাচ্ছে না। এ আচরণ পাঠক হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে কি করে?

অতঃপর মানসিক আস্থা বা শ্রদ্ধা ছাড়াই বারবার ফরাসি নায়কের সঙ্গে নীলার শরীরী আদানপ্রদান। এটি যে কারণেই (একাকিত্ব কাটাবার জন্য অথবা দেহের খিদে মিটাবার জন্য) ঘটে থাকুক, চরিত্রের মহত্ত্বকে তা খর্ব করেছে। নীলা যখন একটি বাড়ি ভাড়া নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে তখন বেনোয়ার নিষ্ক্রিয়তাতেই প্রমাণ হয়েছে লোকটি কি পরিমাণ স্বার্থপর। তা ছাড়া রুচিতে, কৃষ্টিতে বেনোয়ার সঙ্গে প্রথম থেকে নীলার একেবারে অমিল দেখানো হয়েছে। সাধারণত প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের ভাল দিকগুলোই দেখে এবং মুগ্ধ থাকে। কিন্তু বেনোয়া ও নীলা প্রতি পদে নিজ নিজ শিক্ষা এবং রুচির অহঙ্কারে বদ্ধ



থেকে পরস্পরকে ছোট করছে। বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে এই কামড়া কামড়ি যেমন সহজ প্রেমের ক্ষেত্রে তেমনই অবিশ্বাস্য। পরিস্থিতি যখন এই রকম তখনও নীলা বারবার উদ্দাম সঙ্গমে মিলিত এবং পুলকিত। নায়িকার মতো নায়ক চরিত্রটিও মহত্ত্ব বঞ্চিত। কারণ নায়কের যত রূপ গুণ সবই দৈহিক; যৌনতার ক্ষেত্রে তার স্থান ওপরে হতে পারে কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে নয়।

উপন্যাসটির সবচেয়ে দুর্বল অংশ 'এখানেই শেষ' অধ্যায়টি। নীলার হঠাৎ পাথরের চেয়েও কঠিন অতি নিষ্ঠুর আচরণ এ পর্যায়ে দেখানো হয়েছে যার জন্য পাঠক পাঠিকার মনকে প্রস্তুত করা হয়নি। একজন বিবাহিত পুরুষ আর কীভাবে নীলাকে প্রেম জানাতে পারত? সন্তানসম্ভবা নীলার প্রতি আনুগত্য দেখাতে বেনোয়া অতি প্রিয় এবং নিতান্ত নিরপরাধ স্ত্রী কন্যাকে ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিয়ের আংটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নীলাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। আদরে, মিনতিতে, যুক্তিতে ক্রমাগত বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু নীলা যেন পাথর। সে স্বেচ্ছায় বেনোয়ার সন্তানকে আসতে দিয়েছে নিজের দেহে কেবল যেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্যই। বেনোয়া এর পর নীলার পায়ে মাথা রেখে কেঁদে চলেছে — 'আমাকে তুমি ছেড়ো না। এত নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি' তারপর 'বেনোয়া কাঁদে আরও। বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁদে। মাথা দেওয়ালে ঠোকে। একবার, দুবার, তিনবার। কপাল কেটে রক্ত বার হয়।' অনুনয়ের এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড বহুক্ষণ চলবার পরও 'নীলা হো হো করে হেসে ওঠে।' এবং সিদ্ধান্তে (গর্ভপাত এবং বেনোয়াকে ত্যাগ) অটল থেকে যায়।

পাতার পর পাতা বিস্তৃতভাবে পুরুষকে নিচু করার, জব্দ করার এই নাটকীয় নারকীয় খেলায় লেখিকার ব্যক্তিগত আত্মপ্রসাদ থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতকে বিশ্বগত করে তোলার দায়িত্ব পালিত হয়নি। বিস্মিত হয়ে পাঠক পাঠিকা ভাবতেই পারে বেনোয়ার সঙ্গে নীলার তবে এত মেলামেশা এবং বিছানা রগড়ানো কেন? তাকে সকন্যা বিবাহিত জেনেও? তাকে আত্মকেন্দ্রিক, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন জেনেও? তবে কি জবাইয়ের পশুকে যেমন খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা হয় কতকটা সেই কায়দায় অপমান করে তাড়াবার সুখ উপভোগ করার উদ্দেশ্যেই চলছিল এত ঘেঁষাঘেঁষি? যদি একটি অভিসন্ধিমূলক প্রেমের নায়িকা গড়তে চেয়ে থাকেন লেখিকা, যদি পুরুষের প্রতি প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় বিকৃত, অতি নিষ্ঠুর একটি নারীকে রূপ দিতে চেয়ে থাকেন তা হলে অনেক আগে থেকেই তাকে সেই ভাবে গড়া প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ করে 'এখানেই শেষ' অধ্যায় জুড়ে দিলে বেনোয়াই বা মানবে কেন আর পাঠকহৃদয়েই বা তা গ্রাহ্য হবে কি করে?

এরপর যৌনপ্রসঙ্গ। বাংলা উপন্যাসে নরনারীর সঙ্গমের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তৃত বিবরণ কোনও পুরুষের কলমেও (সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মরণ রেখে বলছি) ইতিপূর্বে পড়েছি বলে মনে পড়ে না। বাঙালি নারীর কলমে যৌনতার এই বিবস্ত্র আত্মপ্রকাশ হয়ত যুবক যুবতী পাঠককুলকে উত্তাল করবে। এ ছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে নারীমুক্তি আন্দোলনে এই নিঃসঙ্কোচ কলম বোধ হয় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করল। তবে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে লেখিকার কাছে আরও কিছু চিন্তাভাবনার আশা রইল। কারণ যৌনতাকে পর্নো থেকে সাহিত্যে উঠিয়ে আনার সময় কলমের ওপর বাস্তব ছবির সঙ্গে আরও কিছু দায়িত্ব যুক্ত হয়। সেখানে শুধুমাত্র যৌনতার জন্য যৌনতা নয়, আর্টের জন্য যৌনতা। গানে যেমন তান বাট যা খুশি করা যায় কিন্তু সম-এ এসে পৌঁছাতে হয় তেমনই। শরীরী বর্ণনা মাঝে মাঝে আসক্তির ডোবায় আটকা পড়ে গেছে। যেমন, 'বেনোয়ার বেনোজল' শব্দটি বার বার ব্যবহার করে লেখিকা হয়ত যৌনতৃপ্তি পেয়েছেন কিন্তু অতি বর্ণনায় যৌনতা শিল্পোচিত তীক্ষ্মতা হারিয়ে অপেক্ষাকৃত জোলো হয়ে গেছে।

বইটিতে দু'একটি ছোটখাট পঙক্তি ইচ্ছাকৃত মনে না হয়ে অনবধানতাজনিত মনে হয়েছে। যেমন — পৃঃ ২১৯, বেনোয়া — 'তুমি কি জান পাসকালকে আমি আমাদের সব কথা বলেছি।' তারপরে ২২৬ পৃষ্ঠায় আবার নীলা — 'ও (পাসকাল) কি জানে আমাদের কথা!' নায়িকাকে ভারতীয় হিন্দু বাঙালি বলা হয়েছে। অথচ তার মুখে 'লজ্জা'-র বদলে বারবার 'শরম' শব্দের প্রয়োগ, 'প্রণাম'এর পরিবর্তে 'কুর্নিশ' শব্দ মুসলমান বাঙালির কথা মনে পড়ায়।

মাঝে মাঝেই অসহনীয় একাকিত্ব এবং হতাশ, বিতৃষ্ণ এক জীবনবোধকে খুব সার্থক ছবিতে ধরেছেন লেখিকা। ভাল পাড়ায়, অনেক দামি, প্রকাণ্ড, চমৎকার বাড়িটি ভাড়া নিতে পারার সার্থক দিনেও নীলার খাঁখাঁ মনটিকে প্রকাশ করতে লিখছেন — 'বারান্দার রেলিঙে একটি একা পাখী এসে বসে, পাখীটি বিষ্ঠা ত্যাগ করে উড়ে যায়।' অপূর্ব। অপরিচিত ফরাসি দেশের মাটিতে চমকপ্রদ সব ঘটনায়, নিপুণ পর্যবেক্ষণে উঠে আসা সমাজচিত্রে, কলমের গতিতে 'ফরাসি প্রেমিক' নিঃসন্দেহে একটি 'ইন্টারেস্টিং' উপন্যাস, যদিও চলমান ঘটনাগুচ্ছ কোনও নির্দিষ্ট পরিণতির ইঙ্গিত রাখেনি।

বইটিতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে রয়েছে অবারিত স্বাধীনতা, সম ও বিষম কামের যথেচ্ছ উপভোগ এবং উপভোগের বিস্তৃত, নিরাবরণ বর্ণনা। এগুলি ফ্রান্সের পটভূমিতে দিব্যি মানানসই হলেও তার 'ইমপ্যাকট' মধ্যবিত্ত বাঙালি-সমাজের ওপর কী হতে পারে চিন্তাযোগ্য। তবে এ সব প্রসঙ্গের দরুণ উপন্যাসটির বাণিজ্যিক সাফল্য সুলভ হবে।

লাল বেনারসি নক্সার পাড়ে চেয়ে থাকা নারী-দৃষ্টি — বইটির প্রচ্ছদ। উজ্জ্বল, রুচিবান এবং নিঃসন্দেহে অর্থবহ।

**ফরাসি প্রেমিক — তসলিমা নাসরিন** / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা — ৯/২৫০.০০

# মনে রাখার মতো গল্প

## অসীম রেজ

প্রচলিত ধারার গল্প ও উপন্যাস লিখে একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন লেখক সুধাংশু ঘোষ। তাঁর রচনার আকর্ষণীয় দিক হল কাহিনি গড়ে তোলার মুনশিয়ানা ও ভাষার মাধুর্য। পারস্পরিক ব্যক্তিসম্পর্ক এবং ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের ভিতর বোঝাপড়া ও দ্বন্দ্বের মানবিক উত্তাপ আমাদের চারপাশের পরিচিত জগৎকে যেন নতুনভাবে চেনায়। চরিত্রগুলি ও তাদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতটি খুব কাছের মনে হয়। লেখকের পঁচিশটি বাছাই গল্পের সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজের নানান শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, ভাললাগা-মন্দলাগা, মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে অন্তর্বলয়ের চিত্রটি আশ্চর্য নিপুণতায় ফুটে উঠেছে। গল্পগুলি সময়ানুক্রমিক সাজানো না থাকায় এর সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। তবে এর বেশিরভাগ গল্প যে সত্তর দশকের কাছাকাছি সময়ে বোঝা যায় যখন দেখি গ্রাম ভাঙছে, শহরতলি গজিয়ে উঠছে, মূল্যবোধের ভাঙন আমাদের ভিতরে ভিতরে গ্রাস করছে, সামাজিক চেতনা থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, সর্বোপরি, একাকিত্বের সমস্যা ব্যক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই একাকিত্বের অনুভূতি আবার ব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতির আদলে। লেখক প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন মনোবিশ্লেষণের ভাষা হিসাবে। গড়ে উঠেছে নানান চিত্রকল্প অসংখ্য ডিটেলসের কাজে। আর লেখক হিসাবে সমসাময়িক অন্যান্যদের থেকে এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বোঝা যায়। তাঁর গল্পের বিস্তার গ্রাম ছেড়ে শহর, শহর ছেড়ে শহরতলি। কখনও তা বাস্তবতার গা ঘেঁষে, কখনও স্বপ্ন ও বাস্তবতায় মিশে, কখনও বা পুরোপুরি প্রতীকী রূপ নিয়েছে। চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব, সুখদুঃখ, জ্বালাযন্ত্রণা, কামনাবাসনা, অবদমিত ইচ্ছা ও একাকিত্বের দুঃসহ বেদনা প্রকৃতির এক মর্মভেদী সংবেদনশীল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। নিখুঁত বর্ণনা ও দৃশ্যময়তা বড় হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে।

মনে রাখার মতো গল্প 'বিনিসুতোয়' নিখিলেশ, করবী বা অধ্যাপক ড. দত্ত রায়ের মতো রক্তমাংসের মানুষগুলো আবেগ ও অনুভূতি হারিয়ে প্রাণী সংগ্রহশালার জীবজন্তুতে পরিণত হয়েছে। 'তিনজন এবং তিনটি ঘোড়া' গল্পে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ঘোড়ার প্রতীকে ধরা হয়েছে। শৈলশহরটি যেন উন্মুক্ত মনের ক্ষেত্র এবং ঘোড়াগুলি অবচেতনের রূপকল্প। বাস্তবকাহিনীকে স্বপ্নের আদলে তুলে ধরা হয়েছে 'যদিও রূপকথা' গল্পে। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলিতে ফ্রয়েডীয় চিন্তাভাবনা প্রধান হয়ে উঠেছে। গুটিয়ে আনা ও শেষপর্যন্ত দুঃসহ একাকিত্বের ভিতর নিজেকে খুঁজে বেড়ানোর গল্প 'খোঁজ', 'দুই পাপী', 'মালিনী ও স্টেশনের মেয়েটা', 'অলীক রাজ্যপাট', 'মনোমোহনের একদিন' ও অন্যান্য। গ্রামীণ পটভূমিকায় গড়ে ওঠা গল্পগুলিতে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনীতি, অভাব অনটন ও ভাগ্যের অন্বেষণে শহরে পাড়ি দেওয়া বড় হয়ে উঠেছে, যেমন 'একটি পরিচ্ছেদের খসড়া', 'ন্যাংটো', 'অভিমন্যু' কিংবা 'হৃদয়ে রজনী' গল্পগুলি। এর মানবিক আবেদন মনকে ছুঁয়ে যায়। সুধাংশুবাবুর গল্পে ভাষার শক্ত গাঁথুনি কাহিনির অন্তর্নিহিত অর্থকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করেছে। তাঁর গল্প আবার নতুন করে পড়তে ভাল লাগে।

**পঁচিশটি বাছাই গল্প — সুধাংশু ঘোষ**/ অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা — ৬/৬০.০০

## সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

### নাট্য বিষয়ক সংকলন

**বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত — নৃপেন্দ্র সাহা** / পুস্তক বিপণি, কলকাতা — ৯/৬০.০০

ভারতীয় থিয়েটারে উৎপল দত্ত একটি মহীরুহ। থিয়েটারের নির্দেশক, সংগঠক, অভিনেতা, পত্রিকা সম্পাদক তথা লেখক হিসাবে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। কেবল নাট্যকার হিসাবেই তিনি এক মাইলস্টোন। শেক্সপিয়রের নাটক, মার্কসবাদী দর্শন আর থিয়েটারে জনসাধারণের ভূমিকা তাঁকে সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ করে তুলেছিল। পথনাটকের প্রয়োগে-প্রসারে তিনি এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বইটি উৎপল দত্তকে নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন। লিখেছেন আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের এক প্রধান নেপথ্যকর্মী, নাট্যপত্রিকার যোগ্যতম সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা। বইটির দু'টি মূল্যবান প্রবন্ধ উৎপল দত্তের আত্মজীবনীর ভূমিকা এবং সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। তবে উৎপল দত্তের মতো বড় মাপের স্রষ্টাকে নিয়ে এত ছোটমাপের বইয়ে মন ভরে না। নৃপেন্দ্র সাহাকে অনুরোধ বইটির একটি পরিবর্ধিত



সংস্করণ প্রকাশ করুন। একটি বড় মাপের গ্রন্থে উৎপল প্রতিভার আরও অনেক দিক বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

**সংসৃতি (৩য় বার্ষিকী সংখ্যা, আগস্ট ২০০০) — সঃ দেবেশ চট্টোপাধ্যায়**/কার্যনির্বাহী সঃ আশিস গোস্বামী, লেকটাউন, কলকাতা-৪৮/১৩০.০০

এই সংখ্যার আলোচ্য বিষয় নাট্যসমালোচনার দর্পনে বাংলা থিয়েটার (১৯৪৪-৭৮)। এই প্রজন্মের নাট্যকর্মী, নাট্যবিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে ১৯৪৪-৭৮ কালপর্বের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রযোজনার ছবি তুলে ধরার অসাধারণ প্রয়াস। তৎকালে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার সংকলন। প্রতিটি নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ, নেপথ্য শিল্পীদের নাম আর চরিত্রলিপি জানতে পারা বাড়তি লাভ। এই সংকলন বাংলা থিয়েটারের এক শ্রেষ্ঠ কালপর্বের ইতিহাসকে বিধৃত করেছে। সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক সাধুবাদযোগ্য।

**অনুষ্টুপ (নাট্য বিষয়ক সংখ্যা — ২) ২০০১**
অতিথি সম্পাদক — কুন্তল মুখোপাধ্যায় ও সুশীল সাহা
কলকাতা - ৯/১০০.০০

বিশেষ বিষয় কেন্দ্রিক সংখ্যা প্রকাশ করে কয়েকটি পত্রিকা বেশ নাম করেছে। ২০০০-এর কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছিল অনুষ্টুপের নাট্য বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা — ১। ২০০১ এর বইমেলায় প্রকাশ পেয়েছে নাট্যবিষয়ক সংখ্যা — ২। ১ম সংখ্যার মতোই জরুরি। এ পার বাংলা ও পার বাংলার গুণী নাট্যবিদ, নির্দেশক-অভিনেতাদের লেখায় — সাক্ষাৎকারে — সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনায় ঋদ্ধ এক সংগ্রহযোগ্য সংকলন। এমন সংখ্যা সম্পাদনায়, পরিকল্পিত লেখা/সাক্ষাৎকার সংগ্রহে নির্বাহী সম্পাদকদের বিরাট দায়িত্বের বোঝা বইতে আর টেনশন পোহাতে হয়েছে সন্দেহ নেই। তাপস সেন এবং মনোজ মিত্রের দু'টি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার বহু কৌতূহলের নিরসন করেছে। গবেষণাধর্মী তিনটি প্রবন্ধ মনোযোগের দাবিদার — বাংলা থিয়েটারের গঠনপর্বে যাত্রার ভূমিকা, আধুনিক থিয়েটারে লোকনাট্যের প্রয়োগ এবং তিনদশকের একাংক নাটক। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে নাট্যদলগুলির জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান ১৯৬৭-৭৭ এক বড় মাপের কাজ। কমল সাহা সংকলিত 'থিয়েটারের ডায়েরি ১৯৬১-২০০০' এবং ঋতবান ঘটকের 'কোমলগান্ধার-ঋত্বিক, জীবন, সঙ্গীত, নাটক' অনুষ্টুপের এই সংকলনের সম্পদ।

মে.মু.

### বিবিধ

**আমার খুব জ্বর — বাসুদেব দেব** / কালপ্রতিমা প্রকাশন, কলকাতা — ৫৩/৪০.০০

সতেরোটি ছোটগল্পের সংকলন বাসুদেব দেব-এর 'আমার খুব জ্বর'। গল্পগুলির সার কথা উৎসর্গপত্রেই উল্লেখ করেছেন লেখক। তাঁর 'গল্প খুঁজে বেড়ায় এমন এক মানুষকে, যে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। মানবিক মূল্যবোধের খরা যখন বাইরে, তখনও সে শুনতে পায় মেঘের ডাক।' এই 'অন্যরকম' মানুষটিই ঘুরে ফিরে আসে বুনো হাঁস, স্বর্ণচাঁপা, কাকতাড়ুয়া, তিমিরপুরুষ, গন্ধরাজের লড়াই প্রভৃতি গল্পে। বইটির ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ সুন্দর, শোভন।

**জনতা জংশন — সুশীল সিংহ**/উত্তরাধিকার, কল্যাণগ্রাম, বর্ধমান/৪০.০০

সুশীল সিংহের 'জনতা জংশন' আটটি গল্পের সংকলন। নানা স্বাদের গল্পগুলি পাঠককে তৃপ্ত করবে, ভাবাবে। বিষয়, কাহিনি ভাষা ও আঙ্গিকের বৈচিত্রে ঋদ্ধ গল্পগুলি বর্তমান ব্যক্তিমানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। সংকলনের প্রথম দু'টি গল্প জনগণ এবং জনতাজংশন-এ শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামিকে নগ্নভাবে দেখিয়েছেন গল্পকার।

**সুতোয় বাঁধা ঘোড়া — প্রদীপ মিত্র**/ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা - ৯/৪০.০০

'গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের পারিবারিক জীবনের তুলনায় তার সামাজিক জীবনের দিকে চোখ রাখা হয়েছে বেশি' নিবেদনে একথা জানিয়েছেন 'সুতোয় বাঁধা ঘোড়া'র লেখক প্রদীপ মিত্র। গল্পসংকলনের কুড়িটি গল্প লেখকের এই বক্তব্যকেই প্রমাণ করে। মূলত ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ৯০-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অধিকাংশ গল্পে লেখা হলেও, 'বন্ধু হাসছেন' গল্পটির রচনাকাল '৯৮ এর আগস্ট। রাষ্ট্র আর রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠকেরা গল্পটির নাম শুনেই বুঝবেন কেবল সামাজিক নয় শ্রীমিত্র রাজনৈতিক গল্পও লিখেছেন এ বইয়ে। তবে সুতোয় বাঁধা ঘোড়া, চোরকাঁটা, অভিমন্যু প্রভৃতি সামাজিক বিশ্বাস সংস্কারের মতো গল্পের সংখ্যাই বেশি।

**আহুর মাজদা — জীবন সাহা/পরিবেশক** — সুবর্ণরেখা, কলকাতা — ৯/৩৫.০০

গল্পই চিনিয়ে দেবে গল্পকারকে 'আহুর মাজদা'র লেখক জীবন সাহা'র বিশ্বাস বোধহয় তাই। গল্পগ্রন্থটিতে সে জন্যই হয়ত 'ভূমিকা' বা 'নিবেদন' এবম্বিধ বাহুল্য বিবেচনায় বর্জিত হয়েছে। তবে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ১২টি গল্পের মাধ্যমে পাঠক নিঃসন্দেহে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠবেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে নিঃসন্দেহে বৈচিত্রের পরিচয় রয়েছে। 'দুদু মিঁয়ার ঘোড়া বিষয়ক আত্মদর্শন' বা 'আমি খুড়োর গাধা'-র গল্প বলার ঢং এবং বিষয় আমূল পাল্টে যায় 'মরণোত্তর' গল্পে। ডংকা মরেছে, আহুর মাজদা বা ধানের বুকে বিষ প্রাপ্তি — প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠকদের ভাবাবে।

**সূর্যোদয়ের গান — জুলিয়াস ফুচিক। অনুবাদ — আনন্দময়ী মজুমদার** / জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ/৬০.০০।

নাজি জল্লাদের উল্লাসমঞ্চে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহরে বসে জুলিয়াস ফুচিক লিখেছিলেন 'নোটস্ ফ্রম দি গ্যালোজ'। পঞ্চাশের দশকে এ বঙ্গে তার বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছিল 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' নাম দিয়ে। অধুনা দুষ্প্রাপ্য সে বই। সম্প্রতি আনন্দময়ী মজুমদার ফুচিকের

সেই অবিস্মরণীয় লেখাটিকে আবার অনুবাদ করেছেন 'সূর্যোদয়ের গান' নামে। এই বইয়েও স্যামুয়েল সিলেন ও অগাস্তিনা ফুচিকের নোটগুলিকে রাখা হয়েছে। তবে পূর্বে প্রকাশিত বইটিতে প্রিয়জনের উদ্দেশে লিখিত ফুচিকের চিঠিগুলি আলোচ্য বই-এ নেই। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ, ছাপা, বাঁধাইও ভাল। ফুচিকের আলোকচিত্রটি অবশ্যই উপরি-পাওনা।

**শিশু আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ — সাইফ চৌধুরী /**
টাচ্ এন্ড প্রিন্ট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ/ ৫০.০০

জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন 'শাপলা কুঁড়ির আসর'- এর তরুণ সম্পাদক সাইফ চৌধুরী তার এই গবেষণায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন শিশুশ্রম এবং তার দূরীকরণের কিছু সম্ভাব্য প্রচেষ্টার ওপর (অধ্যায় ৩ ও ৪)। শিশু অধিকার সনদ (১৯৫৯)-এ শিশুদের অধিকার (অধ্যায় ১) জারি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের ৫৪ শতাংশই সস্তা মজুরির শিশুশ্রমিক এবং পতিতালয়ের একটি বড় অংশ নাবালিকারা (অধ্যায় ২ ও ৫) — এর মূল কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার দূরীকরণের জন্য লেখক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাংবিধানিক অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার বাস্তবায়নে গাফিলতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন (অধ্যায় ৬) 'শিশুর বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠার জন্য পরিপূর্ণ খাবার, উপযুক্ত আহার, নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, উজ্জ্বল আলোই যথেষ্ট নয়, আরও কিছু চাই — আদর, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং সুস্থ বিনোদন' (অধ্যায় ৭)। 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' — সুকান্তর ভাষায় শেষ অধ্যায়ে শিশু অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য পাঠকপাঠিকাদের কাছে অনেক আশা নিয়ে লেখকের এই অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই পর্যবেক্ষণ হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা তৃতীয় বিশ্বের তাবৎ দেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। প্রতিবেশী দেশের এই বাস্তবতা একই ভাবে সত্য আমাদের দেশও। লেখকের অঙ্গীকার আশা করা যায়, এ দেশের সচেতন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করবে।

**সাজি — পুষ্প দত্ত/** কবয়ঃ কলকাতা - ৯/৩০.০০

নানাবিধ সামাজিক কল্যাণকর্মের সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী পুষ্প দত্তর রয়েছে একটি কবি-মন। সাংসারিক-সামাজিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই মনটিকে বাঁচিয়ে রেখে যখনই ফুরসত পেয়েছেন কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতাগুলি এবার প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থাকারে। বিধাননগরে এক মনোরম অনুষ্ঠানে কবিতার বইটি উন্মোচন করেছেন অগ্রগণ্য প্রবীণ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বইটির একটি সংক্ষিপ্ত চমৎকার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথা দিয়েই আমরা বইটির কবিতাগুলি পড়বার ও বুঝবার প্রয়াস করলে উপকৃত হব। তিনি বলেছেন, 'তাঁর ভাবনাকে খুব সহজেই তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন। ভাবনার বিষয় তাঁর চারপাশের জগৎ, তার মানুষজন ও নিসর্গপ্রকৃতি। মূলত তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। এই যে বিষয়, পাঠক একে সহজেই শনাক্ত করতে পারেন। পাঠককে কোনও বাঁধায় পড়তে হয় না। শ্রীমতী পুষ্প দত্ত সংবেদনশীল কবি। একদিকে যেমন মানবজীবনের আনন্দ ও যন্ত্রণা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছবি ফুটেছে তাঁর কবিতায়, অন্যদিকে তেমন নিসর্গ প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যও সেখানে চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে। খুব সহজেই এই কবিতাগুচ্ছ তাই পাঠকের আগ্রহ আকর্ষণ করে। ... তিনি উঁচু গলায় কথা বলতে ভালবাসেন না। কবি হিসেবে তাঁর কণ্ঠস্বর নম্র, শান্ত। অথচ তিনি যা বলেন, তা স্পষ্ট করেই বলেন।'

জটিল ভঙ্গি, কথার মারপ্যাঁচ এড়িয়ে তিনি সহজসরলভাবে তাঁর অন্তরকে প্রকাশ করেছেন কবিতায়। তথাকথিত আধুনিক হতে চাননি। তাঁর কবিতার বিভিন্ন পঙক্তিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের লিরিকের ভাষার স্পর্শ রয়েছে। এ ছাড়া ছড়ার ছাঁদও তিনি আশ্রয় করেছেন। কিছু উচ্চারণ মনে রাখার মতো। যেমন — 'যখন রব না আমি/ তোমাদের পাশে,/ তখন আমাকে পাবে সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে।' কিংবা 'ও চোখ, স্তব্ধ বিস্ময়ে পড়ি/ নীরব প্রকৃতির সবুজের/ ভাষা।/ হে হৃদয়, নিঃশব্দে অনুভব কর/ মৌন পৃথিবীর অপার/ ভালবাসা।' তিনি আরও কবিতা লিখুন। তাঁর কবিমন যেন চির সজীব থাকে এই কামনা।

**নাট্যসমালোচনা**

# কয়েকটি সাম্প্রতিক নাট্য

## মেঘ মুখোপাধ্যায়

রঙ্গনায় যৌথ প্রয়াস

আজ থেকে একতিরিশ বছর আগে উত্তর কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় 'রঙ্গনা' রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নান্দীকার এই মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয় চালু করে। সত্তরের দশকে নান্দীকার তথা বাংলার থিয়েটারের অনেকগুলি স্মরণীয় নাট্যপ্রযোজনা আমরা পেয়েছিলাম রঙ্গনা মঞ্চে। ১৪০৮-এর শারদোৎসবের সপ্তমী থেকে সেই রঙ্গনায় শুরু হল বাঙালির থিয়েটারের এক নতুন অধ্যায়। এই উদ্যোগ সার্থক হবে কি না জানতে কিছু দিন লাগবে কিন্তু যাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সৎ অভিপ্রায় আর সাহসকে নাট্যপ্রেমী বাঙালির পক্ষ থেকে অভিবাদন না জানিয়ে পারা যায় না। গ্রুপ থিয়েটারের তিন প্রসিদ্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব রঙ্গনার তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতায় উত্তর কলকাতার বনেদি থিয়েটারের পীঠস্থানে ভাল থিয়েটার চর্চার ধারাটিকে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁরা আজ ' কেন এই উদ্যোগ' নিলেন, তাঁদের ভাষাতেই জানা যাক —

> "আমরা সকলেই জানি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়, তথা হাতিবাগান থিয়েটার পাড়ার অবস্থা শোচনীয়। যে থিয়েটারে, যে পাড়ায় একদা দর্শকের ঢল নামত আজ তা জনমানবহীন। অধিকাংশ থিয়েটারই বন্ধ। সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অবস্থার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। সেই কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি এই থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবনের দায়ও আমরা অস্বীকার করতে পারি না।
>
> এই ভাবনা থেকে তিনটি নাট্য দল — সুন্দরম, সায়ক ও অন্য থিয়েটার তথা তাদের পরিচালকবৃন্দ বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, মেঘনাদ ভট্টাচার্য একটি সমবায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন রঙ্গনার গণেশ মুখোপাধ্যায়ের সার্বিক সহায়তায়। একদা এল টি জি-র মিনার্ভায় এবং রঙ্গনায় নান্দীকারের কর্মপদ্ধতি এবং প্রযোজনাগুলির সাফল্যের কথা স্মরণে রেখে এই তিনটি নাট্য দল নিয়মিতভাবে রঙ্গনা থিয়েটারে তাদের প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে চলেছেন আগামী পুজো থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনে। আমরা বিশ্বাস করি যদি এই উদ্যোগে আমরা অসফল হই তাতে লজ্জা নেই, কিন্তু সফল হলে সার্বিক ভাবে বাংলা থিয়েটারের লাভই হবে। যদি কোনও ভাবে হাতিবাগান থিয়েটার পাড়ায় দর্শকের প্রবাহ আনা সম্ভব হয়, তবে বন্ধ থিয়েটারগুলোয় যেমন নতুন ভাবে কাজের প্রেরণা পাবেন তেমনই রঙ্গনা থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটারের আর একটি প্রদর্শন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে সেই সত্তর দশকের গোড়ার দিকের মত। আপাতত আগামী কয়েক মাসের জন্য এই তিনটি দল তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটক, 'দায়বদ্ধ', 'নাকছবিটা', 'মুনি ও সাত চৌকিদার' মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি একটি যৌথ প্রযোজনাও ভবিষ্যতে এই মঞ্চে মঞ্চস্থ করার ভাবনা ইতিমধ্যেই নিয়েছেন — যে যৌথ প্রযোজনায় কেবল তিনটি দল নয়, অন্যান্য দলের নানান অভিনেতা অভিনেত্রীকে যুক্ত করা সম্ভব হবে।...."

বাঙালি থিয়েটার পাগল জাত। অভিনয়কলার প্রতি তার দুরন্ত টান। সে অভিনয় দেখতে, অভিনয় করতে ভালবাসে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবি-লেখক ছিলেন নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা। আজ টিভিতে অনেকগুলো বাংলা চ্যানেল চলছে। সেগুলিতে সারাদিন ব্যাপী অগুন্তি সিরিয়াল, টেলিফিল্মের স্রোত বয়ে চলেছে। কালের নিজের নিয়মে তা চলুক, কিন্তু অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে চোখের সামনের মঞ্চে জীবন্ত নটনটীদের চলেফিরে বেড়াতে, বাঙ্ময় হয়ে উঠতে দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। তার সঙ্গে অন্য কোনও মাধ্যমের অপ্রত্যক্ষ অভিনয় দেখার তুলনা চলে না। তাই তো দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চে উঠে অভিনয় প্রদর্শনে এত আনন্দ পেতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো দুর্ধর্ষ চলচ্চিত্রাভিনেতাকে থিয়েটার করার কথা বলতে এত উৎসাহিত হতে দেখি। সুস্থ সৎ থিয়েটার চর্চার সমস্ত উদ্যোগের পিছনে তিনি রয়েছেন। রঙ্গনার উদ্যোগে তাঁদের পাশে আরও অসংখ্য নাট্যমোদী মানুষ এসে দাঁড়ান, সন্ধেবেলায় টিভির ঘর থেকে আলস্য কাটিয়ে কষ্ট করে বেরিয়ে আসুন রঙ্গমঞ্চের টানে, টিকিট কেটে ভাল থিয়েটার দেখতে ভিড় জমান, এই আমাদের কামনা।

এখানে রঙ্গনায় অভিনীত বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশিত অন্য থিয়েটারের 'নাকছাবিটা' প্রসঙ্গে কিছু বলা হল। 'দায়বদ্ধ' পুরনো প্রযোজনা, বহু আলোচিত। পরে সুন্দরমের প্রযোজনাটি বিষয়ে লেখার ইচ্ছে রইল।

## অন্য থিয়েটার-এর নাকছাবিটা

বিভাস চক্রবর্তী তাঁর নাট্যজীবনের একচল্লিশতম বর্ষে বাংলা থিয়েটারকে পরালেন 'নাকছাবিটা'। রঙ্গনায় সমবেত প্রয়াসে তাঁর নির্দেশিত নাটকটি লিখেছেন মনোজ মিত্র। (লক্ষণীয়, সাম্প্রতিক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে মনোজ মিত্র লিখিত চারটি নাটক একই সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন দলের প্রযোজনায়।)

মনোজ মিত্রের নাটকের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁর এ নাটকটিতেও রয়েছে। তাঁর নাটকে একটা জমজমাট কাহিনি থাকে। নাটকের বয়নে তিনি কোনও ধরনের কারিকুরি, অপ্রচলিত রীতি বা তথাকথিত আধুনিকতা আমদানি পছন্দ করেন না। রীতির অভিনবত্ব সৃজনের চেষ্টা করেন না বলে তাঁর নাটকে জীবনের একটি সহজ সাবলীল স্পন্দন পাওয়া যায় যা তাঁর নাটকের দর্শক-পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁর নাটকের চাল বা প্রকাশরীতি সহজ, তাতে দর্শককে অহেতুক চমক দেবার স্পৃহা নেই কিন্তু তা বলে তাঁর চরিত্রগুলি বা ঘটনাসংস্থাপন সরল নয়। আধুনিক জীবনের জটিলতার মধ্যেই তাঁর নাটক গড়ে ওঠে। চরিত্রগুলিও যুগের জটিলতায় আক্রান্ত, আলোড়িত। কিন্তু সমস্ত কিছুই একটা নিটোল, আকর্ষণীয় কাহিনির বাঁধুনিতে বাঁধা থাকে। একটা আকর্ষণীয় কাহিনি দিয়ে, যেখানে পরতের পর পরতে জীবনের অজানা দিক উন্মোচিত হয় কিংবা বলা যায় একটা রহস্য উন্মোচিত হয়ে নতুন রহস্যের সামনে এসে পড়ি আমরা, তিনি বাজি মাত করেন। ভাল করে গুছিয়ে একটা মানুষের বা মানুষীর বা পরিবারের কাহিনি (তথা সংকটের কাহিনি) বলতে পারা, দর্শক-শ্রোতাকে কৌতূহলী করে রেখে গল্পটা শোনাতে পারা, সহজভাবে শোনাতে শোনাতে জীবনের অনেক অসহজ গূঢ় দিক উন্মোচিত করে দেওয়া, জীবনের অতল রহস্যের সন্ধান দেওয়া — এ বড় সহজ কাজ নয়। এডগার অ্যালেন পো, মঁপাসা, চেকভ, গোর্কি, ইবসেন এরকম পারতেন। মনোজ মিত্র পারেন। তাঁর সব নাটকের বেলাতেই হয়ত চেকভ কি ইবসেনের সেই গভীরতা তিনি স্পর্শ করতে পারেন না — কিন্তু তাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। মনে রাখতে হবে নাট্যকার হিসাবে তাঁর কাছে বড় বড় নির্দেশকের বা দলের দাবির ভার কম নয়।

আর তাঁর নাটকের শেষ দিকে থাকে একটা অপ্রত্যাশিত মোচড়। একটা বিস্ময় জাগানো ব্যাপার। সহজ জীবনধারার মধ্যেই একটা গোপন কিছুর বেরিয়ে আসা। ক্লাসিক ছোটগল্পের মতো।

'নাকছাবিটা'-য় এ বিস্ময় রয়েছে। বিভাস চক্রবর্তীর প্রয়োগনৈপুণ্য নাটকটির রহস্য ও বিস্ময়ের সমীপে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

মোহনপুর গ্রামে বয়ে চলা জীবনধারার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ি। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেশ্বরের বাযট্টি বছর বয়সী মেয়ে জানকী অনেক বছর বাদে তাদের গ্রাম মোহনপুরে ফিরে এসেছে তার ছোটমাসি তথা বিধবা মায়ের ডাকে। প্রৌঢ়া ফিরে এসে ফিরে পায় তার কৈশোরকে। নুকু নামের সেই মেয়েটি বাবার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য হাওয়া বদলাতে এক নিস্তরঙ্গ গ্রামে এসে দিনে দিনে কীরকম জটিল ঘটনাধারার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল — এ হল তার নাটক, কিন্তু একটি পনেরো বছরের মেয়ের জীবনের সঙ্গে সদ্য স্বাধীন দেশের চিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে দেওয়ার ফলে নাটকটি একটি বৃহৎ মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। নুকুর সঙ্গে তাঁর সংমা তথা ছোটমাসির তির্যক সম্পর্কও বেশ উপভোগ্য। নুকু দেখে স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচনে দাঁড়াতে চাওয়া তার ক্ষমতালিপ্সু ধূরন্ধর ঠাকুরদাকে, সুযোগসন্ধানী মাতাল কাকাকে, যারা নির্বাচনে জেতার জন্য একদা পরিত্যক্ত তার স্বাধীনতাসংগ্রামী প্রচারবিমুখ নির্জনতাকামী পিতার সাহায্য নিতে মরিয়া। একটা নিষ্পাপ কিশোরী দেশের নির্বাচনের জটিলতার-কলুষতার-ভণ্ডামির জগতে ঢুকে পড়ে দিশাহারা হয়ে যায়। আর একদিকে রয়েছে হঠাৎ তার জীবনে এসে পড়া দুই তরুণের ভালবাসায় তার হৃদয়ের টানাপোড়েন। এই সবের মধ্যে কোমলমতি কন্যাটি জটিল হতে শেখে।

প্রৌঢ়া জানকী আর কিশোরী নুকুর চরিত্র দুটিকে নির্দেশক যেভাবে রূপ দিয়েছেন তা অবাক হয়ে দেখার মতো। বর্তমান থেকে অতীতে আর অতীত থেকে বর্তমানে জানকী-নুকুর আসাযাওয়া, মোহনপুরের গল্পটা গেঁথে চলা, মঞ্চে এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। নাটকটার প্রতি দর্শকের কৌতূহল উসকে তোলে। চলচ্চিত্রে যেটা বেশ সহজেই করা যায় মাধ্যমের প্রকৌশলগত সুবিধার সুবাদে, এখানে মঞ্চে নির্দেশক সেটা যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তা অনবদ্য। প্রথম দৃশ্যে প্রৌঢ়া জানকীর স্মৃতির খেই ধরে কুয়োতলার পিছন থেকে হঠাৎ নুকুর বেরিয়ে আসা, জানকীর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকা আর ধীরে ধীরে উঠোনে নেমে এসে দাঁড়ানো — এক স্মরণীয় কাব্যময় নাট্যমুহূর্ত। এই মুহূর্তটিকে ঘনীভূত করে তুলেছে নিপুণ আলোকপরিকল্পনা। কিশোরীটি তার প্রৌঢ়ত্বের কাছে এসে দাঁড়াল — তারপর দু'জন অসমবয়সী অথচ একই নারীসত্তা গল্পটা গেঁথে তুলতে লাগল। কখনও প্রৌঢ় জানকীই কিশোরীর ভূমিকায় 'অভিনয়' করছেন, এখন আর নুকুকে মঞ্চে আসতে হচ্ছে না। চঞ্চল প্রাণবন্ত কিশোরীর শরীরের তেজে, খলবল করা গলায়, প্রৌঢ়া জানকী তার অতীতকে বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন — এই দৃশ্যগুলির নাট্য অভিঘাত হয়েছে চমৎকার।

জানকীর ভূমিকায় কৃষ্ণা দত্ত এবং নুকুর ভূমিকায় সুস্মিতা



হাটি অনেককাল মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। নুকুর ছোটমাসির ভূমিকায় ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ও অভিনয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। নাটকের অনেকটা ঈশিতার অভিনয়ের উজ্জ্বলতায় জমে ওঠে। অতীতের চটুল, বাচাল তরুণী ছোটমাসির বদলে বর্তমানের বৃদ্ধার শিথিল চরিত্রে রূপদান তাঁর অভিনয়প্রতিভার উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। নুকুর মাতাল কাকা রূপে স্নাতক চন্দ্র আর লাজুক নীরব প্রেমিক কাব্যতীর্থ রূপে অনুপ চক্রবর্তী দর্শকমনে ছাপ ফেলতে সক্ষম হবেন। সুজিত মুখোপাধ্যায় বীরেশ্বর চরিত্রের দৃঢ় মানসিক গঠনটিকে মঞ্চে যথার্থ রূপ দিয়েছেন। তিনটি প্রধান চরিত্রের অভিনয়ের উৎকর্ষে 'নাকছাবিটা' উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

মঞ্চসজ্জায় উঁচু কুয়োতলাটি সমগ্র নাটকটিতে এক মাত্রা যোজনা করেছে। কুয়োতলায় উঠে, নেমে বা তার চারপাশে ঘুরে চরিত্রগুলির অভিনয় দেখতে বেশ লাগে কিংবা কুয়োতলাটি অতিক্রম করে জঙ্গলের দিকে হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে থেকে কাব্যতীর্থের মৃত্যু আর তারপর তান্ত্রিকের আগমন, কুয়োয় নেমে লাশ তোলা ইত্যাদি অতিনাটকীয় মনে হয়। যদিও শেষ দৃশ্যের মোচড়টুকুর জন্য আগের এই দৃশ্যের অবতারণা করে নাট্যার প্রয়োজন ছিল বলে পরে বোঝা যায়। তবুও মনে হয় কাব্যতীর্থের মৃত্যুদৃশ্যটি আর তান্ত্রিকের হঠাৎ এসে পড়ে লাফঝাঁপমন্ত্রতন্ত্র কিয়দংশে স্থূল হয়ে পড়েছে। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন আলোয় তাপস সেন, মঞ্চ নির্মাণে সঞ্চয়ন ঘোষ এবং সঙ্গীতে চন্দন রায়চৌধুরী।

নুকুকে কাব্যতীর্থের নাকছাবি উপহার দিয়ে বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি এক টুকরো সঙ্গীতের মতো মর্ম স্পর্শ করে যায়। মনোজ মিত্রের নাটকের বিভিন্ন খনে ছড়ানো কবিতাকে বিভাস চক্রবর্তী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাট্যকার নির্বাচনী ব্যবস্থার, ভোট কেনার বা ছলেবলে ভোট করানোর কলুষিত দিকগুলি নিয়ে কখনও তির্যক বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তাঁর চরিত্রদের মধ্যবর্তিতায় — তা রাজনীতিবিদরা কীভাবে নেবেন জানি না, তবে দর্শকরা রসিয়ে উপভোগ করেছেন। এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো 'এডুকেশন — হেলথ — ক্রিমেশন' শব্দত্রয় ইঙ্গিত পূর্ণ। নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোভাব, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য — এ নাট্যে উদঘাটিত হয়েছে — 'স্বাধীন দেশে যেটা মোটেই গর্বের ব্যাপার নয়। কাব্যিক নাটকটি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে গেছে।

## থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর পোকা

যে-গল্পটি পড়ে একদিন মার্কেজ প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিলেন, সাহিত্যের অসীম ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে নিজেও মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে লেখক হতে হবে, কাফকার সেই দুনিয়া কাঁপানো গল্প মেটামরফোসিস বা রূপান্তর অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

জলজ্যান্ত এক যুবক সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখল যে সে একটা আস্ত গোবুরেপোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে কোনও মানে কর, ধরে নেওয়া বা কবিকল্পনার ব্যাপার নেই — একটা মানুষ সত্যিকারের একটা বীভৎস পোকায় পরিণত হয়ে গেছে। রাবণের দশমুণ্ড, বিশহাতের মতোই চাক্ষুষ করার যোগ্য বিকট এক ব্যাপার। গল্পের প্রথম লাইনটাই তো সাংঘাতিক। কাফকার আগের কোনও লেখক, এই লাইনটা লেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত, কোনও কালে ভাবেননি যে তাঁদেরই সংসারের কেউ এমন একটা লাইন লিখবে, লিখে ফেলবে এমন অত্যদ্ভুত এক গল্প। মানুষের পোকায় রূপান্তরের মধ্যে কোনও 'মতো, 'যেমন' এর ব্যাপার থাকবে না। পোকা মানে বাস্তবিকই এক পোকা। প্রথমে সবাইকে শিহরণ বা আতংক জাগানো আর পরে, শেষের দিকে করুণাউদ্রেককারী। শোচনীয় এই মানুষ-পোকার কাহিনি কাফকার পূর্বযুগে তবে আর কোনও লেখক তাঁদের কল্পনায় স্থান দেননি?

আসলে একটা বিশেষ যুগ, সমাজ-সভ্যতার এক সন্ধিক্ষণ কোনও প্রতিভাবান লেখক-শিল্পীকে দিয়ে এমন অনন্যসাধারণ রচনা সৃষ্টি করিয়ে নেয়। বিশেষ সময়ের গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় এমন অভাবিত পূর্ব কোনও কাব্য-কাহিনী-নাটক-সঙ্গীত। মেটামরফোসিস লেখা হবার পর থেকে কয়েক যুগ অতীত হল। কিন্তু এখনও এর আলোড়ন চলছে। গল্পটি নিয়ে সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে নানা দেশের সাহিত্য ও সমাজের বিশেষজ্ঞব্যক্তি নানাভাবে ভেবেছেন। কত রকমের বিশ্লেষণ করেছেন, কত ধরনের নিহিতার্থের খোঁজ পেয়েছেন, প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ শিল্পরসিক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর

মনেও গল্পটি নিশ্চয় এমন তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল যাতে তিনি তাঁর প্রখর ব্যস্ততার মধ্যেও এটিকে নিয়ে একটি নাটক লেখার ফুরসত করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তার নাম দিয়েছেন 'পোকা'। এ-বছর নাটকটির অভিনয় হচ্ছে থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। নাট্যকার রূপে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পরিচিতি প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ও অশোক মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা আমরা জানি। বুদ্ধদেবের রাজনৈতিক জীবনের এক জটিল সময়ে লেখা তাঁর প্রথম নাটক 'দুঃসময়' এঁরাই মঞ্চায়িত করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে একটা সাড়া জাগিয়েছিলেন গত দশকের প্রথম দিকে।

কাফকার গল্পের মেগর সামসা বুদ্ধদেবের নাটকে নাম নিয়েছে গৌরব সরকার। সকাল থেকে রাত অব্দি রুজিরোজগারের ধান্দায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। সংসারটাকে সচল রাখার দায়িত্ব তার ওপর। সংসারের সে আশাভরসা। তাকে দেখলে টের পাওয়া যায় সংসারের ঘানি টানা কাকে বলে। অবকাশ বলে তার জীবনে কোনও বস্তু নেই। সে বিশ্রাম নিতে জানে না। শুধু কাজ আর কাজ। খালি ব্যস্ততা। নিজের জন্য তার কোনও সময় নেই। এমনকী পরিবারের লোকদের সঙ্গে খোশ গল্প করার ফুরসতও তার জোটে না। বাবা, মা, ছোটবোন — সবাই ধরে নিয়েছে ছেলেটা শুধু খেটে যাবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাবে আর রাত্রে শ্রান্তক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে, চাট্টি মুখে দিয়ে চটপট শুয়ে পড়বে পরদিন ভোরে ওঠার জন্য। এই-ই হল এক যুবকের জীবন। ট্রেনের টাইম টেবিল ছাড়া সারাদিন সে কিছু পড়ার সুযোগ পায় না।

এক অমানবিক সমাজব্যবস্থার শিকার এই যুবক। যেখানে জীবিকা তার জীবনটাকে বরবাদ করে দেয়। এক রাতে কর্মক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গৌরব তার শরীরে এক অস্বাভাবিক গোলযোগ টের পেল। সে এমন অসুস্থ বোধ করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত খেতে পারল না। তার মা-বোন তাকে অর্ধভুক্ত খাবার থালা থেকে তুলে কোনওমতে তার বিছানায় শুইয়ে দেয় — যদি ঘুমুলে তার স্বস্তি হয়। এক রাতের মধ্যেই ওকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে কারণ ভোর হলেই আছে বেরিয়ে পড়া। কিন্তু সেই রাত্রে গৌরব তার বিছানায় রূপান্তরিত হল একটা মস্ত পোকায়। তার চিন্তা-চেতনা মানুষের রয়ে গেছে কিন্তু শরীরটা হয়েছে একটা কীটের। কীটের মতো জীবনযাপন করছিল এতদিন একটা মানুষের শরীর। এবার ঘটল উল্টো। কীটের শরীর নিয়ে একটা মানুষের মন। মনটা সেই চাকরি বজায় রাখার আকুলতায় উদ্বিগ্ন, জীবিকানির্বাহের সন্ত্রাসে বিপন্ন। তার এই দৈহিক বিকৃতি চাকরি করার প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ার ফলে যে আখেরে তাদের সংসার ভেঙে পড়বে এই চিন্তাও কীটমানুষটিকে কুরে খেতে থাকে। গৌরবের চরিত্রে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকটির ক্লান্তি, অসাড়তা, অসহায়তা এবং পোকায় রূপান্তরিত মানুষের বিপন্নতা, সন্ত্রাস রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অভিনয় দর্শকমনে যোগ্য প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে। পোকা রূপে তাঁর সজ্জা, পোকা হিসাবে চরিত্রটির নড়াচড়া, স্বরভঙ্গিমা এ-নাট্যে উপযুক্ত অভিঘাত সৃষ্টি করেছে।

বাড়ির রোজগেরে ছেলেটা জীবনের ভারে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের-টেনসনের বোঝা বইতে না পেরে একটা মস্ত পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেলে বাবা-মা-ছোটবোন প্রথমে বিস্মিত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের সহানুভূতি-সমবেদনার প্রথম পর্ব কিন্তু কেটে যায় অচিরেই। তারা বুঝতে পারে যে এ ছেলে আর কাজে বেরুবে না, টাকা রোজগার করে আনার সমস্ত যোগ্যতা এ হারিয়ে ফেলেছে ফলে তার আর কোনও উপযোগিতা নেই সংসারে। তার কোম্পানির ম্যানেজার তার খোঁজ নিতে এলে এই কঠিন সত্যটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তখনকার অসহায়তা আর আতংক আর বিমূঢ়তা যথার্থ ফুটিয়ে তুলেছেন বাবা-মা আর বোনের চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। বিশেষ করে অসহায়তার মুখে পড়ে যাওয়া বেকার বাবার কর্কশ, রুক্ষ হয়ে ওঠা আর পোকা-ছেলেকে বেধড়ক মার লাগানোর দৃশ্যটি মর্মস্পর্শী। রোজগারের যোগ্যতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এত কালের আশ্রয়স্থল পরমপ্রিয় সন্তান কীভাবে তার পরিবারের অতি প্রিয়জনদের কাছে চরম অপ্রিয় আর বিতৃষ্ণার পাত্রে পরিণত হয়ে যায় — তার অস্তিত্বই হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে ভোগান্তি — এই ভয়ংকর আর শোচনীয় অবস্থা এ নাট্যে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন নির্দেশক। আলো, ধ্বনি এবং নেপথ্য থেকে ভরাট গলায় কবিতার আবৃত্তি নাট্যমুহূর্ত সৃজনে সহায়ক হয়েছে। নাটকের শেষ ক্ষণে, পোকাটির মৃত্যু হলে, গৌরবের ঘরের দেয়ালে টাঙানো তার স্বপ্ন-কল্পনার, সুস্থ অধরা জীবনের প্রতীকস্বরূপ ছবিটির ওপর উজ্জ্বল আলো কেন্দ্রীভূত হয় — এ এক মনে রাখার মতো ব্যঞ্জনা।

বহুখাত একটি গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া আর তার অভিনয় করে দর্শককে শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রেখে দেখানো সহজ কাজ নয়। থিয়েটার ওয়ার্কশপ এ দিক দিয়ে অনেকখানি সফল। যেহেতু আমাদের চারপাশের জগৎটা বদলে যায়নি, কোনও আমূল পরিবর্তন হয়নি, এখনও যুবাদের কাছে চাকরি পাওয়া আর তা বাঁচিয়ে রাখা, সুস্থভাবে সংসার প্রতিপালন করা কাফকার সময়ের মতোই দুরূহ রয়ে গেছে — মানুষের অমানবিকীকরণের প্রক্রিয়া শেষ হয়নি, জীবিকার চাপে মানুষকে অমানায় হয়ে হয়ে থাকতে হয় আজও, তার স্বপ্ন-কল্পনার বিকাশ ব্যাহত হয় — তাই এমন নাটক লেখার আর অভিনয়ের গুরুত্ব রয়ে যায়।



## থিয়েট্রন-এর কালবেলা

অন্য ধরনের নাটক প্রযোজনা করায় থিয়েট্রনের আলাদা খ্যাতি আছে। নাটক বাছাইয়ে থিয়েট্রন তথা দলের নির্দেশক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিন্ন রুচির পরিচয় আমরা পেয়ে আসছি। নাটকের থিম এবং প্লট নির্মাণে ভিন্ন ধারার চিহ্ন তাঁদের সাম্প্রতিক নাট্য 'কালবেলা'তেও পেলাম। বের্টাল বোল্টের নাটকের অনুবাদ করেছেন সলিলবাবু নিজেই। বাংলার প্রেক্ষাপটে বা বাঙালির চরিত্রে রূপান্তরিত না করে নাটকটি তিনি ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটেই রেখেছেন। ফলে নাটকটি দেখতে অন্য রকমের আকর্ষণ জাগে।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ টমাস মুরের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক জীবনের এক সংকটকালের সামনে আমরা উপস্থিত হই এই নাটকে। তাঁকে নৈতিক সংকটে ফেলে দেন রাজা হেনরি এবং উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ ক্রমওয়েল। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাজা চান রানির সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ। রানি তাঁকে সন্তান দিতে পারেননি। তিনি অন্য এক রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বিবাহটাকেই ভিত্তিহীন-অসিদ্ধ প্রমাণ করার দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে বিবাহবিচ্ছিন্ন করার কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী টমাস মুরের ওপর। রোমের চার্চকে প্রভাবিত করে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা বের করে আনার আদেশ দেন। কিন্তু রোমের চার্চের আইনে কিছুতেই তা সম্ভব ছিল না। টমাস মুরের নৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি রাজার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা মনে করেন না। তিনি বড় করে দেখলেন নীতিকে। রাজাকে সুযুক্তি দেওয়ার প্রয়াস করলেন। আইনের শাসনকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। এমনকী রাজার ইচ্ছাতেও প্রতিষ্ঠিত আইনের পরিবর্তন অসম্ভব। রাজাও আইনের শাসনের অন্তর্ভুক্ত — এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন মুর। রাজার আদেশে, প্রলোভনে, উচ্চপদ বাঁচানোর তাড়নায় কিংবা পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বিপন্ন হয়ে পড়ার ভয়েও তিনি দমিত হলেন না। তিনি যেটাকে সত্য মনে করেছেন দৃঢ়চিত্তে তারই পক্ষ অবলম্বন করে এক গৌরবহীন কষ্টের জীবন বেছে নিলেন। পরিবার শুদ্ধু নিজে রাষ্ট্রশক্তির বিপক্ষে গিয়ে সংকটাপন্ন হলেন। তাঁর সংকট ঘনীভূত করে তুলল তাঁর সহকর্মী ক্রমওয়েল আর শিষ্যপ্রতিম রিচার্ড রিখ।

একদা রাজা ছিলেন প্রকৃতই তাঁর গুণের, অসামান্য প্রতিভার সমঝদার। রাজা তাঁকে চেয়ে করতেন। এক রাত্রে রাজা যখন মুরের প্রাসাদে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গেলেন, সেই দৃশ্যটি এ নাট্যের সম্পদ। সমগ্র নাট্যে একটি উৎকৃষ্ট কবিতার স্তবকের মতো দৃশ্যটি ঝলমলিয়ে উঠেছে। নাট্যের গতিতে এ রকম আরও কিছু স্মরণীয় দৃশ্যও মুহূর্ত সৃজিত হয়েছে এবং নাটকটি দর্শকমনের কৌতূহল বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এ নাট্যে প্রচলিত অর্থে তেমন কোনও নাট্যক্রিয়া নেই। জোরালো ঘটনা বা চমক নেই। পুরো নাটকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে টমাস মুরের মানসিক শক্তিকে অবলম্বন করে। যুক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ সংলাপ বিনিময়ের পথ বেয়ে নাটকটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সংলাপের ধার এবং ভার ক্ষয় হয়ে গিয়ে নাটকটা ধসে যাবার ভয় ছিল, দর্শকের কৌতূহল নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা ছিল — এমন মনোগত বা মনন নির্ভর নাটকে সে আশংকা নিহিত থাকে — কিন্তু তা আদৌ যে ঘটেনি তার প্রধান কারণ কয়েকজন শক্তিমান অভিনেতার যোগ্যতা। টমাস মুর, রিখ, ক্রমওয়েল এবং রাজা হেনরির ভূমিকায় যথাক্রমে কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি দাস, আশিস সেনগুপ্ত এবং সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তাঁদের অভিনয়ের উজ্জ্বলতায় এমন সংলাপনির্ভর, মানসিকস্তরের নাটক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। টমাস মুরের ভূমিকায় কৃষ্ণকিশোরের অভিনয়, অভিনয়ের নানা মাত্রাসহ, 'কালবেলা'র সম্পদ। আর একজন অভিনেতার কথা না বললেই নয়, সাধারণ মানুষ চরিত্রে কাঞ্চন দাশগুপ্ত। সূত্রধার রূপে তাঁর দাপুটে সতেজ অভিনয় নাটকটিকে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে — কী কায়িক কী বাচনভঙ্গিতে, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি শীঘ্র মধ্যেই দর্শকমণ্ডলীর প্রিয়ভাজন হয়ে যান।

রাজারাজড়াদের জগতের গুরুগম্ভীর দৃশ্যগুলিকে এই সাধারণ মানুষের প্রতিভূ তথা সূত্রধার তার সরল সরস ভঙ্গিতে গেঁথে রেখেছে। তার আচরণে সাধারণ মানুষের লোভ-লালসা-কৌতূহল ফুটে উঠেছে। বড়দের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার সুযোগে সে নিজে যতটুকু পারে কামিয়ে নিতে উদগ্রীব। যারা টমাস মুরের পতন হলে আরও ওপরে উঠতে পারবে তারা এই সাধারণ মানুষটিকে (যে মুরের বাড়ির খাস ভৃত্য) গোপন সংবাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। একটা সামান্য মানুষ বৃহৎ ঘড়যন্ত্রের অংশভাক হয়ে পড়ে দু'পয়সার ধান্দায়। একই চরিত্র বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন ছোটমাপের মানুষের ভূমিকা নেয়। এই চরিত্রটির মধ্যে নাটককি আকর্ষণীয় করে তোলার রসদ রয়েছে। কাঞ্চন দাশগুপ্ত তার উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন।

মানুষের জীবনে নীতিনিষ্ঠ থাকা বা নৈতিকতা যে কেবল বইয়ের মধ্যে আটকে রাখার, শাস্ত্রগ্রন্থে সীমাবদ্ধ থাকার কোনও ব্যাপার নয় — এটা যে প্রতিদিনকার জীবনে চর্চার-পালনের একটা বাস্তব ব্যাপার — কেবল উচ্চ কল্পলোকের আদর্শমাত্র নয় — এই জরুরি সংবাদ যথেষ্ট গভীরতায় এ নাটকে প্রতিভাত হয়েছে। নাটকটির সার্থকতা এখানেই।

এ জাতীয় নাটক দেখতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ঢল নামবে না তা নিশ্চয় গ্রুপ ও নির্দেশক জানেন। তবুও যে শক্তিমত্তা দিয়ে এই নাট্যের অভিনয় হচ্ছে তাতে দর্শকসংখ্যা অচিরে বাড়া দরকার।

## গোবরডাঙা রূপান্তর-এর শিশুনাট্য

গত বর্ষার এক গুমোট বিকালে কলকাতার অদূরের মফস্বল শহর গোবরডাঙা থেকে এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসেছিল বিজন থিয়েটারে ওদের নাটক দেখাতে। নাটকটা খুব মজার, হই হুল্লোড়ের, ছোটদের উপযোগী করে রসিয়ে লিখেছিলেন লীলা মজুমদার, নাম ঃ লংকা দহন পালা। ওই এক দল নানা বয়সের শিশু-কিশোর ছেলেমেয়েকে 'অভিনয় শিখিয়ে' কলকাতার মঞ্চে ওদের নিয়ে এসেছিল গোবরডাঙা রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠী। নামেই মালুম নাটকের বিষয়টা কী। নাটকটায় কেমন মজা থাকবে বোঝাই যায়। শিশুদের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম লীলা মজুমদারের হাতে পড়ে রামায়ণের ওই অংশটুকু কেমন নাটক হয়ে উঠেছে ওদের অভিনয় দেখে সেদিন নতুন করে উপভোগ করলাম। ছেলেমেয়েরা অভিনয় করেছে জমিয়ে, বেশ দাপটের সঙ্গে। রাবণ সীতাকে হরণ করে এনে বন্দিনি করে রেখেছে অশোককাননে। সীতাকে ঘিরে আছে ভয়ানক সব রাক্ষুসিরা। বীর হনুমান দাপিয়ে এসেছে লংকায় সীতার খোঁজে। সীতার খোঁজ নিয়ে, তাকে নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিয়ে ফিরে যেতে হবে রাম-লক্ষ্মণের কাছে। হনুর ওপর বিরাট দায়িত্বের ভার। সফল তাকে হতেই হবে। নইলে তার মানমর্যাদা থাকে না, বীরত্ব তো থাকবেই না। হনুমান হন্যে হয়ে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে বিরাট জটিল নগরে। গল্পটা সবটা বলার দরকার কী? কে না জানে তারপর কী হল! আগুন নিয়ে যারপরনাই কাণ্ড।

'রূপান্তরের' নির্দেশক প্রতাপ সেন তাঁর শিশু কুশীলবদের এমনভাবে শিখিয়ে রপ্ত করিয়েছেন যে অচেনা মঞ্চে তাদের বিশেষ জড়তা দেখলাম না। যেন মহানগরীর মঞ্চে যেখানে বড় বড় দল অভিনয় করে সেখানে নয়, তারা প্রাণের আনন্দে লংকা নগরীতেই সহজভাবে চলে ফিরে কথা বলে বেড়াচ্ছে। শিশুরা এমনিতেই যা করে তা ভাল লাগে দেখতে কিন্তু তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রূপান্তর গোষ্ঠী তাদের অভিনয় শেখানোর চেষ্টা করেছে— না হলে তো মঞ্চে নাটক না হয়ে বাড়ির উঠোনে হট্টগোল পাকানো হয়ে যেত। না, তেমন তো হয়নি। কেউ কেউ একটু চেঁচামিচি বেশি করে ফেললেও কিংবা অযথা এদিক ওদিক চলে গেলেও কিন্তু মূল চরিত্রদের চলায় বলায় একটা ছন্দ ছিল। রাবণ - রমেন মণ্ডল (১৩), সীতা - রিংকু হেলা (৯), কালনেমী - রঞ্জন মধু (১৩), লংকা দেবী - দিপীকা হেলা (১০) আর হনুমান - শুভময় পার্সি (১১) সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছে। জনে জনে সবার নাম করলাম না বলে শিশুশিল্পীরা যেন আমার ওপর রাগ না করে।

গোবরডাঙা থেকে শিশুশিল্পীদের বাগিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সংস্থার পরিচালক প্রতাপ সেন, সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী আর বহু একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রশংসিত ও পুরস্কৃত দলের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মৌসুমী রায়। তিনি কয়েকটি টিভি সিরিয়ালেও দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নিজের অভিনয়ের পাশাপাশি অবহেলিত শিশুদের সংগঠিত করে শিল্পের আঙিনায় নিয়ে আসায় শ্রীমতী রায়ের বিশেষ উৎসাহ বলে জানালেন প্রতাপ সেন। তাঁদের গ্রুপের এই শিশুশিল্পীদের নিয়ে নাটক করানোর উদ্যোগ ব্যাপারে এঁদের সঙ্গে আলাপে প্রশংসনীয় বিষয় জানা গেল। লংকা দহন পালার বাচ্চা শিল্পীরা আসলে শেয়ালদা-বনগাঁ শাখার গোবরডাঙা রেল স্টেশনের চারপাশের ঝুপড়ি-বস্তির ছেলে-মেয়ে। কোনও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলগাড়ির জানলা দিয়ে আমরা এমন ছেলেমেয়েদের হামেশাই দেখতে পাই। ওদের তাচ্ছিল্য করি। রূপান্তর এদের নিয়ে ভেবেছে। এই শিশুদের শিল্পবোধে মণ্ডিত করে রূপান্তরিত করবার বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছে।

নাট্যচর্চার ইতিহাসে উত্তর ২৪ পরগণার মফস্বল শহর গোবরডাঙার একটি স্থান রয়েছে। গোবরডাঙার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, যোগেশ চৌধুরী, মধু ও সাধনা বসু, অসিত মুখোপাধ্যায়ের মতো স্মরণীয় নাট্য ব্যক্তিত্বের নাম। এই ঐতিহ্যের উত্তরসূরি হিসাবে সেখানে কয়েকটি গ্রুপ অভিনয় করে চলেছে— তাদের অন্যতম রূপান্তর। ভাঁড়ারে ১৬টি পূর্ণাঙ্গ আর ৮টি একাংক নিয়ে উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন শহরে এরা নিয়মিত অভিনয় করে। নাট্যগোষ্ঠী হিসাবে তারা এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হয়েছে। অবহেলিত, অনাদৃত শিশুদের সংগঠিত করে, শিখিয়ে অভিনয় শিল্পের আঙিনায় নিয়ে আসা। এভাবে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করতে চাইছে তারা।

বিদ্যালয় স্তরের সিলেবাসে থিয়েটার- সঙ্গীতকে বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা চলছে, দাবি উঠেছে, তখন রূপান্তরের এই উদ্যোগ নিশ্চয় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এই শিশুদের আরও দক্ষ করে তুলে, এদের জন্য আরও সময় দিয়ে, আরও নতুন নাট্য সৃষ্টি করে রূপান্তর আবার মহানগরীর মঞ্চে আসুক এবং মহানগরী থেকেও নাট্যমোদী মানুষেরা মফস্বলে তাদের অভিনয় দেখতে যাক, সারা বাংলায় ছড়িয়ে থাকা অন্য গ্রুপগুলিও অনুরূপ উদ্যোগ নিক এই কামনা করি।

বিষয়বস্তুতে, অভিনয়ওগে, মঞ্চ, সাজসজ্জা ও আলোকসম্পাতে — এক কথায় প্রয়োগনৈপুণ্যে সংবেদী দর্শক আকর্ষণের যোগ্য একটি প্রযোজনা এই 'কালবেলা'।

স্মরণ

# মানুষ নামক অনন্ত খনির সন্ধানী : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

## শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্য একটি প্রসঙ্গে শ্যামলের চাকরি ছাড়ার গল্প আমি এই চতুরঙ্গ পত্রিকায় লিখেছিলাম কয়েক বছর আগে। সেই লেখাটি পড়ে শ্যামল জানায় যে আমার প্রতিবেদন যথার্থ নয়। তাতে ব্যক্তিবিশেষকে অকারণ অসম্মান করা হয়েছে। আসল ঘটনা হল এই বলে সে লিখিতভাবে যে ঘটনার বিবরণ দেয়, তা পড়ে উক্ত ব্যক্তিবিশেষকে পিশাচ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু বিবরণের মধ্যে কোনও ক্ষোভ ছিল না। খুব ঠাণ্ডা ভাষায় লেখা ওর সেই চিঠিও চতুরঙ্গ পত্রিকার পাঠক পড়েছেন।

এক বার আমারই বৈঠকখানায় এক সান্ধ্য আড্ডায় বসে শ্যামল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, আচ্ছা আমাকে তোমার কী মনে হয়? সম্ভবত তখন গভীর উত্তেজনার সঙ্গে পরচর্চা চলছিল। আমি বললাম, ভণ্ড। এক সেকেন্ডের মধ্যে ও আমার গালে এক থাপ্পড় মারল। আমার চশমা ছিটকে গেল তার ধাক্কায়। আমি বললাম, তুমি আমার অতিথি, কিছু বলছি না, চলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল আড্ডা। অন্য বন্ধুরা শ্যামলকে ধিক্কার দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। পরের দিন ভোর পাঁচটায়, অর্থাৎ সে রাত পোহাতে না পোহাতেই, শ্যামল সব্জীক আমার বাড়িতে হাজির। ক্ষমা চাইতে এসেছে। আমি বললাম, ক্ষমা চাওয়া তোমার কর্তব্য, তুমি করেছ, আমি কিন্তু আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি না। ও বলল, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম শরৎ, কিন্তু তার বদলে কী করে ফেললাম। ইতি খুব লজ্জিত ভাবে সেদিন বলেছিল, এক এক সময় ওর মাথার ঠিক থাকে না।

এই ঘটনার পরে আরও অনেক বার নানা অবস্থায় শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আড্ডা হয়েছে। ছেদ পড়েনি কিছুতেই। শুধু মাঝে মাঝে ও আলটপকা জানতে চাইত, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি বদলেছে? তাতেই বুঝতাম, খোঁচাটা ওকে ভাল ভাবেই বিঁধেছিল। ভণ্ড হল সে, যে ভাণ করে, যার অন্তরে আর আচরণে সঙ্গতি নেই।

আর সব মানুষকে যে তুলাদণ্ড দিয়ে মাপতে আমরা অভ্যস্ত, শ্যামলকে সেই তুলাদণ্ড দিয়ে মাপা ঠিক হবে না। শ্যামল সন্ত ছিল না, পাষণ্ডও ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল একজন নিপাট ভদ্রলোক। উনিশ শতকের বাঙালিবাবুর মতো গোলগাল ফরসা চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখে সব সময় দ্বিতীয় বন্ধনীর মতো হাসি। কিন্তু যে কোনও সময়ে একটা অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড বাধাতে ওর জুড়ি ছিল না কেউ। শক্তি (আজ সে-ও প্রয়াত, তার কিংবদন্তিগুলি রয়ে গেছে, হায়!) মাতাল হয়ে যা করত, শ্যামল ঠাণ্ডা মাথায় তা করতে পারত অনায়াসে। নর্মাল মানুষদের অভ্যাসকে ওলট-পালট করাতে ছিল ওর আনন্দ। বা, অধিকাংশ মানুষ যে-খাতে চিন্তা ভাবনা করে, ওর চিন্তাভাবনা সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। অথচ ভদ্র, মধ্যবিত্ত, মধ্যচিত্ত সমাজে বসবাস করত বলে তাদের মতো সেজে থাকত অধিকাংশ সময়। ওর অস্বাভাবিকতা বেরিয়ে পড়ত মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ। ওর অসাধারণত্ব প্রকাশিত হত ওর সমস্ত লেখায়।

'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা', এই নামে বিমল করের একটা বই আছে। তাতে তিনি শ্যামলকে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ওরফে মহাস্থবির। চারখণ্ডে মহাস্থবির জাতক আমি পড়েছি। এখনও মাঝে মাঝে পড়ি। আমার মনে হয়, শ্যামলের মধ্যে বিভূতিভূষণের কিছু গুঁড়োও ছিল, না হলে ও একখানা 'কুবেরের বিষয় আশায়' লিখেই থেমে যেত। অনেকে জানেন না, 'কুবেরের বিষয় আশায়' বইটার একটা নৌটবুক সংস্করণ 'গণেশের বিষয় আশয়' নামে কৃত্তিবাস পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তখন ওর খ্যাতি ছড়ায়নি।

তারাশঙ্করের তখন খুব নামডাক। টালা পার্কে থাকেন। লেখকদের মধ্যে একা উনিই তখন মোটরগাড়ি চড়েন। শ্যামলের বন্ধু সত্যেন, সত্যেন্দ্র আচার্য। একদিন শ্যামল তাকে বলে, চল্, তারাশঙ্কর দেখে আসি। দু'জনে গিয়ে হাজির। তারাশঙ্কর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। শ্যামল অন্তরঙ্গ গলায় বলল, 'জেঠামশাই, এ আমাদের সতু। আপনাকে দেখতে চাইছিল, তাই ওকে নিয়ে এলাম। সতু, জেঠামশাইকে প্রণাম কর।' তারাশঙ্কর স্মিতমুখে সত্যেনকে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন কিন্তু খেয়াল করেননি, অন্য ছেলেটি ওঁকে প্রণাম করল না।

এক বছর আগে শ্যামলের মাথার ভেতরে টিউমার ধরা পড়ে। এবং তখনই সেটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে আর না বাড়তে পারে। তারপর যথারীতি এক বছর ধরে ক্যানসারের চিকিৎসা চলেছে ওর ছোট মেয়ে, ডাক্তার, তার তত্ত্বাবধানে। এরই মধ্যে একদিন কাশীপুরে গিয়ে আমি আর বিজয়া শ্যামলকে

দেখে এসেছি। অনেকক্ষণ ছিলাম। ওর মেয়ে বলল, বাবা এখন সেরে গেছে। একবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার যদি কাজকর্ম শুরু করে দেয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে সে রকম ইচ্ছেই নেই। খালি ঘুমিয়ে পড়তে চায়। শ্যামল তার একখানা বই আমাদের উপহার দিল কিছু হিজিবিজি লিখে। ওকে তখন কেমন যেন শেষ বয়সের নজরুলের মতো দেখতে লাগছিল।

আমার ধারণা, ওই টিউমারের কুঁড়ি ওর মাথার মধ্যে বরাবরই ছিল। ওই কুঁড়ি প্রভাব ফেলেছে ওর চরিত্রে। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর দানার মতো ওটা করকর করত। ওই কুঁড়ির জন্যই শ্যামল আর সকলের থেকে আলাদা একজন বড় মাপের লেখক। বন্ধুবৎসল হয়েও থেকে গিয়েছিল নির্বান্ধব।

একজন বড় মাপের লেখক সব সময় মিথ্যা আর আপাতসত্য — এই দুই জঞ্জাল সরিয়ে সরিয়ে নিহিত সত্যের উন্মোচন ঘটায়। তাতে মানুষের চোখ ঝলসে যায়। তাই ছোট মাপের জনপ্রিয় লেখক কখনওই নিহিত সত্যের সন্ধান করে না। মানবজীবনের গভীরে প্রবেশ করে না। ছেলেমানুষি বাক্যালাপে পাঠকদের ভুলিয়ে রাখে। 'ওই দেখ পাখি, ওই দেখ চাঁদমামা' — শুনে পাঠক বোকার মতো আকাশের দিকে মুখ ফেরায়, বুঝতে পারে না, দুধের বাটিটা সরিয়ে ফেলা হল।

'নির্বান্ধব' নামে শ্যামলের এক অসাধারণ উপন্যাস আছে, ১৯৭২-এ প্রকাশিত। তাতে নিবারণ পাকড়াশি নামের এক চরিত্র রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে আবেগের মাথায় তার উপকারী বন্ধুর বুকে টেবল ফর্ক ঢুকিয়ে দেয়। লোকটি মারা যায়। খুনের আসামি নিবারণকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে শশধর উকিল। তাকে নিবারণ বোঝাচ্ছে, ওর চরমতম দণ্ড হওয়া উচিত। কেন? না, 'আমি যে কারও সঙ্গে মিশতে পারি না। মেশামিশির কত চেষ্টা করি। হয় না। কারও সঙ্গে আমার প্রাইভেট টক হয় না। সাইড টক হয় না। আমার কাছে আমার নিজের বা পরের কোনো গোপন কথা লুকোনো নেই। আমি কোনোদিন দল পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার চান্স পাইনি। কেউ আমাকে কোনোদিন কানে কানে কিছু বলেনি।' শশধর চেষ্টা করবে আসামিকে অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণ করতে।

পাঠক বুঝবেন, এই সব একজন নিঃসঙ্গ মানুষের আবোল তাবোল যুক্তি। তার সমস্যার কথা সে কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না কারণ তার ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়। সাধারণ মানুষ তাকে সব সময় ভুল বোঝে।

একবার 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' নামে শ্যামলের এক দুর্ধর্ষ গল্প আমি নির্বাচন করে দিয়েছিলাম ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে প্রকাশের জন্য। গল্পটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে দিল্লিবাসী অনুবাদক হিমসিম খেতে থাকে, কারণ ওতে কালবাচক ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে সঙ্গতি নেই। গল্পটি লাফিয়ে লাফিয়ে বর্তমান কাল থেকে অতীত কালে, আবার অতীত কাল থেকে ভবিষ্যতে, আবার ফিরে বর্তমানে, এমনভাবে বিচরণ করে যে ইংরেজির নিয়মকানুনে তাকে আঁটানো যাচ্ছে না। অথচ বাংলায় পড়তে আমার কোনও খটকা লাগেনি। প্রকাশিত হওয়ার পর গল্পটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। সেই পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠানে নির্বাচক হিসাবে আমিও রাষ্ট্রপতিভবনে প্রবেশের আমন্ত্রণ পাই। শ্যামল সস্ত্রীক দিল্লি গিয়েছিল। আমরা দু'জন বঙ্গভবনে থাকার জায়গা পাই। দিন তিনেক ছিলাম দিল্লিতে। একদিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে শ্যামল জানতে চাইল, ইতিকে ওর চম্পাহাটির বাড়ির একতলায় রাখবে না দোতলায় রাখবে, এই সমস্যায় আমি কোনও সাহায্য করতে পারি কি না। আমি জানতাম তখন কোনও একটি মেয়ের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার চলছে। ও দু'জনকে নিয়েই থাকবে কারণ দু'জনকেই ও সমান ভালবাসে। তা ছাড়া প্রেমিকাটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ও শ্যামলকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেবে। যা ইতি দেয়নি।

এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে আজগুবি লাগে। মনে হয়, যে বলছে সে প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু শ্যামলের কাছে এ সব ছিল খুব স্বাভাবিক। ঘটনাটির উল্লেখ করলাম কেননা এ ব্যাপার সবাই জানে। এ বিষয় নিয়ে ও নিজেও উপন্যাস লিখেছে। এবং সেই অ্যাফেয়ারের কোনও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হয়নি। প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে শ্যামল এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কখনও বাস্তব, কখনও কল্পনা, কখনও স্বপ্ন, কখনও অতীত স্মৃতিলোকে বিচরণ করেছিল।

আমি আসলে যা বলতে চাই, তা হল, শ্যামল নিজেই এক জটিল চরিত্র। তার রচিত চরিত্রগুলি আরও জটিল। অথচ বিশ্বাসযোগ্য। কারণ এখনকার সময় আর সহজ সরল মূল্যবোধ দিয়ে ঘেরা নয়।

শ্যামল বলে, লিখি এ জন্যে যে — যা লিখছি — আর কেউ তা এমন করে লিখতে পারবে না। এই বিশ্বাস থেকেই লেখা। এই বিশ্বাসটাই বলে দেয় — আমার আগে আর কেউ এমন করে বলতে পারেননি। .... পরিচিত ছক তছনছ হয়ে গেলে মানুষ কেমন হয়ে যায় তা আমার মতো কেউ আর দেখাতে পারবে না। .... আমি যে ভাবনায় ভেতরে ভেতরে আলোড়িত হচ্ছি, তা যদি অন্যের ভেতর সঞ্চারিত করতেপারি, তা হলে মনে হয় হ্যাঁ কিছু পারি। অন্য কিছুই তো পারি না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারা জীবন সাংবাদিকতাই করে গেছে। নানা সময়ে নানা কাগজে। কিন্তু কখনও ওপরের সত্যের সঙ্গে মানুষজন্মের নিহিত সত্য গুলিয়ে ফেলেনি। নিজের লেখালেখিকে পণ্য করেনি মেইনস্ট্রিমের প্রবক্তাদের কাছে। তারা বহুদিন ওকে উপেক্ষা করেছে, পাত্তা দেয়নি। ১৯৯৩ সালে ষাট বছর বয়সে অকাদেমি পুরস্কার পেল যথেষ্ট বিতর্কের পর। তারপর থেকে বহু পুরস্কার ওর ওপর বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হবে যদি কোনও সাহিত্যের ছাত্র শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে মন দিয়ে গবেষণা করেন। অনেক অমূল্য রত্ন আবিষ্কার করবেন তিনি।



# জীবন ছিল তাঁর কাছে আবিষ্কার

## কিন্নর রায়

অতিকথন বা গুজব-গুঞ্জন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে বহু প্রাচীন এক অসুখ। সেই যে গল্প ছিল না কোনও গ্রামে এক পণ্ডিতের বাড়ি সতরঞ্চির কোণে তামাক খাওয়ার মাটির কলকেতে রাখা জ্বলন্ত টিকে পড়ে গিয়ে সামান্য আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কোনও অগ্নিকাণ্ড হয়নি। অথচ খবরটি বাতাসের চেয়েও দ্রুত বেগে কানে হেঁটে হেঁটে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছয়, তখন সেই গুজবে বলা হতে থাকে, ঘরে আগুন লেগে সপরিবারে পুড়ে মরেছেন পণ্ডিতমশাই। ভস্মীভূত তাঁর ঘরবাড়ি। গ্রামের কোনও এক সাধারণজন পণ্ডিতমশাইকে দেখে 'ভূত ভূত' বলে চিৎকার করে দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান। পণ্ডিত-মশাই কিন্তু তখন সশরীরে দিব্যি বর্তমান।

আমার মা গল্পটি প্রায়ই বলতেন। গুজব কীভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে, বোঝাতে গিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের কাহিনির প্রসঙ্গ আসত। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে এমন বহু অতিকথন, গল্প, গুজব চালু আছে বাজারে। হয়ত তার কোনও কোনওটির পেছনে খুব সূক্ষ্ম হলেও শ্যামলবাবুর ভূমিকা আছে। তিনি নিজেও কখনও কখনও নিছক মজা করবার জন্য দু'একটি কথা বলেছেন বা তেমন কোনও হয়ত কাজ করেছেন। কিন্তু সেই তিলটাই তাল হয়েছে। খুব পরিকল্পনা-মাফিক তাঁর এই সব কর্মকাণ্ডকে অতিকথনের গ্যাস বেলুন হিসাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাড়া হয়েছে বাজারে। লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, হৃদয়বান-পরোপকারী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যাতে এই কুহকি-প্রচারের আড়ালে চাপা পড়ে যান, তার জন্য বহু বছর ধরেই এমন সব গল্প বাজারে চালু করা হয়েছে খুবই সংগঠিত ভাবে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কাহিনির কয়েকটি —

১। সাহাপুর মথুরা নাথ স্কুলে শিক্ষক হিসাবে পড়াতে গিয়ে একদিন নিজের গেঞ্জি ভিজে থাকায় শ্যামলবাবু মায়ের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে তার ওপর নিজের জামা পরে গিয়েছিলেন। লেট হওয়ার কারণ হিসাবে ওই স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে রোজই ভিজে গেঞ্জির কথা বলতে বলতে অবশেষে একদিন নাকি মায়ের ব্লাউজ গায়ে দিয়েই —

২। তিনি এরোপ্লেনের মেকানিক ছিলেন।

৩। আশুতোষ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আছে নানা কাহিনি, উপকাহিনি কাল্পনিক বর্ণনাও। এ নিয়ে তিনি ১৯৭৬ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছেড়ে 'যুগান্তর'-এ আসার পর রমাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত 'দেখছি শুনছি' নামে লিটল ম্যাগাজিনে কিছু লেখাপত্তরও বেরয়। সেই সব লেখা বেরনোর পর শ্যামলবাবু বিরক্ত হয়েছিলেন রমাপ্রসাদ দত্তর ওপর। কিন্তু পরে ক্ষমা করে দেন তাঁকে।

৪। সন্তোষকুমার ঘোষকে শারীরিকভাবে আহত করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাড়ার প্রসঙ্গ। এ নিয়েও বহু পল্লবিত কাহিনি আছে। আর একটি কথা, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগ পত্র দিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছেড়েছিলেন। তাঁকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেনি।

এ রকম অজস্র কাহিনি, উপকাহিনি, পল্লবিত গল্পকথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। তিনি সব সময় যে এই কাহিনি বিস্তারকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন, তা নয়। অনেক সময় হাসতে হাসতে চুপ করে থেকেছেন। ফলে অতিকথারা ডানা ছড়িয়ে টেরোড্যাকটিল হয়ে উঠেছে কখনও কখনও।

তিনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কার সঙ্গে মিশি বলো তো! অনেকেই আমায় একটি অতিকায় মজাদার মানুষ ভাবে। এদের কারওরই আমার লেখালেখি — গল্প-উপন্যাস নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই।

৪ অক্টোবর কালিঘাটের ৩৫ সতীশ মুখার্জি রোডের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে সকাল থেকে বসে বসে অনেক কথাই মনে আসছিল। এই অমিত ক্ষমতার অধিকারী কথাশিল্পীটিকে নিয়ে অনেকেই শুধু অতিকথনের নানান নকশা বুনে গেলেন। কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মহৎ সৃষ্টি, শিল্প-সাহিত্য ভাবনা, দার্শনিক চিন্তাচেতনা বাদ দিয়ে শুধুই মজাদার শ্যামল, অফুরান হাসির খোরাক জোগানো শ্যামল গাঙ্গুলি

(এই গাঙ্গুলি শব্দটি ব্যবহারে আমারও বিস্তর আপত্তি। শ্যামলবাবু নিজেও যথেষ্ট বিরক্ত হতেন এই গাঙ্গুলি ব্যবহারে), স্নেক ড্যান্স, বেলি ড্যান্স, কখক ড্যান্স করা শ্যামল তাঁর নিজের সাহিত্য সৃষ্টির ওপর পরত ফেলতে থাকেন। আর এই কাজটি আগেই বলেছি, খুবই পরিকল্পিত মিশন।

২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁকে তাঁর ৭৯ দেশপ্রাণ শাসমল রোডের বাড়ি থেকে নিজের কাছে নিয়ে গেছিলেন তাঁর ছোট মেয়ে ললিতা চট্টোপাধ্যায়। এরপর ১০ অক্টোবর তাঁর অপারেশন হয় পার্ক নার্সিং হোমে। তার আগে 'গামা'-তে ভর্তি ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। সার্জন সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় অপারেশন করে যে টিউমারটি শ্যামলবাবুর মাথা থেকে বের করেন, তা ম্যালিগন্যান্ট বলে ধরা পড়ে। এরপর বেঁচে ছিলেন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত। ২৪ সেপ্টেম্বর — সোমবার বেলা বারোটা সাত মিনিটে উত্তর কলকাতার সিঁথির মোড়ে 'সরযূ' নার্সিং হোমে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ে।

২০০০ সালে সেপ্টেম্বরে বাজার করতে গিয়ে পড়ে যান শ্যামলবাবু। তার আগে থেকেই অসুস্থতা একটু একটু করে তার উপস্থিতি জানান দিয়েছে। পায়ে জোর পান না। পা টেনে টেনে হাঁটেন। কথা মনে রাখতে পারেন না। একটু আগে কী খেয়েছেন, তাও ভুলে যান। নিজের আলজাইমার হয়েছে কিনা এমন একটা সন্দেহও ছিল তাঁর সেই সময়। তার ওপর হার্টের সমস্যা। ঠাণ্ডা ঘাম হয়। অনেকখানি শারীরিক ক্ষমতা, বিপুল মনের জোর দিয়ে তিনি আটকে রেখেছিলেন সব রকম বিপত্তি। এমনকী বিশিষ্ট কবি-চিকিৎসক ভূমেন্দ্র গুহ ওঁকে পেসমেকার বসাবার কথা বললে সেকেন্ড হ্যান্ড পেসমেকার কোথাও পাওয়া যায় কিনা, তাও সন্ধান করেছেন শ্যামলবাবু ওই রকম তীব্র অসুস্থতা নিয়ে।

আমি নিজেকে মস্ত সৌভাগ্যবান মনে করি এই ভেবে যে তাঁর সময়ে, তিনি যখন চলে ফিরে বেড়িয়েছেন এই পৃথিবীতে, ভাল ভাল লেখা লিখেছেন, সেই পৃথিবীতে আমিও ছিলাম। আমার গর্ব এটুকুই।

তাঁর ঠাকুরদা আয়ান ঘোষ সাজতেন যাত্রার দলে। বাবা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি করতেন কোর্টে। মা কিরণকুমারী দেবী ছিলেন সুন্দরী, শিল্প মনস্কা, ভাল গান গাইতে পারতেন। বই পড়তেন। ছ'ভাই এক বোনের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চতুর্থ। ছোট বোন ভাইদের কাছে তিনি মণিদা। তাঁর জন্ম ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র (১৯৩৩-এর ২৫ মার্চ) খুলনায়, এখন যা বাংলাদেশ। ওঁদের আদি বাড়ি বরিশালে। শ্যামলবাবুর দাদামশায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তিনি ছিলেন ওঁর মায়ের কাকা। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বরিশাল শহরে মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামে কলকাতার মৌলালির কাছে একটি ভবন আছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্কুলের পড়াশোনা শুরু খুলনা জেলা স্কুলে। কাছেই ভৈরব নদ। এই ভৈরবের কথা, খুলনা জেলা স্কুলের কথা তাঁর 'ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক', 'অগস্ত্যযাত্রা', 'বড় হওয়ার আগে', 'আলো নেই' প্রভৃতি উপন্যাসে ও কয়েকটি গল্পে এসেছে। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। সেখান থেকেই অনার্স গ্র্যাজুয়েট। কলেজে পড়তে পড়তে জড়িয়ে পড়েন ছাত্র রাজনীতিতে। তারপর চাকরি নিয়ে চলে যান বেলুড়ের ইস্পাত কারখানায়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন —

'বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্র-রাজনীতির জন্য আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে (যে সময়ে তিনি এই লেখা লিখছেন, তার থেকে পঁচিশ বছর আগে) স্বচ্ছন্দে ফোর্থ ইয়ারের শেষে ডিসকলিজিয়েট করলেন। তখন আর কিছুই করার নেই। এর কিছু আগে আমার এক সহোদরকে পটাসিয়াম সায়ানাইডে শেষ হতে দেখলাম। নিম্নবিত্ত পরিবারে একটি গ্র্যাজুয়েট মানে কিছু আশা। তা হওয়া গেল না। কলকাতা তখনও কলকাতা। খালাসীর চেয়ে কিছু ওপরে — ফারনেস হেলপার হয়ে তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফারনেসে ঢুকলাম।

'... অনেক পরে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলাম। জিনিসটা এত বাজে তার আগে জানতাম না। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলাম — অথচ গায়ে একটা ঘামাচিও বেরলো না।'

বেলুড়ের এই ইস্পাত কারখানা 'নিসকো'তে আড়াই বছর চাকরি করার পর শ্যামলবাবু আসেন শিক্ষকতায়। সাহাপুর মধুরানাথ স্কুলে তিনি কিছুদিন পড়ান। সেখানে তাঁর সহ-কর্মী ছিলেন জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। ইস্পাত কারখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন 'নির্বান্ধব' উপন্যাস।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'চর'। এ গল্প লেখা জুরের ঘোরে। বেরিয়েছিল 'অগ্রণী'-তে। গল্পটি কেটেকুটে ঠিক করে দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬০ সালের ২২ মে ইতি সান্যালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৫৮ সালে চাকরি পেলেন আনন্দবাজারে। শুনেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র নাকি ওঁকে নিয়ে গিয়ে কানাই সরকারকে বলে রুফ রিডারের চাকরি করিয়ে দেন। কয়েকমাস চাকরি করার পর ছেড়ে দেন। এরপর সন্তোষকুমার ঘোষ দিল্লি থেকে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডর্ড'-এর পাট চুকিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র দায়িত্ব নিলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সাব এডিটর হিসাবে নিয়ে যান। সেটা ১৯৬০। ১৯৬৪-তে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা চম্পাহাটিতে জমি দেখতে যান শ্যামলবাবু। ১৯৬৫-র ১১ অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করলেন চম্পাহাটিতে। তখন বড় মেয়ে মল্লিকা চার, ছোট মেয়ে ললিতা আড়াই মাসের। ১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই চম্পাহাটিতে



নিজের নতুন বাড়িতে বউ মেয়ে নিয়ে চলে যান শ্যামলবাবু। সে দিন ছিল উল্টোরথ।

এই চম্পাহাটি পর্বের নানা অভিজ্ঞতাই এসেছে তাঁর 'কুবেরের বিষয় আশায়' উপন্যাসে। এই উপন্যাস সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। 'দেশ' পত্রিকার তখনকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ লেখাটির অনেকগুলো কিস্তি বেরনর পর হঠাৎই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেন, আর তো জায়গা দেয়া যাচ্ছেনা। এবার তাড়াতাড়ি শেষ কর। 'কুবেরের বিষয়-আশয়'-এর আগে তাঁর 'বৃহন্নলা' (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস) ও 'অনিলের পুতুল'-এই দুটি উপন্যাস বেরিয়েছে। চম্পাহাটি পর্বের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি লেখেন 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলা', 'কন্দর্প', 'বোকা ডাক্তারের দুই রুগী', 'হাজরা নস্করের যাত্রা সঙ্গী', 'গত জন্মের রাস্তা' — এমন বহু গল্পে আছে তাঁর এই অঞ্চলের ছবি। খবরের কাগজে চাকরি করার জন্য কলকাতায় আসতে হয়, তাই ট্রেনে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি। পাশাপাশি ভূমিহীন চাষিদের নিয়ে সমবায় করে বিঘের পর বিঘে জমি চাষ, পুকুর কাটানো, সেই পুকুরের মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করা, বৃক্ষরোপণ, গো-পালন, মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা — সবই এক সঙ্গে পাশাপাশি করেছেন। এই অভিজ্ঞতার নির্যাস শিল্পিত রূপ হিসাবে উঠে এসেছে তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে। আনন্দবাজার পত্রিকার সাপ্তাহিক কৃষিপাতা 'ভূমিলক্ষ্মী'-তে তিনি বলরাম ছদ্মনামে লিখতেন।

চম্পাহাটির বিশাল মাঠ, ধান খেত, জ্যোৎস্না, স্বৈরিণী নারী, বুজে যাওয়া নদী খাত, সাপ, গরু, কুকুর, অসহায় নিঃসম্বল মানুষ যেমন তাঁর লেখায় এসেছে, তেমনই পরবর্তী সময়ে গাড়ি নিয়ে পাগলামি করার শৈল্পিক রূপ ফুটে উঠতে দেখি 'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসে।

১৯৭৬-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছেড়ে 'যুগান্তর'-এ আসেন। তারপর টানা চোদ্দ বছর 'যুগান্তর'-এ চাকরি। এর মধ্যে সাপ্তাহিক 'অমৃত' সম্পাদনা করেছেন ছ'বছর। বৈকুণ্ঠ পাঠক ছদ্মনামে লিখতেন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। ১৯৯১-এ চলে আসেন 'আজকাল'-এ।

১৯৯৩ সালে 'শাহজাদা দারাশুকো'-র জন্য পান সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। 'শাহজাদা দারাশুকো' ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় সাপ্তাহিক 'বর্তমান'-এ। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন ভুয়ালকা, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শিরোমণি, কথা, মতিলাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র স্মৃতি পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার প্রভৃতি।

মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পুরুষ বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। পছন্দ করতেন জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীকে। লেখালেখির জগতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পছন্দের তালিকায় প্রথম। তিনি মনে করতেন 'রাজসিংহ' 'সীতারাম' বা 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' নয়, 'ইছামতী'ই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেভাবে দেখতে গেলে তিনি খানিকটা বিভূতিভূষণ অনুসারী। কোনও মন্তব্য না করে, নিরাসক্ত ভাবে নিরুপায় মানুষের কথা তিনি বলে গেছেন। আবার অনেক জায়গাতেই তাঁর লেখা বিভূতিভূষণের থেকে আলাদা।

বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর, সতীনাথ তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক। মানিকের কিছু লেখা তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল। জীবনানন্দের কবিতা, ত্রৈলোক্যনাথ ও সুকুমার রায়ের লেখালেখি, রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও ছবি তাঁর বিশেষ ভাল লাগার মধ্যে — এমনটি জেনেছি নানা কথা প্রসঙ্গে। লিও তলস্তয়, দস্তয়েভস্কিকেও অসম্ভব বড় লেখক বলে মনে করতেন তিনি। তাঁদের লেখা মন দিয়ে পড়তেন।

জীবনের বিচিত্র বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ। নতুন নতুন মানুষ, নবীন রান্না, নতুন বই, নতুন গান, রূপময়ী নারী, নতুন আনন্দ — এসবই ছিল তাঁর ভালবাসতেন। বিচিত্র বিষয়ের বই পড়তেন। ক্রপদী সঙ্গীতে মন পড়ে থাকত। গান শুনতেন খুব মনোযোগ দিয়ে। গানের অনুষঙ্গ তাঁর বহু লেখায় এসেছে। এখনই মনে পড়ছে 'পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ' গল্পটির কথা। কিংবা 'তার সানাই' উপন্যাসটি। তাঁকে নানা সময়ে দেখেছি রেকর্ড প্লেয়ারে একখানা রসুলান বাঈ, বড়ে গোলাম বা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় চাপিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যেতে।

বাজার করা, লোককে ডেকে খাওয়ানো ছিল তাঁর কাছে তৃপ্তির। নিজেও ছিলেন খাদ্যরসিক। জীবনে বিচিত্র সব পাগলামি করেছেন নতুন নতুন লেখা খুঁজে বার করার জন্য। গোটা জীবনটাই ছিল তাঁর কাছে আবিষ্কার। সত্যিকারের একজন অভিযাত্রী ছিলেন তিনি। লোকের ভাল করব — এমন ভাবনা তাঁর ভেতর প্রায় সব সময়ই কাজ করত। তিনি জানতেন কেমন করে মানুষকে ভালবেসে, প্রেমে সর্বস্ব খুইয়ে আনন্দে থাকা যায়। সত্যি সত্যি কিংবদন্তির চরিত্র তিনি। এমন মানুষদের ঘিরে দু'একটা অতি কথা তো ভেসে বেড়াবেই। সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অতিকথার ধোঁয়াশা সরিয়ে সত্যিকারের সাহিত্যিক প্রতিভাটিকে বের করে আনাই বোধহয় আশা করি একজন প্রকৃত পাঠক-গবেষক, বন্ধুর কাজ। আশা করি এই সত্যটি কেউ কেউ মনে রাখবেন।

চিঠিপত্র

# প্রসঙ্গ : যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৪০৮ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের ধারাবাহিক সন্দর্ভ 'বঙ্গসংহার এবং' — এ কিছু তথ্যসূত্র বিচ্যুতি রয়েছে; প্রকৃত ঘটনার স্বার্থে সেগুলি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

সুখরঞ্জনবাবু লিখেছেন, ফেব্রুয়ারির শেষে ও মার্চ মাসের গোড়ায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন ও শ্রম মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঢাকায় এসে তাঁর নিজের জেলা ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বরিশালে যান। এই প্রসঙ্গে জানাই যোগেনবাবুর নিজের জেলা ফরিদপুর নয়, বরিশাল। তিনি পূর্ববাংলার বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত মেন্ডারকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সফরের আনুপূর্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরকম ঃ খুলনা জেলায় দাঙ্গা শুরু হলে মনোহর ঢালি এম এল এ ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে যোগেনবাবুকে করাচিতে টেলিগ্রাম করে খবর দেন। যোগেনবাবু এই খবর পেয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ বিমানে ঢাকায় আসেন এবং তেজগাঁও বিমানবন্দরেই খবর পান যে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে এবং বহুস্থানে হিন্দুরা গুণ্ডাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে অথচ এ ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি তখন বিমানবন্দর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং দাঙ্গা যাতে অবিলম্বে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি নিজে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বহুস্থান থেকে দাঙ্গা-অবরুদ্ধ হিন্দুদের উদ্ধার করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। শুধুমাত্র তাই নয় তাদের নিরাপদে ভারতে চলে যাবার ব্যবস্থাও করেন। এ ব্যাপারে তিনি বর্ণ হিন্দু ও বিবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে কোনও তফাত করেননি। দাঙ্গার সময়ে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসমসাহসী যোগেনবাবু যাদের উদ্ধার করেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রী সমর গুহ এবং কংগ্রেস নেতা তদানীতন পূর্ব পাকিস্তানের এম এল এ প্রভাস লাহিড়ি ও তাঁর আত্মীয়বন্ধুরা। এরপর ঢাকার দাঙ্গা শান্ত হলে তিনি বরিশাল যান।

শ্রীসেনগুপ্ত লিখেছেন যোগেনবাবুর এক মেয়ে ঢাকায় থেকে তখন কলেজে পড়তেন, তিনি ও যোগেনবাবুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আক্রান্ত হলে ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের সিক্রেট সারভিসের লোকেরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ বক্তব্যও ঠিক নয়। যোগেনবাবুর কোনও কন্যাসন্তান ছিল না। সন্তান বলে তার একটি মাত্র পুত্র জগদীশচন্দ্র মণ্ডল এখন গড়িয়ার অধিবাসী। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যার থেকে মনে হয় এই কন্যা কাহিনির উৎপত্তি। ঢাকার দাঙ্গার সময় বহু সংখ্যক হিন্দুরমণী নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং অন্যদিকে গুণ্ডারাও গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে কী ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন আক্রমণ করা যায়। এতে মিশন কর্তৃপক্ষ আসন্ন বিপদের কথা ভেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে যেভাবে হোক সেখান থেকে হিন্দু রমণীদের অবিলম্বে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে বলেন। যোগেনবাবু কালবিলম্ব না করে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের সাহায্যে একটি স্টিমার যোগাড় করে রামকৃষ্ণ মিশনে আটকে পড়া হিন্দু রমণীদের খুলনা এবং সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ওই সমস্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যে অনেকেই কলেজে পড়াশুনা করতেন।

তৃতীয় ব্যাপারটিকে অসংগতিপূর্ণ এবং অলীক — দুই-ই বোধহয় বলা চলে। শ্রীসেনগুপ্ত লিখেছেন 'শোনা গিয়েছিল দাঙ্গার পর বরিশাল শহরে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা সতীন সেনের পা জড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন।' এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা এখন খুবই দুরূহ ব্যাপার। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দুর্বল চিত্তের ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ ছিল খুব প্রখর। যে ব্যক্তি তাঁর সফর সঙ্গী হবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানের অনুরোধ হেলায় প্রত্যাখান করেন এবং হিন্দুদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে দ্বিধা বোধ করেন না তিনি কেন তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতা সতীন সেনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন? এ ব্যাপারটা সহজে মেনে নেওয়া মুশকিল। যোগেনবাবু কি ব্যক্তিগত ভাবে সতীন সেনের বিরুদ্ধে কোনও জঘন্যতম অপরাধ করেছিলেন যে তার জন্যে তিনি ওই ভাবে পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন? ইতিহাস বলে যোগেনবাবু সর্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। জাতির জন্যও তাঁর ত্যাগ ছিল অপরিসীম। যাই হোক, লেখককে অনুরোধ এ কাহিনির নেপথ্যে বাস্তবিকই যদি কোনও ঘটনা থেকে থাকে তা হলে তিনি অকপটে তা প্রকাশ করুন। ইতি

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস
সল্টলেক, কলকাতা — ৯১

পুনর্মুদ্রণ

# মহাসত্ব

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

সম্প্রতি প্রয়াত অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মরণে চতুরঙ্গ (বৈশাখ ১৩৬০, ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে তাঁর 'মহাসত্ব' নাটিকাটি বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল। নাটিকাটি আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। — সম্পাদক

[স্থান : অরিশ্রিমনিবিভূষিতপাদ শ্রীমল্লক্ষণ সেনের নবদ্বীপের নিকটস্থ স্কন্দাবার। এখন যাকে বল্লাল ঢিপি বলে, জায়গাটা তার কাছাকাছি হবে। স্কন্দাবার বলতে কিন্তু তাঁবুর ব্যবস্থা নয়, সুপরিকল্পিত নগর, রাজার মত পরিবর্তিত হ'লে কিম্বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পরিতক্ত হ'তে পারে ব'লে স্থাপত্যের সর্বত্রই সাময়িকতার ছাপ আছে। কিন্তু রঙ্গশালাটির স্থাপত্য লক্ষণীয়। যে রকম স্থাপত্যের নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি তেমন একটি গঠন এই রঙ্গশালার। স্থপতি অভিনবত্ব দেখার চেষ্টা করেছে এটাই তার প্রমাণ। ঠিক যেন রোমের কোনও বৃত্তাকার গ্যালারি, শুধু মাত্র আয়তনে ছোট। গ্যালারিগুলির পারস্পরিক উচ্চতা নগণ্য এবং ধাপে ধাপে নেমে না এসে চারিদিকের দেয়াল থেকে বৃত্তের মধ্যবিন্দুর দিকে সামান্য ঢালু হ'য়ে নেমে এসেছে মেঝে। বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মাঝখানে গৃহতল থেকে সামান্য উঁচু একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ। এটাই রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চটির ঠিক মাঝখানে একটি স্তম্ভ। এটির প্রয়োজন শুধু মাত্র আলোকসজ্জার জন্য। স্তম্ভটির গায়ে খোদাইকরা নয়িকা মূর্তিগুলির সব কটির হাতেই আলোকাধার। স্তম্ভটির উপরে একটি স্বল্প আয়তন চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপটি থেকে পেতলের ঝকঝকে শেকলে বড় বড় কয়েকটি প্রদীপ ঝুলছে।

গ্যালারিটি কিন্তু পূর্ণবৃত্ত রচনা করতে পারেনি। চতুষ্কোণ মঞ্চটির বাগুওলির সমান্তরালে কয়েকটি চাপ রঙ্গাগারের বৃত্তকে খণ্ডিত করেছে। এই চাপগুলি দেয়াল। উত্তর ও দক্ষিণদিকের এই রকম দেয়াল দু'টির পেছনে নট-নটীদের নেপথ্যঘর বা গ্রিনরুম। পূর্বদিকের দেয়ালটি কারুকার্যখচিত, দূর থেকে মনে হয় যেন স্তম্ভ গবাক্ষ ইত্যাদি সমন্বিত একটি রাজপ্রাসাদের অংশ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকের দেয়ালগুলির প্রত্যেকটিতে একাধিক দরজা জানালা আছে। নাটকের সময়ে এই সব দরজা দিয়ে নট-নটীরা মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করে, জানালা দিয়ে মুখ বার করেও তাদের কথা বলতে দেখা যায় অভিনয়ের প্রয়োজন মতো। ফলে দর্শক আর নট-নটীদের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে দর্শকরাও নিজেরাই যেন অভিনয়ের অংশ হ'য়ে পড়ে। পূর্বদিকের দেয়ালটি সাধারণত স্বর্গ, রাজাশুপুর ইন্দ্রপ্রস্থ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, এবং নাটকের প্রয়োজন অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণের ঘরগুলি পৃথিবী, পাতাল, মগধরাজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মনে করুন কোনও একনাটকে কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষই দেখাতে হবে, সে ক্ষেত্রে রণস্থল, কাম্বুলী ইত্যাদি হবে। চতুষ্কোণ মঞ্চটুকু আর নেপথ্য বিধানের ঘরগুলি হবে কুরু ও পাণ্ডবের পৃথক পৃথক শিবির।

রঙ্গাগারটির প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে, পথ থেকে দু'খাক সিঁড়ি উঠে রঙ্গাগারের মেঝেতে পৌঁছান যায়।

যে লক্ষণীয় ব্যাপারটি এতক্ষণ বলা হয়নি সেটা হ'চ্ছে, রঙ্গাগারের ছাদ নেই। নেপথ্য বিধানের ঘরগুলি ছাড়া রঙ্গাগারের সবটুকুই খোলা আকাশের আলো পায়। এ ছাড়া সবগুলি প্রদীপ জ্বললে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেও পূর্ণিমার রাত্রির মতো আলো হয় মঞ্চটিতে।

মঞ্চের অত্যন্ত কাছে খানকয়েক ধাতব আসন ইতস্তত স্থাপিত আছে। সম্ভবত অনন্যসাধারণ দর্শকদের জন্য।

কাল : আনুমানিক ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনাসমৃদ্ধ
সন্ধ্যা ও রাত্রি।

এখন সন্ধ্যা। প্রবেশ সোপানের দু'পাশে দু'জন বল্লমধারী সৈনিক পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এদের আকৃতি বাঙালির ব'লে মনে হয় না। এরা ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সেন রাজাদের সাথে যারা এসেছিল তাদেরই বংশধর। রাজনীতির প্রয়োজনে এরা নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রেখেছে। 'রাজকীয় সাম্ভীবাহিনী' ব'লে যে বিশেষ সৈন্যদল আছে এরা তারই অঙ্গীভূত। সেকালের দু'একজন বাঙালি এই বাহিনীর সাম্ভী হ'তে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করেছে। এদের মাথার চুলগুলি চূড়া ক'রে বাঁধা। বাঙালিদের বাবরি চুল নয়, এদের মুখাবয়বেও ককেশিয় সুলভ তীক্ষ্ণতা আছে, সাধারণত বাঙালিদের ক্ষেত্রে যা দুর্লভ।]

(নেপথ্যে)

প্রথম। নাটকটা কি গো?

দ্বিতীয়। ধোয়ীর নয়, জয়দেবের নয়, এমনকী শারন কবিরও নয়। তাদের হ'লে বলতে পারতাম। এ এক নতুন কবির নাটক।

তৃতীয়। দেখা শোনা যাবে তো?

প্রথম। ভীমা কামার দেখেনি এমন নাটক আবার নবদ্বীপে কবে হ'ল।

তৃতীয়। এগিয়ে দেখ না ভীমা দাদা।

প্রথম। পেছনে থাকিস কিন্তু, আমার পেছন দিকটাতেই ভয় ভয় করে।

(সামান্য হাসাহাসির শব্দ। অল্প পরে প্রবেশ সোপানের এক প্রান্তে ভীমার দেহের ঊর্ধ্বাংশ এবং তার মুখখানি দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটি কাঁধের উপরে মস্ত একটা মাথা, চওড়া বুক। মুখভরা হাসি।)

ভীমা। ভাইগো, শুনছো, একটু রং তামাসা দেখব।

প্রথম সাত্ত্বী। যাও, যাও। এখানে আজ সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। রাজকুমার আর তাঁর বন্ধু-বয়স্যরা নাটকের মহলা দেখবেন।

ভীমা। মশাই গো, বড্ড সখ হ'য়েছে প্রাণে নতুন কবির নাটকটা দেখি।

প্রথম সাত্ত্বী। ঝামেলা কোর না যাও।

(ভীমার মুখ অন্তর্হিত হ'ল)

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। নেমন্তিৎ চিনবার উপায় কী? (প্রথম সাত্ত্বীর দিকে এগিয়ে)

প্রথম সাত্ত্বী। কোনও উপায় নেই, মহলায় আবার নেমন্তন্ন কি? দেখতে হবে ভিড় না হয়। আর কোনওক্রমেই ওরা না আসে। (গলা নিচু করে) কবির এই প্রথম নাটকের মহলা, রাজকুমার চান না দেখলে যাদের পাপ হয়, সেই বৌদ্ধরা কেউ উপস্থিত থাকে। (স্বাভাবিক গলায়) তা হ'লে বুঝতে পারছ, অনিমন্ত্রিত কেউ যেন উপস্থিত না থাকে।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। উঁ-হুঁ।

প্রথম সাত্ত্বী। ও কি?

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। মানে, চেষ্টা করছি গলা ওঠানামা করতে। (দু'জনে হাসল) ওটা কি তোমার বেশি নাটক শোনার ফল — ওই গলা তোলপাড় ক'রে কথা কওয়া?

প্রথম সাত্ত্বী। আজ সকালের আদেশ শোননি? জাতধর্মের কথা তুলে বৌদ্ধদের মনে কষ্ট দেয়া আর চলবে না। আমাদের রাজা ধর্ম্ম পতিপক্ষ।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। ধর্ম্ম পতিপক্ষ নয়, কথাটা ধর্ম্ম নিরপেক্ষ।

প্রথম সাত্ত্বী। তা যাই বলো মাঝে মাঝে গাল না দিলে ওরা খুব বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। বুদ্ধি ক'রে গাল দিতে হবে আর কি।

(দু'জনে বিপরীত মুখে হাঁটতে শুরু করল, খানিকটা গিয়ে থামল, ফিরে এসে আবার মুখোমুখি হ'ল)

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। নাটকটা আমরা দেখতে পাব তো?

প্রথম সাত্ত্বী। অভিনয়ের রাত্তিরে যদি ভেতরে পাহারা হয়, তবে তো।

(একটু ঘুরে এসে আবার)

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। আমার মামা বলেছিলেন, সাত্ত্বী আবার নাটক শোনে কবে। আমরা নাটক দেখে গান শুনে বেহয়লা হ'য়ে পড়েছি, তাদের সময়ে নাকি সবাই ভারি ভারি অজঙ্গুন ছিল।

প্রথম সাত্ত্বী। রাখো ওসব বুড়োদের বুড়োমি। নিজের কালকে সবাই ভাল বলে। ওদের সময়ের অন্তরগুলো দেখেছ? বল্লমগুলি ছিল সোজা সোজা বাঁশের গায়ে বসানো লম্বা লোহার ফলা। ফলার পিছনে এই আড়াআড়ি ফলাটাও ছিল না, আর উল্টোদিকের এই বঞ্চুলও ছিল না।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। ওরা বলে যুদ্ধের সময়ে এতে অসুবিধাই হবে।

প্রথম সাত্ত্বী। যুদ্ধ লাগে না, পরীক্ষা হয় কী ক'রে?

(দু'জনে সোপানের প্রান্তের দিকে সরে যেতে যেতে ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। কিছুক্ষণ পরে মালবিকা ও মালঞ্চমালা নামে দু'জন নটী প্রবেশ করল। তাদের হাতে ধূপদীপাদি মঙ্গলাচরণের উপচার।)

মালবিকা। এখানে যুবরানি আসবেন কি গো, এখানে কি মহিলাদের ব্যবস্থা আছে? নতুন কবির নাটকের জন্য নতুন রঙ্গ শালা হ'ল। শুনছি পরে সাজঘরগুলিকে বদলে মহিলাদের বসবার জায়গা হ'লেও হ'তে পারে।

মালঞ্চমালা। নগরের উত্তরে নাকি আর একটি হচ্ছে।

মালবিকা। সকলের মুখেই শুনছি। সেটা বৌদ্ধদের জন্যই বিশেষ ক'রে হ'চ্ছে। মহারাজা তাঁর বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রজাদের সকলকেই সমান সুবিধা দিতে চান।

মালঞ্চমালা। তা হ'লে দু'দলের জন্যে আলাদা কেন, এক জায়গায় বুঝি সমান সুবিধা দেয়া যায় না? (এরা আলাপ করতে করতে মঞ্চের উপরে একটি সুদৃশ্য সোনার প্রদীপাধার রেখে জ্বালিয়ে দিল, ধূপাধার রেখে জ্বালিয়ে দিল। একটি সপ্রদব পূর্ণ কলস রেখে তার গায়ে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিল।)

মালঞ্চমালা। নাকি এক নতুন নটীও এসেছে?

মালবিকা। সোমা তার নাম।

মালঞ্চমালা। আমাদের সোমার কথাই বাইরের লোকের মুখে অমন শতখানা হ'য়ে আমাদের কানে আসছে? যাই বলো, অপূর্ব সুন্দরী।

মালবিকা। নটী অপূর্ব সুন্দরী হ'লে তোর লাভ কি? তার পথের উপরে একটি ফুল ফেলে দেয়া যাবে না, স্মরণ ক'রে রাত জেগে থাকাও যাবে না।



মালঞ্চমালা। তুমি যেন কেমন, মালা!

(একটু হাসাহাসি)

মালবিকা। রাজান্তঃপুরে ভালই ছিল, এখন ওর সুনামে আমাদের অখ্যাতি।

মালঞ্চমালা। তা হোক।

মালবিকা। তা হ'লে তুই ওকে ভালবাসিস?

মালঞ্চমালা। অমন রূপ, অমন স্বভাব। কিন্তু এখানে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ওর আসা ভাল হয়নি। রাজপুরীর চাইতে পরিশ্রমও এখানে বেশি।

মালবিকা। আসল খবর কি জানিস? সোমাকে নিয়ে যুবরানির স্বস্তি ছিল না। শয়নকক্ষের পরিচারিকা, না যায় তাকে বাদ দিয়ে চলা, না চলে তাকে রাজকুমারের সামনে আসতে দেয়া।

মালঞ্চমালা। কেন, বৌদ্ধ ব'লে?

মালবিকা। তা নয়, ও নাকি যথেষ্ট সুলক্ষণা নয়।

মালঞ্চমালা। লক্ষণের মুখে ছাই, এই রূপ কখনও কুলক্ষণ হ'তে পারে? এরা যে কি মনে ক'রেছে বুঝি না। মানুষ যেন বেলে পাথরের মূর্ত্তি, তার বুকের মাপ এতটা হবে, তার বর্তুলতা সে রকম হবে, কোমরের পরিমাপ হবে ততটা। অপমান বোধ হয় অমন সব পরিমাপের কথা শুনলে।

মালবিকা। উপায় কি বলো! সোমা যেন ঠিক বেলে পাথরের মূর্তির মতো দেখায় না। আমি শুনেছি ওকে দেখলে নাকি চোখ স্নিগ্ধ হয় না, ওর গড়নে কোথায় একটা উষ্ণতা আছে। মেয়ে মানুষ ব'লে বোধ হয় ওকে।

(মহাকালের মন্দিরে আরতির বাজনা বাজতে আরম্ভ করল)

মালঞ্চমালা। চল সময় হ'চ্ছে।

মালবিকা। এবার সাজ করতে হবে।

(দু'জনে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত ধ'রে আরতির বাজনাটা ফুলে ফুলে উঠে নীরব হ'ল। তারপর সূত্রধার প্রবেশ করল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সাদা কাপড়, সাদা উত্তরীয়, দু'হাতে রূপোর অঙ্কুশ। প্রবেশ ক'রে কিছুক্ষণ ইতস্তত দেখল। স্তম্ভটির আলোকসজ্জার দিকেই বিশেষ লক্ষ করল। তারপর উত্তর দিকের সজ্জাঘরের কাছকাছি গিয়ে ডাকল।)

সূত্রধার। মালবিকা, মালঞ্চমালা, তোমরা কি এখনও প্রস্তুত হওনি।

(উত্তর দিকের সাজঘরের জানালা খুলে মালঞ্চমালা দেখল, তারপরে বেরিয়ে এল)

মালঞ্চমালা। প্রণাম আচার্য, আর সকলে প্রস্তুত, সোমলতার প্রসাধন এখনও হয়নি।

সূত্রধার। কেন, কেন?

মালঞ্চমালা। তার কি হাস্যরসের সাজ হবে?

সূত্রধার। সে কি! তোমরা কি সোমাকে গ্রাম্য মেয়ের মতো সাজাবে?

মালঞ্চমালা। কিন্তু সে তো প্রথম অঙ্কে চূড়ো ক'রে চুল বেঁধে গাছকোমর শাড়ি পরে নামতে চাচ্ছে।

সূত্রধার। সে কি? (একটু চিন্তা করল) তা মন্দ নয়। পনরো ষোল বছরের একটি মেয়ে গাছকোমর বেঁধে ছেলের দলে ছুটোপুটি করলে চরিত্রের একটা বিশেষ দিক ফোটে বটে। তারপর সে বিবাহের বন্ধনে পড়লে রসের বৈপরীত্যও পরিস্ফুট হয়।

মালঞ্চমালা। তা হলে কী হবে, কিছু বললেন?

সূত্রধার। দেখো, মহলার সময়ে সোমা তার খুশি মতো বেশভূষা ক'রে নামুক। প্রয়োজন হয়, অভিনয়ের সময়ে বদলে দেয়া যাবে। সোমা আর কবি আজ দু'জনেরই পরীক্ষার দিন; কবির এই প্রথম নাটক, সোমার প্রথম মঞ্চে নামা। দেখ, আমরা মাইনা করা লোক, তাদের সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

মালঞ্চমালা। তাই হবে। (সজ্জা ঘরে চলে গেল)

সূত্রধার। কোন সজ্জায় ওকে মানায়, আসলে আমিই বুঝে উঠতে পারছি না। করুণ বলো, হাস্য বলো, কোনওটিতেই যেন সবটুকু মানায় না।

(দক্ষিণ দিকের সাজঘরের একটা দরজা খুলে কবি দিব্য বার হ'ল। আচার্যকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এল। কবির পরিচ্ছদ — চাঁপা রঙ্গের কাপড় ও চাদর।)

কবি। নমস্কার। শুনলাম, আজকের মহলায় নাকি আপনার প্রধানা নটী অনুপস্থিত।

সূত্রধার। তাকে আসতে বলা হয়নি।

কবি। তাকে বাদ দিচ্ছেন? তাকে দিয়ে কি ময়নামতির অভিনয় চলল না।

সূত্রধার। না, ঠিক যেন হ'চ্ছিল না।

কবি। তা হ'লে নায়িকার ভূমিকায়?

সূত্রধার। সোমলতা। মাঝে মাঝে মহলায় বদলি হিসাবে নামত।

কবি। সে তো একেবারে নতুন লোক।

সূত্রধার। ভালই তো, কবিও নতুন, নাটকও নতুন।

কবি। পুরানো অভিজ্ঞ নট-নটীদের বাদ দেয়া কি ভাল হবে? যে নটীকে দিয়ে কবি জয়দেবের নাটকগুলি অভিনীত হ'ল তাকেই বাদ দিলেন?

সূত্রধার। সোমলতার অভিনয় দেখার পর ভাবছি, কী ক'রে অন্য কেউ এতদিন নায়িকার অভিনয় করেছে!

কবি। দেখবেন, তীরে এসে তরী ডুবে না যায়। আমি কবিবর ধোয়ীর কাছে একবার যাব। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করা হয়নি এখনও।

সূত্রধার। কবি, আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন?

কবি। কি? ও সেই বাঙলায় কথা বলা? তা কী ক'রে সম্ভব? এ কি কোনও নাট্যশাস্ত্রে আছে? প্রাকৃত ভাষা বড় জোর দেখা যায়, কিন্তু সাহিত্যহীন একটা দেশিভাষার সাহায্যে নাটক লেখা যায় না। লিখলেও সেটা নাটক হ'য়ে ওঠে না।

সূত্রধার। কবি, বয়স হ'ল আমার। যৌবন থেকেই এ কাজ করছি। প্রাকৃত যাদের বলবার ভাষা ছিল, প্রাচীন কবিরা তাদের মুখেই প্রাকৃত দিয়েছেন, যদি বাঙালি ময়নামতী কান্নার সময়ে বাঙলায় বিলাপ করেন, দোষের হয় না বোধ হয়।

কবি। কিন্তু আচার্য, কোথাও কি, কোনও নাট্যশাস্ত্রে দেশিভাষার প্রয়োগ দেখেছেন? এ যে ভারতশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দলত্যাগী হ'য়ে বিপথে যাওয়া।

সূত্রধার। পথিকৃৎ হওয়া মানেই দলত্যাগ করা — বিপথে চলার চেষ্টা।

কবি। ওসব লোভের কথায় আমাদের দরকার নেই, আচার্য মশাই, পবনদূতের কবি যাতে যশ পেয়েছেন, জয়দেব কবি যাতে মধু ঢেলেছেন, সেই সংস্কৃত কাব্যের আর্দশই আমার আরাধ্য। ময়নামতীর বিলাপের শ্লোকগুলি কি ভাল হয়নি?

সূত্রধার। অনুপম হ'য়েছে, কিন্তু সোমার মুখে যদি সেগুলির বাংলা প্রতিরূপ শুনতেন!

কবি। (একটু দ্বিধা করে) না, না। তা কী ক'রে হয়, কী ক'রে হয়? মহলার একটু দেরি আছে তো? আমি একটু আসি। (কবি সোপনের পথে প্রস্থান করল।)

সূত্রধার। কবিমাত্রেই অবুঝ। আরে দাসী কে আছিস। (নটীদের সাজঘরের দরজার কাছে একজন দাসীকে দেখা গেল।) সোমাকে একটু খবর দিস।

(দাসী চলে গেল, একটু পরে নটীদের সাজঘরের আর একটি দরজা খুলে সোমলতা প্রবেশ করল। রানি হবার উপযুক্ত চেহারা তার।)

সোমলতা। আমাকে ডেকেছেন?

সূত্রধার। তোমার অভিনয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার আর কিছু আমার নেই। মহলায় এতদিন তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। আজ দর্শক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পুরো নাটকের মহলাটা দেখব। কবি নাটক লিখেছেন রাজপুত্রকে কেন্দ্র করে, আর অভিনয়ের রস কেন্দ্রীভূত হবে তোমার ভূমিকায়। মনে হচ্ছে, নির্দেশ না দিয়ে তোমাকে নিজের পদ্ধতিতে অভিনয় করতে দেয়া উচিত।

সোমলতা। আপনি পিতৃতুল্য, আপনি নির্দেশ দেবেন, এটাই স্বাভাবিক।

সূত্রধার। না সোমা, ভালকে ভাল বলতে দাও আমাকে। আজকের মহলায় রাজকুমারের সম্মুখে তুমি নিজের অভিনয় করে যাবে, নিজে যা বুঝেছ তেমনি ক'রে নায়িকার চরিত্র ফুটিয়ে



তোল, আমি অন্যান্য নট-নটীদের চালনা করে যাব।

সোমলতা। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলি, যদি হাস্যকর ভাবে নাটকীয় হ'য়ে যায় অভিনয়?

সূত্রধার। তোমার পা এমন নাচের ছাঁদে বাঁধা, মৃদঙ্গকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তালভঙ্গ হবে না, সোমা।

সোমলতা। আপনি কি কবিকে সংলাপের কথা বলেছিলেন?

সূত্রধার। কবির মত নয়, বাংলায় সংলাপ হয়।

সোমলতা। তা হ'লে?

সূত্রধার। সোমা নাটক শুধু কবির নয়, আমারও নাটক। খানিকটা স্বাধীনতা না পেলে আমরাই বা কী ক'রে অভিনয় সার্থক করি?

সোমলতা। আপনি কি রাজকুমারকে বলবেন?

সূত্রধার। দেখা যাক।

(একজন সৈনিক প্রবেশ করল সোপানের পথে)

সৈনিক। মহাশয়, আপনি সূত্রধারকে চেনেন?

সোমা। তুমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছ।

সৈনিক। সেনানি চন্দ্রসেন। আপনার সাথে কথা বলতে চান।

সূত্রধার। সানন্দে, সানন্দে, তাঁকে আসতে বলো। (সৈনিক সোপান বেয়ে চলে গেল) সোমা, তাড়াতাড়ি নেপথ্য বিধান শেষ করো। রাজকুমারের পারিষদরা আসতে শুরু করলেন, হয়ত এখনই নিজেই তিনি আসবেন।

(সেনানি চন্দ্রসেন প্রবেশ করল। কটিতে তরবারি কিন্তু অন্য সব বেশভূষা কবির মতো। নীল চীনাংশুকের ধুতি ও উত্তরীয় পরিধানে, বাহুতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল, মাথায় শিরোভূষণ। সোমা তাকে দেখার জন্যই দাঁড়িয়েছিল, একটা সতর্ক হাসি তার মুখে খেলে গেল। চন্দ্রসেন আরও কাছে এগিয়ে আসার আগেই সে ধীরে ধীরে সাজঘরে প্রস্থান করল।)

চন্দ্রসেন। নমস্কার, আচার্য মশাই।

সূত্রধার। আসুন, আসুন। নমস্কার, সেনানিশ্রেষ্ঠ।

চন্দ্রসেন। একটু প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, আপনার সাথে কথা বলছিল এ নটীটিকে যেন আগে কোথাও দেখেছি।

সূত্রধার। অসম্ভব নয়, ইনি দু'দিন আগেও রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা ছিলেন।

চন্দ্রসেন। না, তার চাইতেও বেশি পরিচিত। যাক গে। আমি আপনার নটী সোমলতাকে খুঁজছিলাম।

সূত্রধার। এখনই, না নাটকের শেষে?

চন্দ্রসেন। এখন হ'লেই ভাল হয়। রাজকুমার বীরসেনের সাথে একটি আরবীয় অশ্ব বাজি রেখেছি। সোমলতার দেশ জাতি ইত্যাদি জানার উপরে সেই বাজির নিষ্পত্তি হবে।



সূত্রধার। স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে, কিন্তু অনেকটা সময় যেন নেবেন না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে কোথায় পাব?

সূত্রধার। আপনার সম্মুখেই তো দাঁড়িয়েছিলেন। সাজঘরের দিকে যান দেখতে পাবেন। আমিও যাই, নটদের সাজা হ'ল কিনা দেখি।

(সূত্রধার নটদের সাজঘরে প্রবেশ করল, চন্দ্রসেন নটীদের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল)

চন্দ্রসেন। সোমলতা আছেন, সোমলতা?

(একজন পরিচারিকা বেরিয়ে এল।)

পরিচারিকা। কাকে চাই? কী চাই?

চন্দ্রসেন। সোমলতার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

পরিচারিকা। তিনি কি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন? জিজ্ঞাসা করি, আপনার নাম কী বলব?

চন্দ্রসেন। সেনানি চন্দ্রসেন।

পরিচারিকা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

(পরিচারিকার প্রস্থান, ক্ষণ পরে সোমলতার প্রবেশ)

সোমলতা। আমি সোমলতা। (চন্দ্রসেন বিস্মিত দৃষ্টিতে সোমার দিকে চেয়ে রইল) আমাকে দিয়ে আপনার দরকার আছে? নটীর দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে নেই।

চন্দ্রসেন। তুমিই সোমলতা? তুমি কোন জাতীয়া জানতে এসেছিলাম। এখন মনে হ'চ্ছে তোমাকে আমি চিনি। কত সুন্দর হয়েছ তুমি।

সোমা। পরিচারিকা হিসাবে অনেক সময়ে রাজসভায় গিয়েছি, আমাকে চেনা বিচিত্র নয়।

চন্দ্রসেন। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

সোমা। আপনাকে? শিরোভূষণ ও অস্ত্র দেখে মনে হ'চ্ছে আপনি একজন সেনানি। ওদের মুখে শুনলাম আপনার নাম চন্দ্রসেন।

চন্দ্র। তা নয়।

সোমা। তবে? পূর্বজন্মের কথা বলছেন?

চন্দ্র। যদি তাই বলি, ফুল্লরা।

সোমা। ফুল্লরা? সেনানি আপনার বাকবৈদগ্ধ্য নাগরিকার কাছে বিস্ময়ের নয়। ফুল্লরা নামটি আপনার প্রিয় তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষে মানুষে অমন কত মিল থাকে চেহারায়।

চন্দ্রসেন। (ব্যঙ্গের সুরে) তা হবে। যদি আপত্তি না থাকে, বলবে কি, কোন জনপদ তোমার জন্মভূমি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে?

সোমা। পদ্মার তীরে, বরেন্দ্রভূমি আমার জন্মস্থান।



চন্দ্রসেন। জাতি?

সোমা। বাঙালি, উপাস্য অমিতাভ তথাগত।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার বীরসেন জানতে চেয়েছেন কিনা —

সোমা। আপনার নিজের বোধহয় আর কৌতূহল নেই, সেনানি?

চন্দ্রসেন। আমরা সৈনিক। যুদ্ধ আমাদের ব্যবসা। জনসাধারণের সেবায় ঔৎসুক্যের অবসর বড় কম।

সোমা। আমরা কলাব্যবসায়ী। জনসাধারণের সেবা আমাদেরও লক্ষ্য। রাজকুমারের কাছে নটীর জাতি ও ধর্মের কথা বলতে গিয়ে নিজের ভুলটার কথাও যেন বলবেন না। সুন্দরীদের সাথে নিগূঢ় জন্মার্জিত সম্বন্ধ অনুভব করা অনেক পুরুষের পক্ষেই স্বাভাবিক।

(সম্ভব হ'লে চন্দ্রসেন সোমাকে ভস্মীভূত করত। সে একটা ভ্রুকুটি ক'রে প্রস্থান করল। সোমলতাও তার দিকে চেয়ে রইল। মালঞ্চমালা প্রবেশ করল।)

মালঞ্চমালা। ওরা বলছিল সেনানি চন্দ্রসেন। তাহলে এ ধরনের কথা বলা ভাল হয়নি।

সোমা। তুমি কি আমাদের আলাপ শুনছিলে?

মালঞ্চমালা। হ্যাঁ। সেনানি চন্দ্রসেন মহারাজকুমার বীরসেনের বয়স্য। ব্রহ্মক্ষত্রিয়। অল্প দিনের মধ্যে রাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি হবেন এ রকম সম্ভাবনা আছে। কোমরে কৃপাণ বাঁধা সেনাপতি নন, বিচক্ষণ কৌশলী ব'লেও নাম আছে।

সোমা। তবু ভাল বীর হিসাবে বিখ্যাত নয়। কিন্তু অভিনয়ের সময় প্রায় হ'য়ে এল। তোমার এখনও সাজা হয়নি।

মালঞ্চমালা। কেন আর কী করতে হবে?

সোমা। সেটা যদি বুঝতে তা হলে কি দুঃখ ছিল। বেণী বাঁধলে হবে না, চুল তোমাকে খুলে রাখতে হবে। যে রানির পুত্রশোক উপস্থিত তাকে শোক প্রকাশই করতে হবে — শাস্ত্রীয় মুদ্রা নয়। যাও।

(মালঞ্চমালা সাজঘরে প্রবেশ করল, মালবিকা অদূরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল। এবার সে এগিয়ে এল।)

মালবিকা। সোমা—

সোমা। তোমার আবার কী হ'ল?

মালবিকা। এখানে আপাতত নির্জন, গুটিকয়েক কড়া কথা তোমাকে এইবেলা শুনিয়ে দি।

সোমা। এখন না হ'লেই নয়, বল তাহলে।

মালবিকা। এ তোর কোনদিশি ব্যাভার, ফুল্লরা? আর কতদিন এমনি অভিনয় করতে হবে?

সোমা। অভিনয়? তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে নিয়ে

শহরে এসেছিলাম সেনানিদের সাথে পর্যায়ক্রমে অভিনয় ক'রে যেতে? কিম্বা অন্য কথায় নিজের পরিচয় গোপন রেখে উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ খুঁজতে? আমি রঙ্গমঞ্চের নায়িকা, জীবনের নয়। পরিচয় হয়ত গোপন রেখেছি—

মালবিকা। কেন, তাই বল।

সোমা। ভয় করি ব'লে।

মালবিকা। তুই করিস? ভয়? কাকে?

সোমা। কাকে নয়, কারও কারও রাজনৈতিক প্রেম।

মালবিকা। চন্দ্রসেনের প্রতি তুই চিরদিনই এমনি অবিচার করবি? যদি তোকে এতদিন নেবার সাহস না পেয়ে থাকে তার কারণটাই কি তুই অনুসন্ধান করেছিলি? বৌদ্ধ-অর্ধাঙ্গিনী নিয়ে তার পক্ষে আজকের এই উন্নতি করা সম্ভব হ'ত? এখন সে পারে যে কোনও সমাজ থেকে স্ত্রী আনতে।

সোমা। তোর কথাটা সাজালে কী দাঁড়ায় জানিস? স্ত্রীরত্ন দুস্কুলাদপি। কিন্তু আমার অ-রাজকীয় কুলটাকে আমি দুস্কুল ব'লে মনে করি না, এই যা গোলমাল।

মালবিকা। শত হ'লেও সে বাল্যবন্ধু। উচ্চাশায় সে যদি অন্ধ হ'য়ে থাকে সাময়িকভাবে?

সোমা। এখন তাকে তুই চক্ষুষ্মান কর না।

মালবিকা। যদি করি, জানিস, সে তোকে যাতে আরও দেখতে পায় তার জন্যে।

সোমা। বেশ তো। আমি কি তাঁকে আমার কাছে আসতে মানা করেছি? সামান্য নটী আমি, তাঁর মতো রাজপুরুষকে প্রত্যাখ্যান করি এমন সাধ্য কি আমার। তিনি সহস্রচক্ষু হ'য়ে আমাকে দেখুন।

মালবিকা। তোর হৃদয়টাকেও কি তুই পদ্মায় বিসর্জন দিয়ে এসেছিস। তুই কিছুতেই বুঝবি না উচ্চাভিলাষী পুরুষের পক্ষে প্রেমাস্পদাকে সাময়িক উপেক্ষা করা অস্বাভাবিক নয়।

সোমা। তুই উচ্চাভিলাষ, হৃদয়, এসব কত কি বলছিস্। এখুনি মহলা শুরু হবে। তুই দেখবি উচ্চাভিলাষ আমারও আছে, হৃদয়ও আমি বিসর্জন দিইনি।

মালবিকা। নটীর হৃদয়। বৃদ্ধা লোলচর্মা, উপেক্ষিতা এক নটী এই তোর পরিণতি।

সোমা। তুই বড্ড রাগ করেছিস, এবার চল। হ্যাঁরে, আমাদের তথাগত জরার যেন কী একটা প্রতিকারের কথা বলেছেন? চল, পরে সে আলোচনা করব।

(দু'জনে সাজঘরে ফিরে গেল। সোপানের বিপরীত প্রান্ত থেকে প্রহরীদ্বয় এসে মুখোমুখি দাঁড়াল।)

প্রথম সাত্ত্বী। পাহারার কাজে আগে টহল দেয়াই ছিল নিয়ম, দাঁড়ানোটা ব্যতিক্রম, এখন দাঁড়ানোই নিয়ম, টহলটাই ব্যতিক্রম।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। বদলাল কেন?

প্রথম সাত্ত্বী। সব কিছুর কারণ কি বলা যায়?

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। এটায় যায়। টহল দিতে থাকলে বাধা হিসাবে আমরা বৌদ্ধদের চোখে পড়ব। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে অতটা নজরে পড়ব না। বাধা দেব বটে, বাধা হিসাবে চোখে পড়ব না।

প্রথম সাত্ত্বী। (হো হো ক'রে হেসে উঠে) সাবাস আবিষ্কার করেছ। এটা একটা সূক্ষ্ম কৌশল বটে, আমাদের নগরপালের কাছে এমন সূক্ষ্মতাই আশা করা যায়।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম সাত্ত্বী। আরে ও কে? কি বিপদ।

(আমাদের পূর্বপরিচিত ভীমা কামারকে সোপানের গোড়ায় দেখা গেল। তার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরিধানে ছেঁড়া হলুদ রঙের একটা আলখাল্লা।)

ভীমা। বৃদ্ধং সারনং গচ্ছেমঃ

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। কি বিপদ বৌদ্ধ যে—

প্রথম সাত্ত্বী। এবার সামলাও। ও যদি ভেতরে যেতে চায়—

ভীমা। সাত্ত্বী মশাই গো।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। দেখুন আপনি ভেতরে গিয়ে কী করবেন, এখানে এক নাটক হ'চ্ছে মাত্র।

ভীমা। সাত্ত্বী ভাই গো, আমি একটু নাটক দেখতে চাই।

প্রথম সাত্ত্বী। না না, ও সব হবে না। এটা বৌদ্ধদের নয়।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। ভুলে গেছ নাকি ওদের সাথে প্রকাশ্যে এ সব কথা বলা যায় না।

ভীমা। হ্যাঁ, জোর করে বাধা দেয়ার নিয়মও নেই।

প্রথম সাত্ত্বী। কিন্তু আমাদের চাকরিটা রাখতে হবে তো, আপনি বাধা পাবার আগেই সরে পড়ুন।

ভীমা। কেন, আমাকে দেখলে কি পাপ হয়?

প্রথম সাত্ত্বী। আমরা কিন্তু আপনাকে ও সব কথা বলিনি।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। দেখুন মশাই, আমরা আপনাকে বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আপনারও কি বাধা পাবার চেষ্টা করা উচিত?

ভীমা। আপনারা বাধাই দিন।

প্রথম সাত্ত্বী। কি মুশকিল, কি মুসকিল। (কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টাও করল না)

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। আরে, ভীমা না? হ্যাঁ? তুমি আবার বৌদ্ধ হ'লে কবে। রসো—

(বল্লম তুলে তাড়া করার ভঙ্গি করল)

ভীমা। এখন খুব বীরত্ব না?



প্রথম সাত্ত্বী। আচ্ছা লোক তো তুমি? (হাসতে শুরু করল)

(ভীমা হো হো ক'রে হাসতে হাসতে চলে গেল।)

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। কিন্তু সত্যি যদি কোনও বৌদ্ধ আসে—

প্রথম সাত্ত্বী। সত্যিকারের বৌদ্ধরা প্রায়ই আসে না।

দ্বিতীয় সাত্ত্বী। আসবে, আসবে একদিন কর্তাদের চোখের সম্মুখে পাহারা দিতে দিতে ওদের মুখোমুখি প'ড়ে যাব।

প্রথম সাত্ত্বী। সেদিন না পারব সূক্ষ্মভাবে আটকাতে, না পারব পথ ছেড়ে দিতে। চাকরিটা যাবে। ওই দেখ, এবার বড়রা আসছেন।

(টহল দিতে শুরু করল। নগরপাল, কবি ও শ্রেষ্ঠী জয়পাল প্রবেশ করল। প্রহরীরা সোপানের মাঝামাঝি জায়গায় যুক্তভাবে নগরপালকে সম্মান জানাল। নগরপাল রঙ্গশালায় উঠে দাঁড়াতেই প্রহরীরা চলে গেল।)

কবি। বন্ধু সামন্তসেন

নগরপাল। তুমি খুব বিচলিত হ'য়ে পড়েছ কবি।

কবি। তোমার এ অনুযোগের সত্যতা স্বীকার করি। কিন্তু ভেবে দেখ, যদি ব্যর্থ হ'য়ে যায় আমাদের কাব্য? বৃথা উচ্চাশার বেদনা থাকবে, আর পরের যশের প্রতি মাৎসর্য।

নগরপাল। তা হবে না। নাটকের চরিত্রের নতুনত্বই যা একটু অসুবিধা করেছে, নতুবা অন্য সব বিষয়ে অনবদ্য হ'য়েছে তোমার নাটক।

জয়পাল। তা হ'লে চরিত্র বাদ দিলেই হ'ত।

নগরপাল। আহ্, শ্রেষ্ঠী একটা কথা বলেছে বটে কবি, শির বাদ দিতে পারলে অবশ্যই শিরঃপীড়া থাকে না।

জয়পাল। ওটায় অসুবিধা হ'চ্ছে ব'লেই বললাম।

নগরপাল। মিথ্যা বলনি। শুনেছি, হ্যাঁ কবি তুমিও শুনেছ নাকি, কোনও এক শ্রেষ্ঠী পিতৃপিণ্ড এড়ানোর জন্যে প্রথমে বৌদ্ধ হ'য়েছিল, পরে যখন দেখল বৌদ্ধরাও পিতৃশ্রাদ্ধ করছে তখন ব'লে বসল, আমার পিতার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই বাপু।

জয়পাল। এ সব বাড়িয়ে বলা।

কবি। আমাদের শ্রেষ্ঠী গুণীর প্রতিপালক।

জয়পাল। শুনলেন, নগরপাল শুনলেন?

নগরপাল। কবিরা যখন কথা বলেন, তখন ও সব শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন। কবি, তোমার দেখছি উদ্দেশ্য ভাল নয়।

কবি। যদি একযুগে শ্রেষ্ঠীরা জেতবন দান করতে পেরে থাকে এ যুগে একটি প্রাসাদ দান করতে পারবে না কেন?

জয়পাল। কি বললে, কী দান করার কথা বলছ?

নগরপাল। দেখলে কবি, শেঠ অমনি সতর্ক হ'য়ে গেছে।

জয়পাল। না না সতর্ক হবার কিছু নেই। এক খণ্ড বিষাদ না কী বললে?

(নগরপাল ও কবি হেসে উঠল)

কবি। বিষাদ তোমাকে দান করতে হবে না বন্ধু, ও তোমার ভাণ্ডারে নেই আমি জানি।

জয়পাল। কি বিপদ, নেই বললেও বিশ্বাস কর না।

(কবি ও নগরপাল উচ্চতর গ্রামে হেসে উঠল)

নগরপাল। এটা কিন্তু আনন্দের কথা কবি। কৃষ্টির এই স্বর্ণযুগে শ্রেষ্ঠী জয়পালের মতো কট্টর ব্যবসায়ীও কাব্যরস আস্বাদ করতে চায়।

জয়পাল। আমাকে কী বললেন — স্বর্ণযুগ? আমি কি স্বর্ণবণিক না নাথযুগী?

নগরপাল। দেখলে কবি, তোমার সান্নিধ্যে কি রকম ভাষাজ্ঞান হ'য়েছে শেঠের?

কবি। (হাসতে হাসতে) না, না সুবর্ণবণিক নয়। বণিক কুলের স্বর্ণ, বণিকসুবর্ণ বরং বলা যায় আপনাকে।

জয়পাল। নগরপাল, আপনার কি এখনও সন্দেহ আছে আমি —

নগরপাল। থামো, থামো, শ্রেষ্ঠী, তোমার হাস্যরসের একান্ত অভাব। তোমাকে যদি হীন সুবর্ণবণিক ব'লে জানা যেত তা হ'লে রাজকোষের ভার দেয়া হ'ত না।

(মহারাজকুমার বীরসেন ও চন্দ্রসেন প্রবেশ করল। প্রহরীরা সোপানের প্রান্ত থেকে একটু এগিয়ে সম্বর্ধনা করল এবং সরে গেল। রাজকুমারের উৎসবের বেশ। বলয়, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, উত্তরীয় এ সবই উৎসবের উপযুক্ত।)

বীরসেন। দেখেছ চন্দ্রসেন, রাজ্য আমাদের কতদূর অগ্রসর। শ্রেষ্ঠী জয়পালও নাটক দেখার জন্য উদগ্রীব।

চন্দ্রসেন। নিঃসন্দেহে।

বীরসেন। তোমাকে বলেছি বিক্রমাদিত্যের যুগ অপেক্ষা এটা কোনও অংশে ছোট নয়।

চন্দ্রসেন। এ কথা আমারও মনে হয়েছে। কালিদাসের নাম সকলের মুখে মুখে, তেমনি একদিন মহাকবি ধোয়ীর নামও ছড়িয়ে পড়বে। এখনও যে ভারতবর্ষের সবাই সে সত্যটা স্বীকার করছে না তার কারণ কবির সম্মান হয় মৃত্যুর পরে।

বীরসেন। অথচ ভাবো বল্লাল সেনের পূর্বেকার কথা। পাল রাজাদের সবই ছিল, ছিল না শুধু সমাজজ্ঞান। কী করে সমাজের স্তরে স্তরে সভ্যতার সৌরভ বিস্তৃত ক'রে দেয়া যায়, সে ধারণা ছিল না। বঙ্গ-বগধা। একটা জাতি সভ্যসমাজে বিহ্বল ব'লে পরিচিত হ'য়েছে। গৌড়ভূজঙ্গ মহারাজ শশাঙ্ক, দ্বিতীয় দাশরথি রামপালদেব, এঁদের আমি মহান বিবেচনা করি, কিন্তু তাঁদের সময়েও দেশের বৃহত্তর একটা অংশ অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়েছিল। তারা তাদের মতো ভূত-পিশাচের পূজা নিয়ে মত্ত ছিল। রাজার

চারিদিকে সভ্যতার আলো ছিল, সেটা বড়জোর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পৌঁছাত। কিন্তু আজ! আর্যসভ্যতার এমন বিস্তার কেউ কল্পনা করতে পারে? পঞ্চ ব্রাহ্মণ, পঞ্চ কায়স্থ দেশটাকে আর্য করে তুলেছে।

(এরা এগিয়ে গিয়ে মঞ্চের নিকটস্থ ধাতব আসনগুলি ঘুরিয়ে নিয়ে বসল)

কবি। ভূমি প্রস্তুত ছিল, সোনা ছিল, স্বর্ণমুদ্রা হ'য়েছে।

বীরসেন। কথাটা কবির উপযুক্ত বটে। এ দেশকে কবি ভালবাসেন, আমিও বাসি। আমিও বিশ্বাস করি এ দেশের এই শ্যামবর্ণ নর-নারীর রূপের বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হয় বর্ণশঙ্করগুলিকে যদি আর্যবর্ণের একটিতে উঠিয়ে নেয়া যেত, মহান উপকার হ'ত তা হ'লে। শুধু বর্ণাশ্রমে ধর্মের বর্ণ নয়, এত বিভিন্ন দেহবর্ণের লোক এরা যদি আর্যসমাজে পুরোপুরি স্বীকৃত হ'ত! হবে একদিন তার সূচনাও দেখা যাচ্ছে। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, কনৌজ ব্রাহ্মণের পাশে বসে সামগান করছে, বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হ'চ্ছে। গোটা বাঙালি জাতিটা এক দিন এক হ'য়ে যাবে।

কবি। আপনার স্বপ্ন সফল হ'ক রাজকুমার। গৌড়-রাঢ়-বঙ্গ-বিস্তৃত বাঙালি জাতি, মহান আর্যজাতির সাথে মিলেমিশে এক হ'য়ে যাক, আমি সেই কাব্যের হ'ব উদ্‌গাতা।

বীরসেন। কৌতুক বোধ হয় ভাবতে গেলে, আজ থেকে পাঁচশ' বছর পরে এই সংমিশ্রণের কথা কেউ কি মনে রাখতে পারবে নগরপাল?

নগরপাল। ভৃত্য উন্মুখ হ'য়ে শুনছে রাজকুমার।

বীরসেন। আপনার বিনয় আপনার কর্মদক্ষতারই তুল্য। নগরীর গোপন সংবাদগুলি আপনিই বলতে পারবেন। আপনি কি লক্ষ করছেন?

নগরপাল। মহামতি বল্লাল সেন যার সূচনা করেছিলেন, এখন সেটা সার্থক হয়ে উঠেছে। বাঙালি মাত্রেরই আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। আর্যধর্ম, আর্যশিক্ষা, আর্যআচার ক্রমশই তাদের প্রিয় হ'য়ে উঠছে। নগরের প্রত্যন্তসীমাতেই এ সব ভাল ক'রে চোখে পড়ে। আভীরদের অনেকেই গোপ ব'লে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে আজকাল, তারা বলছে, তারা বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়। কৈবর্ত জাতীয়েরা বলছে তারাও আর্যসমাজভুক্ত শূদ্র। অধিকাংশই ব্রাহ্মণধর্মকে আশ্রয় করেছে।

কবি। আলোর প্রতি প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, শুধু পতঙ্গের নয়।

বীরসেন। নিশ্চয় কবি, নিশ্চয়। বৌদ্ধদের সাথে অসদ্ভাবের ঘটনাগুলিও আজকাল তেমন শুনি না।

নগরপাল। মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেনের আদেশে বৌদ্ধদের ক্রমশই সুবিধা দেয়া হচ্ছে। তাদের ধর্মহীন ক্রিয়াহীন বলা দণ্ডণীয় হ'য়েছে। (হেসে) কেউ কেউ বলছে তারাই নাকি বেশি সুবিধা পাচ্ছে।

বীরসেন। (হেসে) একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। যুবরানির এক দাসী রাত্রিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে রাজবাড়ির বুড়ো ধাত্রীর সাথে গুতো লেগে গেল। বুড়িকে কিছুতেই থামানো যায় না। যুবরানি অবশেষে বললেন, ও সাধারণ দাসী নয়, বুড়িমা, ধর্মে বৌদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী থেমে গেল। মুখ কালো ক'রে সে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, রাগের মাথায় দাসীকে তার ধর্মমতে আঘাত দিয়েছে কি না। যুবরানি তাকে বুঝিয়ে বললেন, পোড়ামুখি চোখখাকি প্রভৃতি যা সে বলেছে তা হিন্দু বৌদ্ধ সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

(সকলেই হাসল)

নগরপাল। আমার কিন্তু মনে হয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটা আরও কিছুকাল থাকা ভাল। মহারাজ বল্লাল সেনের কঠিন বিধানগুলি শ্লথ ক'রে দেয়া ভালই হ'য়েছে, কিন্তু ব্যঙ্গের প্রয়োজন এখনও আছে। সরাসরি মন্দ বলার চাইতে বিদ্রূপ করা ভাল, তাতে দোষকেও উদ্‌ঘাটিত করে, হাসিতে তিক্ততাও ডুবে যায়।

বীরসেন। কলহের সুযোগ না দিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারা খুবই স্পৃহণীয় শক্তি। কোনও কোনও কবির নাটকে বৌদ্ধদের এ রকম ব্যঙ্গ করা হ'য়েছে। হ্যাঁ গো, কবি, তোমার নাটকে বৌদ্ধ শ্রমণ ট্রমন নেই?

চন্দ্রসেন। এ নাটকের আগাগোড়াই যে হাস্যরস, আর বোধহয় প্রচ্ছন্নভাবে অনার্য বৌদ্ধদের নিয়েই লেখা।

বীরসেন। নাটকের কথায় মনে পড়ে গেল চন্দ্রসেন, তোমার সংবাদ যদি সত্য হয় তবে সোমলতা বৌদ্ধ।

চন্দ্রসেন। মনে হয় ওর জীবন কিছুটা রহস্যাবৃত।

বীরসেন। সব নটীর জীবনই খানিকটা তাই।

চন্দ্রসেন। আমার মনে হচ্ছে, পাহাড়পুরের এক ছায়াচ্ছন্ন রাত্রিতে দেয়ালের গায়ে অন্যান্য ছায়াগুলির মধ্যে এর ছায়াও আমি দেখেছিলাম।

বীরসেন। সে অনুসন্ধান আমি করব। আরবীয় ঘোটক পাবার পক্ষে যথেষ্ট খোঁজ নিয়েছ কিন্তু আসল খোঁজ নেয়া হয়নি। তুমি কি বলতে পার সোমা বিবাহিতা কিনা?

নগরপাল। রাজকুমার —

বীরসেন। না, নগরপাল, দ্রুত কিছু করা হচ্ছে না। আপনি প্রাচীন ভারতের একটি প্রথার কথা নিশ্চয়ই জানেন। রাজসভার অঙ্গ হিসাবে কলাকুশলী নৃত্যগীত পটিয়সী একজন গণিকা সে কালে থাকত রাজাদের।

নগরপাল। হ্যাঁ, শুনেছি বটে, নামটা মনে পড়ছে না; মগধরাজ বিন্দুসারের এমনই একজন ছিলেন, রাজকোষ পূরণে অনেক সহায়তা করেছে সেই বারাঙ্গনা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

*With Best Compliments of :*

**INDIA GLYCOLS LTD.**

C-124, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE
PHASE-1 ● NEW DELHI - 110 020
PHONE : 6815772 ● FAX : 6810373